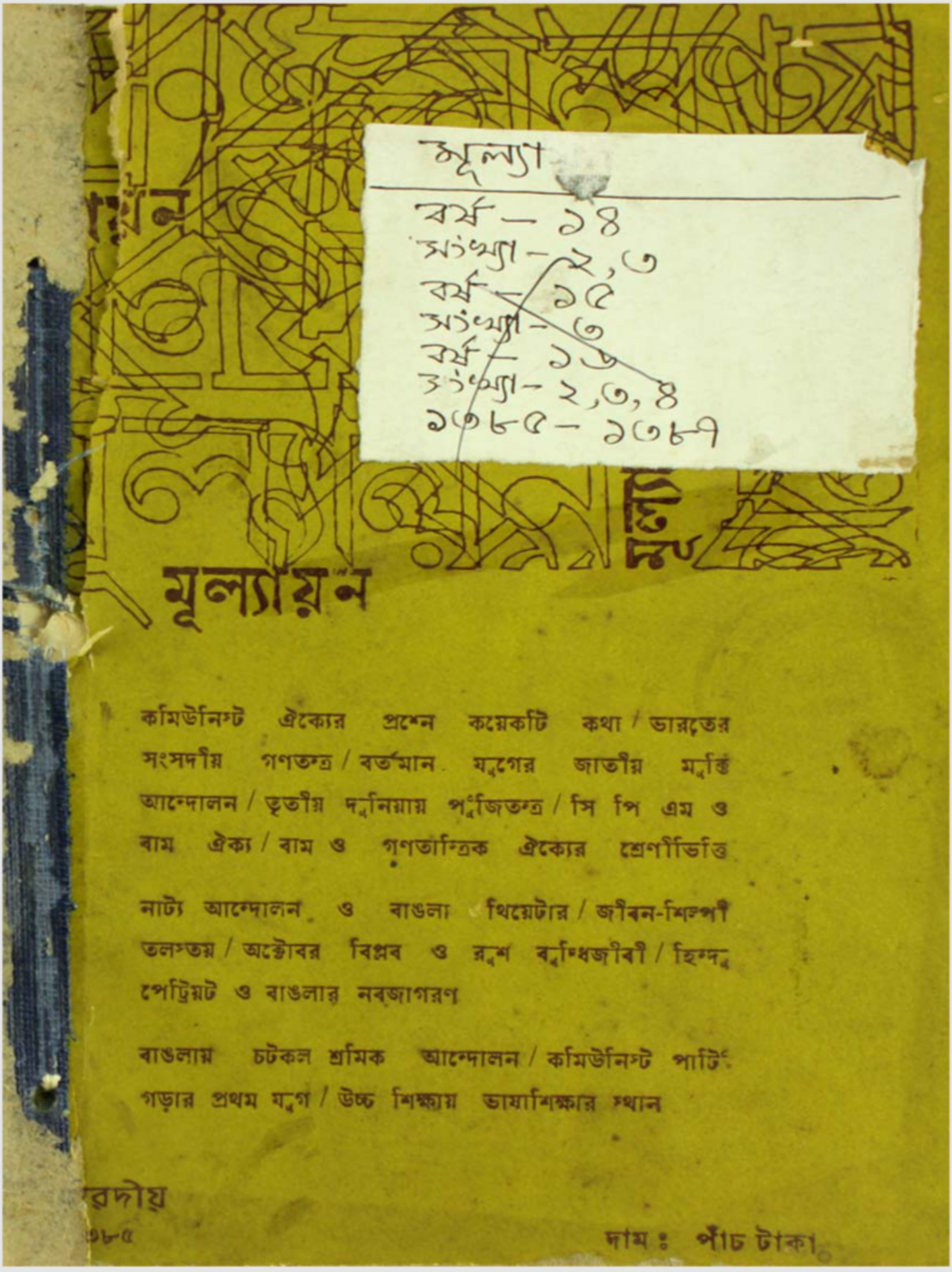

মূল্যায়ন

বর্ষ – ১৪
সংখ্যা – ২, ৩
বর্ষ – ১৫
সংখ্যা – ৩
বর্ষ – ১৬
সংখ্যা – ২, ৩, ৪
১৩৮৫ – ১৩৮৭

মূল্যায়ন

কমিউনিস্ট ঐক্যের প্রশ্নে কয়েকটি কথা / ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র / বর্তমান যুগের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন / তৃতীয় দুনিয়ায় পুঁজিতন্ত্র / সি পি এম ও বাম ঐক্য / বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের শ্রেণীভিত্তি

নাট্য আন্দোলন ও বাঙলা থিয়েটার / জীবন-শিল্পী তলস্তয় / অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ বুদ্ধিজীবী / হিন্দু পেট্রিয়ট ও বাঙলার নবজাগরণ

বাঙলায় চটকল শ্রমিক আন্দোলন / কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ / উচ্চ শিক্ষায় ভাষাশিক্ষার স্থান

রদীয়

৩৮৫

দাম : পাঁচ টাকা

পূজোয় চাই নতুন জুতো

খোকার জুতো খুকুর জুতো
বাবার জুতো মায়ের জুতো
সবার জন্যে বাটার জুতো

লিলিপুট ১৯
সাইজ ৫-৮
টা ২৭.২৫

Bata

ওরিয়েন্টা ৩৫
সাইজ ৩-৭
টা ২১.২৫

ডিয়োনা ১২
সাইজ ৩-৭
টা ৩২.২৫

Bata

এক্সকুসিভ
মডেল নাম্বার ২৪
সাইজ ৩-১০
টা. ৩৮.২৫

With Best Complements from :—

M/S Black Diamond Beverages Ltd.

Enjoy Thums Up, Limca, Gold Spot
and Bisleri Soda.

For Black & Galvanised
Steel Pipes

M/s. K. Rodh & Company
Engineers & Contractors
9, Clive Row (1st floor)
Calcutta—700001
Phone : Office 22 8001
Residence 77-2234

With
Best
Compliments
from :—

Girju Press
Kadam Kuan, Rajpath
Patna-4

উৎসবের সময়

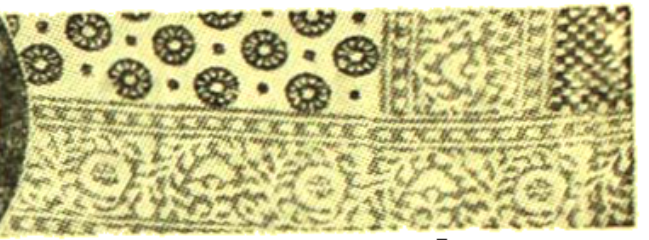

"খাদি ও গ্রামোদ্যোগজাত শিল্পবস্তু ক্রয় করলে হাজার হাজার দরিদ্র গ্রামীণ শিল্পীকে সহায়তা করা হবে, তাদের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে, তার ফলে গ্রামীণ শিল্প সামগ্রিকভাবে আরও উন্নত হবে।"

জ্যোতি বসু
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

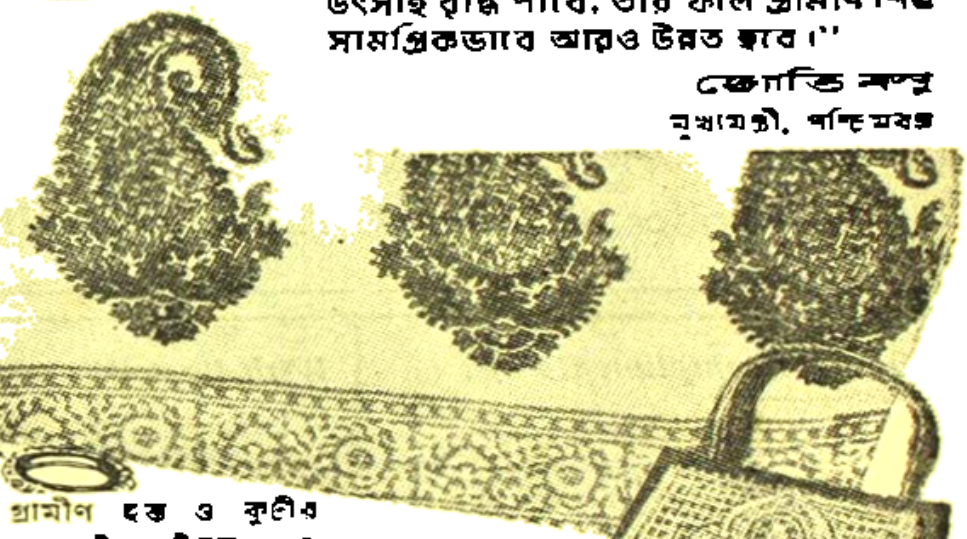

- পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ হস্ত ও কুটীর শিল্পসম্ভার যথেষ্ট উন্নত ও আকর্ষণীয়।
- দামের দিক থেকেও এগুলি তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামীণ শিল্প ও শিল্পীদের সহায়তার জন্য নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন।

গ্রামীণ শিল্প ও শিল্পীদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য

খাদি ও গ্রামীণ শিল্পবস্তু ক্রয় করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

With Best Compliments of :—

Madhu Enterprises

138, Canning Street (2nd Floor)
Calcutta-700001
Phone : 22-0467

Stockist of :
Ball Roller Bearings & Taper Roller Bearings

With best compliments of :

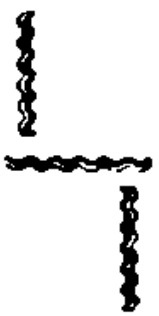

KMC Printing Service

12 Radha Bazar Lane,
Calcutta-700001

With Best Wishes :
From

Khanna Packers Products

Govt. Contractors & Manufac turers of All kinds of Paper bags, Plates, Straws, Wrapers, Napkins & Card Board Box.

7338 Qussab Pura Sadar Thana

Phone : Office 34 1698
Branch 34 5823

The Most Popular & Leading
Eminent Cargo Movers

For Booking & Delivery
Please Contact

M/S. City Clearing Agency
19, Amartalla Lane
Calcutta-700001.

With Best Compliments from :—

BENGAL POTTERIES LIMITED
Under Govt. of India Management

Makers of Fine Crockeries & Insulators
for domestic market as well as abroad

Regd. Office
25 Brabourne Road,
Calcutta-700001.

Factory No. I
45 Tangra Road,
Calcutta 700015.

Factory No. II :

মেহনতী জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার—

দৈনিক ও সাপ্তাহিক

কালান্তর

আপনার সাথী

তাই কালান্তর-এর বহুল প্রচারে

আপনি সহযোগিতা করুন !

আনন্দময়ীর আগমনে

উৎসবের আমেজ আনে

কেয়ো-কার্পিন

কেয়া তৈল

ডি এল এইচ ডে'জ মেডিকেলের তৈরী

PX/DM/KB-P2/18

With Best Compliments of :

Arts & Prints Private Ltd.

Park Mansion
31, Park Street, Calctuta-700016
Phone : 24-8619, 24-9871

Manufacturers of Leather Goods, Boutique, Dress Materials & Dealers in All India Handicrafts.

With
Best
Compliments
from :—

Phone : 23-3053-54

Hindustan Oil Storage & Distribution Co.

6, Old Post Office Street,
Calcutta-700001.

Infinity Installation

23, A. M. Ghosh Road,
Budge Budge
Phone : 611-226 & 611-307

With best Compliments of :

M/s. ANANDA HARDWARE & TOOLS Co.

Show Room :
11 Clive Row (Shop No. 10)
Ground Floor, Calcutta-700001

Authorised dealers of
M/s. CARBORUNDUM UNIVERSAL Ltd.
for their Bonded & Coated Abrasives

With Best Compliments from :—

M/S. Bharat Battery Mfg. Co. (P) Ltd.

238A, A. J. C. BOSE ROAD,
CALCUTTA 700020

With Best Compliments of .—

New Eastern Traders

14, Hare Street.
Calcutta-1.
Phone : 23-3722

WHY BANK DEPOSITS ARE BETTER :

- SAFETY OF INVESTMENT
- ENCASHMENT AT ANY TIME
- LOAN FACILITY
- DEPOSIT INSURANCE GUARANTEE

TAX BENEFIT TO :

- INTEREST EARNED UP TO Rs. 3,000/- EXEMPTED FROM INCOME TAX
- DEPOSITS UP TO Rs 1,50,000/- EXEMPTED FROM WEALTH TAX

CENTRAL BANK OF INDIA

THE BANK THAT MOVES OUT TO PEOPLE AND PLACES

With Best Compliments of :—

Phone : 32-4062
33-9045

Variety Steels ((India) Agency

Stockists of

Alloy Steels

5/1 Lucas Lane,
Calcutta 1

With Best Compliments of :—

Indian Eyelets Industries

5, Clive Row
Calcutta-700001
Phone : 22-6973-4

Mfg. of
Adhesive, Eyelets
&
Laces

'মনীষা'র বই

সংগ্রামের হাতিয়ার

বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে : মার্কস / এঙ্গেলস / লেনিন	৫·০০
স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা : নরহরি কবিরাজ	২৫·০০
অক্টোবর বিপ্লব এবং এক নতুন ধরনের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন : নরহরি কবিরাজ	৩·০০
মানুষের পার্থিব সম্পদ :	১০·০০
ইতিহাসের ধারা : সুশোভন সরকার	৭·০০
কমিউনিজমের উৎপত্তি : সুশোভন সরকার	৪·০০
ধর্ম ও মার্কসবাদ : অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র	২·৫০
ভবানী সেন রচনা সংগ্রহ : ১ম খণ্ড	৮·০০
২য় খণ্ড	১২·০০
রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী : চিন্মোহন সেহানবীশ	১৮·০০
বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য (সংকলন)	৭·৫০
প্রতিরোধ প্রতিদিন : ফ্যাসিবিরোধী রচনা সংকলন	২০·০০
এক কদম আগে দু কদম পিছে : লেনিন	৫·০০

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিঃ

৪৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭৩

নরহরি কবিরাজ-এর

"স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা"-র

পরিবর্ধিত সংস্করণ

আবার প্রকাশিত হল

দামঃ ২৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থানঃ মনীষা

লেনিনবাদী পার্টি গঠনের
তত্ত্বগত ভিত্তি
ও
কর্মপদ্ধতি

গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত
ভূমিকা

লেখক অমল দত্ত এতে চিরায়ত
প্রশ্নের সমকালীন উত্তর দিয়েছেন

দাম : চার টাকা

প্রাপ্তিস্থান :
মনীষা

BEST
WISHES
FROM
A FRIEND

অক্টোবর বিপ্লব এবং এক নতুন ধরনের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

নরহরি কবিরাজ

মূল্য : শোভন সংস্করণ : ৬·০০ সাধারণ সংস্করণ : ৩·০০

প্রাপ্তিস্থান :
মনীষা গ্রন্থালয়
৪/৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

October Revolution and National Liberation of a New Type

by
Narahari Kaviraj

K. P. Bagchi & Company
Calcutta.

Price : Rs. 15 00 (Hard Cover)
Rs. 7·50 (Soft Cover)

To be had of :
Manisha Granthalaya
4/3B Bankim Chatterjee Street
Calcutta 73

বহু প্রতীক্ষার পর নাট্যরসিকদের কাছে হাজির
চার দশকের সাধনার ফসল

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নাট্যচিন্তা ঃ শিল্পজিজ্ঞাসা

কেবল রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কেই নয়, নাটক, নাট্যকলা ও নাট্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক সমাজবিজ্ঞানসম্মত মননশীল প্রবন্ধগুলির সঙ্গেও সুধী পাঠকবর্গ পরিচিত। একাধারে তিনি নাট্যকার, নাট্য-প্রযোজক, নাট্যসমালোচক ও নাট্য আন্দোলনের সংগঠক। একদিকে যেমন আছে তাঁর প্রায় চার দশকের নাট্য-অভিজ্ঞতা, তেমনি অন্যদিকে আছে দেশী-বিদেশী নাট্যসাহিত্য ও নাট্যকলা সম্পর্কে প্রভূত অধীত বিদ্যা ও জ্ঞান। এই দু-এর অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনা ইতিহাসগামী হয়ে তত্ত্বের জটিলতা ভেদ করে সরস ও সুবোধ্য। মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে ঐতি-হাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে প্রায় শতবর্ষের দেশী-বিদেশী নাটক ও শিল্পতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা এবং বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে আজকের প্রগতিশীল নাট্যধারার গতিমুখ নির্ণায়ক এমন বিশদ তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় এই প্রথম। চার শতাধিক পৃষ্ঠায় এই বিস্তারিত আলোচনা সাংস্কৃতিক জগতে, বিশেষ করে নাটক ও নাট্যকর্মের ক্ষেত্রে এলোমেলো চিন্তা ও অস্পষ্ট-তাকে স্বচ্ছ ও স্বচ্ছ করতে যে কতখানি সাহায্য করতে পারে তা উপলব্ধি করতে হলে এই বইটিকে সাথী করা দরকার।

দাম : ত্রিশ টাকা

প্রকাশক : ইম্প্রেসন সিণ্ডিকেট
তারক চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৫

পরিবেশক : নির্মল সাহিত্য মন্দির

With Best Compliments from :—

M/S. Hindusthan Structural & Construction Company.

37, Strand Road
Calcutta-1

With Best Compliments from :—

Great Indian Bakery

Bakers & Confectioners
of
Breads and Rolls

Barasat Road
(24 Parganas)
Phone No. 58 2019

For Sweet Box Paper Bags & General Order supply

M/S. Veena Trading Corporation

Khazanchi Road
Patna-4
Phone : 53 029

With Best Compliments of :—

Telephones :

Office : 23 6421, 23 8571, 23 7191

Works : 66-2130, 66 4108

The Calcutta Engineering Works

9A, B. B. D. Bag (East),
Calcutta-700001.

We undertake :
Short/Grit Blasting Metal Spraying of Tank, Press Ram. Pump Impellar Starch Roller etc. in our Workshop.

Specialist in :
Reconditioning of Diesel Petrol and Tractor Engines

Phone : 46-9349 (Resi)

Calindor Tools

163, Kasba Road,
CalCutta-42

Insiston

"Calindor" Brand
T. C. Tipped Tools

Manufacturers of all Types of Carbide Tipped Drill, End Mill Cutters, Tipped Tools (Single and special tools as per

With Best Compliments from —

Phone : 44 6006

Farinni Eleven Up

27, S. N. Pandit Street

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত—

১।	অভয়া মঙ্গল—সম্পাদিত : ডঃ আশুতোষ দাস	৭·০০
২।	বৈষ্ণব সাহিত্যে যদুনন্দন—শান্তিলতা রায়	২৫·০০
৩।	দুশ বছরের পুরানো বাংলা গদ্য পুথি —ডঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়	১২·০০
৪।	গোবিন্দ বিজয় : ডঃ পিযুষকান্তি মহাপাত্র	২৫·০০
৫।	লোকনাট্য ও যাত্রাগান—মন্মথনাথ রায়	৫·০০
৬।	মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল—দিলীপ কুমার রায়	৫·০০
৭।	মৈমনসিংহ গীতিকা—ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন	২০·০০
৮।	সাহিত্যে নারী স্রষ্টা ও সৃষ্টি—অনুরূপা দেবী	৬·০০
৯।	**An Enquiry into the Nature and Function of Art—Dr. S. K. Nandi**	**10·00**
১০।	**Elements of Scientific Philosophy —Dr. Probhas Jiban Chaudhuri**	**15·00**
১১।	**Fundamentals of Religion —Dr. Nalinikanta Brahma**	**8·00**
১২।	**Nyaya Theory of Knowledge —Dr. Satish Chandra Chatterjee**	**25·00**

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ

৪৮, হাজরা রোড, কলিকাতা—১৯।

Problems of National Liberation

A Journal of Theoretical Studies and Re:earch

Vol. 2 Dec. 1977 No. 2

In this issue :

- Influence of the October Revolution on the National Revolutionary Movement.
- Popular Agitation Against the British Policy of Taxation (1811).
- The State Sector in Developing Countries taking the Capitalist Path.
- Historic Significance of the Cuban Revolution.
- October Revolution : Reaction in India.

Discussion

- More on the Joint Leadership of the Working Class and the Bourgeoisie.
- Is National Democratic State a Multi-class State ?

Book Rev'ew

Oriental Countries Today, Vol.-I & II
—by A team of Soviet Scholars

Revolution in India—Path and Problems.
—by Mohit Sen.

Available at :

Manisha Granthalaya

4/3B Bankim Chatterjee Street
Calcutta-73

Editorial Office :

10, Bondel Road, Calcutta-19

Price : Rupees Three Only

Eastern Milk Foods

"MILKOS"

The Milk Drink

Plant :
Dattapukur
24 Parganas

Cal Office :
1/1B, Dr. Amal Roy
Chowdhury Lane
Calcutta-700012
Phone : 35-3634

With
Best
Compliments
o :—

Phone : 48-2930
47-0341
Gram : Planwell

Primacons India Private Ltd.

Factory Planning
&
Engineering Consultants

8/5, Gariahat Road'
(Merlin Park)
Calcutta-700019.

With
Best
Compliments
of —

Jindal Forging Pvt. Ltd.

138, Biplabi Rash Behari
Bose Road
Calcutta-1

মূল্যায়ন

শারদীয়

বর্ষ ১৪, সংখ্যা ২,

১৩৮৫

সূচী

	পৃষ্ঠা
কমিউনিস্ট ঐক্যের প্রশ্নে কয়েকটি কথা / সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	১
কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ (৮) / রণেন সেন	২৮
হিন্দু পেট্রিয়ট (১৮৫৪-৬১) ও বাঙলার নব জাগরণ / অমর দত্ত	৪০
নাট্য আন্দোলন ও বাংলা থিয়েটারের বিকৃত ব্যাখ্যা / দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫১
বর্তমান যুগের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন / সত্য রায়	৬৬
বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের শ্রেণী ভিত্তি / রথীন দাশগুপ্ত	৭১
ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র / পরিমলচন্দ্র ঘোষ	৯৪
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক অবস্থান ও বামপন্থী ঐক্য গড়ার সমস্যা / ভানুদেব দত্ত	১০১
তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে পুঁজিতন্ত্র কোন পথে ? / শংকর রায়	১১৫
বাঙলায় চটকল শ্রমিকদের আন্দোলন : আদি পর্ব / দীপিকা বসু	১২৭

অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ বুদ্ধিজীবী / তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৯
উচ্চ শিক্ষায় ভাষা শিক্ষার স্থান / নির্মাল্য বাগচী ১৫১
জীবন শিল্পী তলস্তয় / সুশীল জানা ১৫৬

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

উপদেষ্টামণ্ডলী

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, পরিমলচন্দ্র ঘোষ, সুশীল জানা,
নির্মাল্য বাগচী, রণধীর দাশগুপ্ত ।

সম্পাদক
নরহরি কবিরাজ

পবিত্র রায় কর্তৃক ১০ বঙ্কিম রোড, কলিকাতা-১৯ থেকে প্রকাশিত ও
কালান্তর প্রেস, ৫০/৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭ থেকে মুদ্রিত ।

কমিউনিস্ট ঐক্যের প্রশ্নে কয়েকটি কথা

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

আমাদের দেশে বর্তমানে রাজনীতিক্ষেত্রে যে রকম দ্রুত পট পরিবর্তন হচ্ছে এবং যে ধরনের অস্থিতিশীলতা দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে জনতা পার্টি ও উভয় কংগ্রেসের বিকল্প শক্তি হিসাবে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের প্রশ্নটি নতুন তাৎপর্য নিয়ে বড় হয়ে উঠেছে। সি পি আই ও সি পি এম দুই পার্টিই সে কথা ঘোষণা করেছে। সর্বভারতীয় আয়তনে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলার কাজে সি পি আই এবং সি পি এমের ঐক্য এবং তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমই যে প্রধান ভূমিকা নিতে পারে সে কথা দুই পার্টি'র সভ্যদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করেন, কামনা করেন। শুধু তাই নয়। দুই পার্টি'রই সমর্থক, বন্ধু এবং বাম ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন অনেক মানুষেরও তাই একান্ত ইচ্ছা। সি পি আই কংগ্রেসে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সি পি এমের কংগ্রেসে রাজনৈতিক ঐক্যের সম্ভাবনা এখনও বহু দূরে বলে ঘোষণা করা হলেও গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ কাজের নীতি অনুমোদিত হয়েছে। সি পি এমের জলন্ধর কংগ্রেসের প্রাক্কালে ও অব্যবহিত পরে 'পিপলস ডেমোক্রাসি' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ স্বীকার করেছেন যে ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি' ভাগাভাগি হওয়ার পরে আর কখনও দুই পার্টি'র ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা এত সর্বজনীনভাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। তিনি একথা স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হন নি যে ঐ আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র উভয় পার্টির সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যেই সীমিত নয়, দেশের সমগ্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তাই মনোবাসনা।

ঐক্যের পথ মসৃণ নয়। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মতাদর্শগত ক্ষেত্রে, বিশেষত আন্তর্জাতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে দুই পার্টির মধ্যে গুরুতর মত পার্থক্য রয়েছে। মতাদর্শগত প্রশ্নে ধামাচাপা বা জোড়াতালি দেওয়ার কথাই ওঠে না। জাতীয় ক্ষেত্রেও বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের আশু লক্ষ্য সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে যেটা কাটিয়ে উঠতে না পারলে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের

নেতৃত্বের এবং নেতৃস্থানীয় কর্মীদের অনেকের মনে বহু দিনের সঞ্চিত পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিরূপ মনোভাব। এই জিনিসটিও উপেক্ষা করার নয়। উভয় পার্টির কংগ্রেসের প্রাক্কালে একজন খ্যাতনামা কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকায় যে "হৃদয়ের আকুতি" জানিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে মনোবাঞ্ছার দিক থেকে সম্পূর্ণ একমত হওয়া সত্ত্বেও বিষয়টি অতটা অতিসরলীকৃতভাবে দেখতে পারছি না। কেননা কমিউনিস্ট ঐক্যের পথে যেসব বাধাগুলি রয়েছে সেগুলিকে এড়িয়ে যেয়ে নিছক হৃদয়াবেগের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তবু একথা অনস্বীকার্য যে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে ইতিহাস দুই পার্টির সামনে ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরেছে এবং সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সেদিকে অগ্রসর হওয়ার গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। দুই পার্টির মধ্যে যে সে সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিয়েছে সেটা সম্ভব হয়েছে বাস্তবেরই অমোঘ নির্দেশে। জাতীয় ক্ষেত্রে জনগণের জীবনের সঙ্কট সমাধান এবং দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রিক মৌল রূপান্তরের প্রশ্নগুলিতে উভয় পার্টির বক্তব্যের মধ্যে এখন অমিলের চাইতে মিলের দিকটাই বিশেষভাবে নজরে পড়ে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের তিন দশকের বেশি সময়ের কর্মী হিসাবে আমি ধরাবর বিশ্বাস করে এসেছি যে মতপার্থক্যের বিষয়গুলি নিয়ে ধৈর্যশীল সহিষ্ণুভাবে চিন্তা বিনিময় এবং সুস্থ বিতর্ক চালিয়ে যাওয়ার পথে যেমন কোন বাধা থাকা উচিত নয় তেমনি সেই সঙ্গে যেসব ক্ষেত্রে মিল রয়েছে সেসব বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম নেওয়ার পথেও কোন বাধা থাকার কারণ নেই।

চাই সক্রিয় বিতর্ক

আমাদের দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতাদর্শগত লড়াই চালাবার ব্যাপারে সহিষ্ণুতা, সংযম এবং নৈর্ব্যক্তিকভাবে সুস্থ বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা খুব প্রয়োজন কয়েকটি কারণে :

১) আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে এমন কোন এক বা একাধিক নেতা গড়ে ওঠেন নি যাঁরা নিজেদের, সর্বক্ষেত্রে না হলেও, মোটের উপর অভ্রান্ত বা বিচ্যুতি মুক্ত বলে দাবী করতে পারেন। লেনিন যেমন বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াইতে ক্ষমাহীন ছিলেন তেমনি তাঁর মধ্যে বিনয় এবং

আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দ্বিধাহীনভাবে বলেছিলেন যে 'এই সব দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। সুতরাং আমাদের অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, বিশদভাবে অধ্যয়ন করতে হবে'। লেনিন চরিত্রের এই দিকটি আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অনুসরণের চেষ্টা করেছেন কি ?

২) এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের একেবারে সূচনার সময় থেকে ধরলে তার বয়স ছয় দশক পূর্ণ হতে চলেছে। অর্থাৎ বার্ধক্য বা বয়সকালের দিক থেকে পরিণত। এই সুদীর্ঘকালে কমিউনিস্ট আন্দোলন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এবং শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির লড়াইতে অনেক অবদান দিয়েছে। তাই দেখেই ত' আমাদের মতন ছেলেরা জাতীয় বিপ্লববাদের পথ ছেড়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল এবং এখনও অনেকে বয়সের ভারে বা স্বাস্থ্যের কারণে সক্রিয় থাকতে না পারলেও কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি আস্থায় অবিচল রয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করা চলে না যে জাতির ইতিহাসে কয়েকটি সঙ্কট সন্ধিক্ষণে কমিউনিস্ট আন্দোলন এমন কতকগুলি গুরুতর ভুল করেছে যার খেসারত আজও দিতে হচ্ছে। বহু বৎসর, কোন কোন ক্ষেত্রে দশ বা বিশ বৎসর পরে ভুলগুলির আংশিক, দায়সারা স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বটে তবে গোড়ায় যাওয়ার চেষ্টা হয় নি। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি এবং ভাগাভাগির পরে উভয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের কাছে আমার জিজ্ঞাসা—ভুলগুলির গোড়ায় যাওয়ার চেষ্টা যদি না হয় তাহলে সঠিক শিক্ষা নেওয়া সম্ভব হবে কিভাবে ? পার্টির সাধারণ কর্মী এবং তরুণদের সামনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের যথার্থ শিক্ষা তুলে ধরতে হলে অবদান এবং ভুল, উভয় ধরনের বিচ্যুতি, সেগুলির মূল কারণ, বিচ্যুতির বাস্তব পরিণতি ইত্যাদির একটি সত্যনিষ্ঠ হিসেবনিকেশ উপস্থিত করা প্রয়োজন। নতুবা সত্যকার মার্কসীয়-লেনিনীয় আত্মসমালোচনা হবে না। যা হবে এবং হচ্ছে তাহল আত্মসমালোচনার নামে একতরফা সমালোচনা আর পারস্পরিক দোষারোপ। আত্মসমালোচনা হওয়া উচিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের আত্মসমালোচনা এবং তথ্যভিত্তিক, নৈর্ব্যক্তিক। নৈর্ব্যক্তিক কথাটির উপর জোর দিচ্ছি এই কারণে যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রবীণ নেতারা প্রায় সকলেই বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণ থেকে বামে অথবা বাম থেকে

'৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে নকশালপন্থী নামে অভিহিত যে তরুণেরা ভ্রান্ত রাজনীতি অনুসরণ সত্ত্বেও যথেষ্ট নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, নির্যাতন বরণ ও প্রাণবিসর্জন করেছে তাদের সেই ভুল পথে চলার দায়িত্ব কি উভয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব একেবারে এড়িয়ে যেতে পারেন ?

তারা যে ধরনের ভুল করেছে অতীতে কমিউনিস্ট আন্দোলনে সে ধরণের ভুল হয়েছে। ১৯২৪-৩৪-এর যুগে আমরা যারা "টেরো-কমিউনিস্ট" বলে পরিচিত ছিলাম তারা অবিকল নাহলেও অনুরূপ ধরনের যথেষ্ট ভুল করেছি। কি কি কারণে, সাবজেকটিভ ও অবজেকটিভ (বিষয়ী ও বিষয়গত) এবং কিরূপ পরিস্থিতিতে ঐ সব ভুলের উদ্ভব হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করে তুলে ধরার কতটুকু প্রচেষ্টা হয়েছে ? কোন্ পরিস্থিতিতে কি ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উপাদানের সমাবেশে তথাকথিত নকশালপন্থা মাথা তোলে এবং স্বল্পকালের জন্য হলেও দেশকে নাড়া দিতে সমর্থ হয় তার একটি সর্বাঙ্গীণ মার্কসীয় বিশ্লেষণ তথা পর্যালোচনার প্রয়োজন কেন উভয় পার্টির নেতৃত্ব উপলব্ধি করছেন না ? এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের ত' বটেই, পরিতাপেরও বিষয়।

৩) অতীতের অভিজ্ঞতায় আর একটি জিনিস লক্ষ্য করা গিয়েছে। যখন পার্টি কোন বড় রকমের ভুল করতে চলেছে তখন যদি কেউ তার সীমিত আভজ্ঞতা ও জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে ভুলের চরিত্রটা আংশিকভাবেও উপলব্ধি করে পার্টিকে হুশিয়ারী দিতে সচেষ্ট হয়েছে তাহলে তার ভাগ্যে জুটেছে অনেক লাঞ্ছনা। সে ব্যক্তির যদি খুঁটির জোর না থেকে থাকে তাহলে তার রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাবার মতন অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ বেশ কয়েক বছর পরে অনেক জল ঘোলা করে হয়ত দেখা গেল যে সে কিছু পরিমাণে হলেও সঠিক পথের হদিশ দিয়েছিল। পার্টি নেতৃত্বের বাধা ছককে হুবহু মেনে না নেওয়ার বিরুদ্ধে উগ্র অসহিষ্ণুতার অবসান আজও হয় নি। পার্টি ভাগাভাগি হওয়ার পরেও উভয় পার্টিতেই উক্ত ব্যাধির অস্তিত্ব প্রবল।

অন্ততঃ ১৯৪৮ সালের সময় থেকে পার্টির ভিতর মতপার্থক্য সম্বন্ধে যে উগ্র অসহিষ্ণুতাকে লালন করা হয়েছে তার উৎকট অভিব্যক্তি দেখা যায় ১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগ হওয়ার সময় আর চরম পরিণতি হয় নকশালপন্থীদের

শ্রেণীশত্রু ইত্যাদি রূপে চিহ্নিত করে খতম করা হয়েছে। আজ যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বৈর মনোভাব কমিউনিস্ট ঐক্যের পথে একটি মস্ত বড় অন্তরায় হয়ে রয়েছে তার মূলে উক্ত অসহিষ্ণুতার দাম কম নয়।

তাই বলি উপরোক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার সময় এসেছে। বিতর্ক তীক্ষ্ণ হোক আপত্তি নেই। তবে সুস্থ, সংযত, বিষয়গত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এবার আলোচনার কয়েকটি প্রধান বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেজন্য কয়েকটি সূত্র প্রস্তাব করছি। আলোচনাটা শুরু হওয়া উচিত জাতীয় কর্তব্য নিয়ে।

প্রধান কর্তব্য আমাদের দেশের শ্রমজীবী জনগণের প্রতি

বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান শিক্ষা, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কর্তব্যের সমন্বয়। মার্কস-লেনিনবাদের শিক্ষায় দীক্ষিত কর্মী হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার নীতিতে আমার বিশ্বাস অবিচল। তবে আমি মনে করি যে উক্ত সমন্বয়ের কাজে প্রধান গুরুত্ব দিতে হবে জাতীয় কর্তব্যের প্রতি। উপলব্ধি করতে হবে যে আমাদের প্রথম ও প্রবীণ আনুগত্য আমাদের দেশের শ্রমজীবী জনগণের প্রতি। পনের বছর আগে যখন এরূপ মত প্রকাশ করেছিলাম সেদিনের সহকর্মীবন্ধুদের অনেকেই blashphemy বলে গণ্য করেছিলেন। অথচ কয়েক বৎসর পরেই তাঁরাই অনুরূপ অবস্থান গ্রহণ করেন।

বক্তব্যটি একটু বিশদভাবে আলোচনা করছি, নতুবা ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে।

আন্তর্জাতিকতার নীতিটি একটি বিমূর্ত জিনিস নয়। আমাদের দেশের জনগণের শোষণমুক্তি সংগ্রামে সাফল্যের তাগিদেই তার প্রয়োজন। প্রয়োজন ব্যবহারিক ও তত্ত্বগত দুদিক থেকে। সকলের সাধারণ শত্রু বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ এবং তার সহযোগী অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বহুমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে জয়লাভের পক্ষে আন্তর্জাতিক সংহতি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এটি হল ব্যবহারিক দিক। বিশ্ব পরিস্থিতির

নয়। জাতীয় কর্তব্য নির্ধারণের পক্ষে বিশ্ব পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক, ঘাতপ্রতিঘাত, গতিধারার মূল প্রবণতা এগুলিকে জানা একান্ত দরকার। কিন্তু বুদ্ধিজীবী কমিউনিস্টদের পক্ষে তত্ত্বগতভাবে আন্তর্জাতিকতার নীতি অনুসরণ করা বা জনগণের সামনে ভাসাভাসা ঐ নীতির কথা তুলে ধরাটা আদৌ যথেষ্ট নয়। মার্কসবাদের শিক্ষার একটি মূল কথাই হল যে মতাদর্শ তখনই শক্তিশালী হয় যখন তা শ্রমজীবী জনগণের হৃদয় জয় করে। সুতরাং আন্তর্জাতিকতার নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করার অপরিহার্য অঙ্গ জনসাধারণকে আন্তর্জাতিক সংহতির প্রয়োজন বোঝানো, তারা যাতে আন্তর্জাতিকতার নীতিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে সেজন্য নিরলস প্রয়াস। জনসাধারণ আন্তর্জাতিকতার প্রয়োজন বুঝতে পারবে নিজেদের জীবনের জ্বলন্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। তাদের যেসব অত্যন্ত জরুরী সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সংগ্রাম চলেছে সেই সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে প্রচার করতে হবে। অন্যথায় সে নীতি বা তত্ত্ব জনগণের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিতে তথা দেশের মাটির গভীরে শিকড় প্রসারিত করতে সমর্থ হবে না।

উপরের কথাগুলিতে তত্ত্বগতভাবে কেউ আপত্তি করবেন না বটে। তবে কার্যক্ষেত্রে বহুবার দেখা গিয়েছে যে আমরা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কর্তব্যের সঠিক সমন্বয় করতে পারি নি, জনগণকেও আমাদের বক্তব্য বোঝাতে সমর্থ হই নি। হয় আন্তর্জাতিক কর্তব্যকে জাতীয় কর্তব্যের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে জনগণের সামনে উপস্থিত করেছি নতুবা জাতীয় কর্তব্যের প্রতি অবহেলা করেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে উল্টোটাও হয়েছে। এখানে বিস্তৃত দৃষ্টান্ত দেওয়ার অবকাশ নেই। সাম্প্রতিককালের কয়েকটি দৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি (১) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রগতিশীল পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলছেন এই দিকটিই সি পি আই নেতৃত্বের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ফলে দেশের ভিতরে শ্রীমতী গান্ধীর গভর্নমেন্ট যে সব জনস্বার্থবিরোধী কাজ করে চলেছেন তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো হয় নি। এই ভুলের কথা সি পি আই নেতৃত্ব এখন স্বীকার করেছেন। ভুলের মাশুল শুধু যে জনগণের আস্থা হারানো তাই নয়, আন্তর্জাতিক সংহতির ক্ষেত্রেও ক্ষতি হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে আমাদের দেশে দলমতনির্বিশেষে

তাতে বেশ খানিকটা ভাটা পড়েছে। (২) কোন কোন মার্কসীয় তাত্ত্বিক নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন: 'বিশ্ব-পরিস্থিতিতে যখন সমাজতন্ত্রের শক্তিই নিয়ামক ভূমিকা নিচ্ছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যখন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত তখন আর আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই।' সঠিক কি ভাষা উক্ত তাত্ত্বিকেরা ব্যবহার করেছিলেন তার উদ্ধৃতি হাতের কাছে নেই, তবে তাঁদের বক্তব্যের মোদ্দা কথাটা ছিল ঐরকম। বলা বাহুল্য এ ধরনের সিদ্ধান্ত যে তত্ত্বগতভাবে ভুল এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষার বিকৃতি তাই নয়। ঐ ধরনের সিদ্ধান্ত সূচিত করে জাতীয় কর্তব্যের প্রতি অবহেলা আর দেশের জনসাধারণের জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা। (৩) সি পি এম নেতৃত্ব পার্টির ভিতরে মতভেদের দরুণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অবস্থান সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত সরকারী-ভাবে নিতে পারেন নি। ফলে নেতাদের বক্তব্যে বিভিন্ন সময়ে পরস্পর-বিরোধিতা প্রকট হয়ে উঠেছে। উপরন্তু সারা বিশ্বের পটভূমিতে সাম্রাজ্য-বাদের বহুমুখী চক্রান্ত এবং আমাদের মত সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা তাঁদের কাছে যথোচিত গুরুত্ব লাভ করে নি। ফলে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কর্তব্যের সঠিক সমন্বয় হয় নি, জাতীয় কর্তব্যের ক্ষেত্রেও গাফিলতি হয়েছে। জলন্ধর কংগ্রেসে অবশ্য রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপনের সময় প্রবীণ নেতা বি টি রণদিভে ঘোষণা করেছেন যে বিশ্ব পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা ১৯৫৬ এবং ১৯৬০ সালের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মহাসম্মেলনের বক্তব্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। উপরোক্ত ঘোষণার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হিসাবে এখন তাঁরা কিভাবে আগামীদিনে অগ্রসর হবেন তা দেখা যাবে।

আন্তর্জাতিকতার নীতির অপর একটি দিক—বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া। ১৯৬০ সালের পর থেকে বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে সংহত রূপ দেওয়ার মাধ্যম হিসাবে গড়ে উঠেছে কয়েক বৎসর পরপর বিশ্ব কমিউনিস্ট মহাসম্মেলনের অনুষ্ঠান। উক্ত মঞ্চে বিভিন্ন দেশের পার্টি নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও চিন্তা বিনিময় করে থাকেন। এ পর্যন্ত যতগুলি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি নিজের বক্তব্যকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন না।

মত ব্যক্ত হয়েছে এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে সোভিয়েত পার্টির সমালোচনাও উচ্চারিত হয়েছে। সহিষ্ণু আলোচনা তথা চিন্তা বিনিময়ের পর যে সব বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে সেইসব বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। মতপার্থক্যের বিষয়গুলিকে ভবিষ্যৎ আলোচনা ও অভিজ্ঞতার আলোকে মীমাংসার জন্য রাখা হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সমস্ত বিষয়ে একমত না হয়েও তাঁদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা চলে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বেলায় সে কথা আদৌ প্রযোজ্য নয়। সে যা হোক, বিশ্ব-কমিউনিস্ট মহাসম্মেলনে বিশ্বপরিস্থিতির যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, দুনিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতার যে নির্যাস তুলে ধরা হয়েছে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে কোন দেশের পরিস্থিতিতে প্রয়োগের সময় সংশ্লিষ্ট দেশের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বৈশিষ্ট্যগুলিকে উপেক্ষা করা বা তলিয়ে বোঝার চেষ্টা না করার অনিবার্য পরিণতি হবে জাতীয় কর্তব্যের প্রতি অবহেলা আর তার ফলশ্রুতিস্বরূপ আন্তর্জাতিকতার নীতি টবের ফুলগাছ হয়ে থাকবে। নিজ দেশের পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাকে প্রয়োগের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সেই দেশের কমিউনিস্ট পার্টির। তা থেকেই আসে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার নিজস্ব পথ উদ্ভাবনের কথা।

সমাজতন্ত্রের দিকে ভারতের পথ

সমাজতন্ত্রের ভারতের নিজস্ব পথের কথাটিও একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার। একে ত' মাও সে-তুং চীনীকরণের নামে মার্কস-লেনিনবাদের শিক্ষার একেবারে খোল নলচে শুদ্ধ বদলে দিয়ে মাওবাদ প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা করেছিলেন তার স্মৃতি এখনও সজীব। উপরন্তু সম্প্রতি 'ইউরো-কমিউনিজম' নিয়ে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি যে রকম হৈচৈ করছে তাতে কথাটিকে 'ভারতীয় কমিউনিজম'এর সন্ধান বলে অপব্যাখ্যার সম্ভাবনা আছে। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোড়ার দিকে একবার ভারতীয় কমিউনিজমের ধুয়া উঠেছিল। বছর পনের আগে সমাজতন্ত্রের ভারতের পথের কথা বলায় আমার মত সাধারণ কর্মীকেও সেদিনের সহকর্মীদের তরফ থেকে ভারতীয় কমিউনিজমের প্রবক্তা আখ্যা লাভ করতে হয়েছিল। হয়ত সেদিন যেভাবে

দিতে চাই যে সমাজতন্ত্রের দিকে ভারতের নিজস্ব পথের কথা আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি-মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত হয় নি। ১৯৫১ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে কর্মসূচী গ্রহণ করে তাতে এই কথাটি বলা হয়। প্রায় একই সময়ে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত হয় 'ব্রিটিশ রোড টু কমিউনিজম'। সে সময় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবিসম্বাদী নেতারূপে স্তালিন বিদ্যমান ছিলেন। পরে ১৯৬০ সালে বিশ্ব কমিউনিস্ট মহাসম্মেলনে উক্ত নীতি সর্বসম্মত স্বীকৃতি লাভ করে। সেই সঙ্গে নীতিটির তাৎপর্য— সুসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। মার্কস-লেনিনবাদের শিক্ষার সর্বজনীন নিয়মগুলির প্রতি অবিচল নিষ্ঠা বজায় রেখে, আন্তর্জাতিকতার নীতির ভিত্তিতে সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি শুধু যে ১৯৬০ সালের সম্মেলনের সিদ্ধান্তের পাল্টা বক্তব্য উপস্থিত করে তাই নয়, চীনের পথই একমাত্র পথ হিসাবে সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। অথচ তারাই মার্কসবাদের চীনীকরণের আওয়াজ তুলেছিল।

ভারতীয় কমিউনিজম বলে আলাদা কিছু হতে পারে না। মার্কস-লেনিনবাদের নির্দেশিত সমাজবিপ্লব-বিজ্ঞানের মূল নিয়মগুলি সর্বজনীন, বিশ্বজনীন। প্রশ্ন হল সেই নিয়মগুলিকে কোন দেশে প্রয়োগের সময় জাতীয় পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োগ করা। কেন, কি অবস্থায় সমাজতন্ত্রের ভারতের পথের কথা উঠেছিল সেই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাকে কোন দেশে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ বা অন্য দেশের বিপ্লবের 'কার্বন কপি' করার চেষ্টা মার্কস-লেনিনবাদের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ কমিউনিস্ট আন্দোলনের শৈশবে প্রায় প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সেই ভুলটি করে। স্বয়ং লেনিনকে ভুলটি শুধরে দিতে হয় 'বামপন্থী কমিউনিজম-শিশুসুলভ বিচ্যুতি' বইটিতে। ঐ বইটিতে লেনিন শুধু বামপন্থী হঠকারিতার সমালোচনা করেন নি, রুশ বিপ্লবের কার্বন কপি করার প্রবণতার ভুলত্রুটি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন কমিউনিজম প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মূল লক্ষ্য, তবে প্রত্যেক দেশ সেই মূল লক্ষ্যের দিকে যে পথে অগ্রসর হবে তাতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য থাকবে।

বিজ্ঞানের সর্বজনীন নিয়মগুলিকে প্রত্যেক দেশের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োগ করার প্রক্রিয়ায় উক্ত নিয়মগুলি নানা বৈচিত্র্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন একই লক্ষ্যের অভিমুখে বিভিন্ন বিন্দু থেকে অগ্রসর হলে যেমনটি হয় ঠিক সেইরকমটি হবে। লেনিনের শিক্ষার এই দিকটি অন্ততঃ আমাদের দেশে দীর্ঘদিন উপেক্ষিত হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ভাবতেন রুশ বিপ্লবের কার্বন কপি করার কথা আর ১৯৫০ সালে যাঁরা নেতৃত্বে আসেন তাঁরা ভাবতেন চীন বিপ্লবের কার্বন কপির কথা। আজ তাঁরা উভয় পার্টির নেতৃত্বে রয়েছেন। তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে উপরোক্ত দুই ধরনের ভুল শুধরে দিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের ভ্রাতৃপ্রতিম পরামর্শে সমাজতন্ত্রের ভারতের নিজস্ব পথ উদ্ভাবনের কর্তব্যটি নির্দেশিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে।

মোদ্দা কথা, রাশিয়ার পথও আমাদের পথ নয়, চীনের পথও আমাদের পথ নয়, ভিয়েতনাম বা কিউবার পথও আমাদের নয়। আমাদের পথ উদ্ভাবন করতে হবে আমাদেরই অর্থাৎ ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে। কি ভাবে? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতারা আজও করেন নি। তাঁরা এখনও প্রশ্নটির গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেন নি, নিছক উপরে উপরে ভেসে বেড়াচ্ছেন। কর্মসূচীতে একটা রণনীতি ভাসা ভাসা ভাবে নির্দেশিত হয় অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনগুলিই তাঁদের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে, বিশেষ ভাবে নিয়েছে নির্বাচনের তাৎক্ষণিক রাজনীতি। ফলশ্রুতিস্বরূপ অতীতের ভুলের শিকড় এখনও বজায় রয়ে গিয়েছে ত' বটেই, মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তার অভিব্যক্তি সব ক্ষেত্রে ঠিক এক রকম না হলেও মূলতঃ এক অর্থাৎ হয় কার্বণ কপির প্রবণতা নতুবা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে অনিচ্ছা অথবা আত্মবিশ্বাসের অভাব। যথা: (১) পার্টি ভাগাভাগি হওয়ার পর কয়েক বছর দ্বিধাবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক অংশ থেকে নতুন করে বলা হয়েছিল 'চীনের পথ আমাদের পথ'। তাঁরা যখন সে আওয়াজ ত্যাগ করলেন তখন নকশালপন্থীদের পক্ষ থেকে আওয়াজ তোলা হল 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'। বর্তমানে তাঁরা নিজেদের ভুলটা

হয়েছে কিনা সন্দেহ। অন্যদিকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্য অংশে দেখেছি ঐ ভুলের প্রচ্ছন্ন রূপ অর্থাৎ আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্বন্ধে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির, বিশেষত সোভিয়েত গবেষকদের বিশ্লেষণের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা। বিভিন্ন ধরনের ভুলের পেছনে রয়েছে আমাদের দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে সম্যক পরিচয়ের অভাব।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির গবেষকদের নিবন্ধ নিশ্চয়ই যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে অধ্যয়ন করবো। তাঁদের কয়েকটি সুবিধা আছে যা আমাদের নেই। তাঁদের রয়েছে তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহের প্রচুর সুযোগ। মার্কসীয় বিচার বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগে তাঁরা সুসংহতভাবে শিক্ষালাভ করেছেন। তবু মনে করি যে কোন দেশের, বিশেষত, এশিয়া আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন দেশগুলির জটিল বহুমুখী সমস্যাবলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় তথা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে যথাযথ ধারণা করা সম্ভব নয়। সেজন্য আমাদের স্বনির্ভরশীল হতে হবে, নিতে হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব। সমাজতান্ত্রিক দেশের গবেষকদের সঙ্গে সহযোগিতা, চিন্তা-বিনিময়, প্রয়োজন হলে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনা—এই নীতি অনুসরণ করা উচিত, উক্ত কাজের পরিপূরক অঙ্গ হিসাবে।

জাতীয় পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যের প্রতি যথোচিত গুরুত্বদান প্রসঙ্গে একটি হুঁশিয়ারি দেওয়ার খুব দরকার আছে। একথা আজ কারো অবিদিত নেই যে ১৯৬০ সালের কমিউনিস্ট মহাসম্মেলনের পর থেকে কয়েকটি দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দোহাই দিয়ে মার্কস-লেনিনবাদের মূল শিক্ষাগুলিকে বর্জনের বা জোলো করে দেওয়ার ঝোঁক দেখা দেয়। অন্য দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐ সব ঝোঁকের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিনা। তবে আমাদের দেশে দুই একজন মার্কসীয় তাত্ত্বিক যে শ্রমিক-শ্রেণী ও বুর্জোয়ার যৌথ নেতৃত্বের তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন সেটি উক্ত প্রবণতার বা বিকৃতির একটি বড় দৃষ্টান্ত। আমার মনে হয় যে উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের মূলে অন্যতম প্রধান কারণ নিজেদের দেশের যথার্থ পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচয়ের অভাব আর শ্রমজীবী জনগণের থেকে বিচ্ছিন্নতা। আমরা সাবালক হয়েছি যদি মনে করি তাহলে ঝুঁকি নিতেই হবে, নানা ধরনের বিচ্যুতির বিরুদ্ধে বিরামহীনভাবে মতাদর্শগত সংগ্রামও পরিচালনা করতে হবে।

ভারতের জাতীয় পরিস্থিতির কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য

আমাদের দেশের বিপ্লব আন্দোলনের সামনে যেসব বিশেষ ধরনের জটিল, বহুমুখী এবং পরস্পরের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত সমস্যা রয়েছে সেগুলিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে, বিশ্লেষণ করতে হবে, সমাধান নির্দেশ করতে হবে। সংক্ষেপে এটাই হল সমাজতন্ত্রের দিকে ভারতের নিজস্ব পথ উদ্ভাবনের যুগপৎ মূলসূত্র ও পূর্বশর্ত। পূর্বশর্ত বলছি এইজন্য যে বৈপ্লবিক সংগ্রাম কখন কোন মোড় নেবে, কোন রূপটি বা পদ্ধতিটি প্রধান হয়ে উঠবে সে কথা আগে থেকে ছক বেঁধে বলে দেওয়া চলে না।

আমার জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে এ দেশের বিপ্লব আন্দোলনের পক্ষে জাতীয় পরিস্থিতির তিনটি বৈশিষ্ট্যের উপর মনোযোগ দেওয়া দরকার।

প্রথমত, আমাদের এই বিশাল, বহুজাতিক, বহুভাষিক দেশে শুধু অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতেই নয়, সামাজিক জীবনে, দৈনন্দিন আচরণে, দেশের মানুষের মানসিকতায় সামন্তযুগের অবশেষগুলি প্রভূত পরিমাণে বজায় রয়েছে। তার সঙ্গে আছে দুই শতকের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া নানা সমস্যা ও ব্যাধি। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের কূটনীতিতে দেশের মানুষের মনে বিভিন্নরূপে ভেদবুদ্ধির যে বিষ সঞ্চারিত হয়েছিল তিন দশকের দুর্ভোগময় শাসন, ধনতান্ত্রিক পথের সঙ্কট, তাকে অত্যন্ত প্রকট করে তুলেছে। এখানে তাই দেখা যায় যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলির সঙ্গে বর্ণীয়, সাম্প্রদায়িক, বর্ণগত, ভাষাগত, প্রাদেশিক, আঞ্চলিক ইত্যাদি নানা ধরনের সমস্যা তালগোল মিলিয়ে জট পাকিয়ে রয়েছে। সেই জটের প্রধান গিঁটটা খুঁজে বার করাই যথেষ্ট নয়, অন্যান্য গিঁটগুলিকে সঠিক-ভাবে বুঝতে না পারলে শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণীগত আন্দোলন পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। বারবার তাই হয়েছে, এখনও হচ্ছে, ভবিষ্যতে হবে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে ঐসব সমস্যার সমাধান হবে না বলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোন কোন নেতাকে মত প্রকাশ করতে শুনেছি। তাঁরা এখন এগুলি নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজনবোধ করেন না। অথচ [illegible]

বছরের কঠিন পরিশ্রমে গড়ে তোলা গণ-সংগঠন ঐসব সমস্যা উৎকট রূপ ধারণ করলে তার আঘাতে হয় ভেঙ্গে পড়ে নতুবা দুর্বল হয়। এত বছরের মধ্যেও কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং তার মূল শক্তি শ্রমিকশ্রেণী সর্বভারতীয় আয়তনে নিয়ামক ভূমিকা দূরে থাকুক, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। শ্রমিকশ্রেণীর উপরেই কি কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব প্রধান স্থান দখল করতে পেরেছে? পারে নি। আমার ধারনা এই দুর্বলতার মূলে প্রধান কারণ হল উক্ত জটগুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারনার অভাব। তার উপর এখানে রয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্র। নির্বাচনের সময় বিভিন্ন দল জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক, বর্ণগত, ভাষাগত, প্রাদেশিক, আঞ্চলিক প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি দেয়। নির্বাচনে বাজীমাৎ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের ভেদবুদ্ধিতে উস্কানি দিয়ে থাকে। কমিউনিস্ট আন্দোলন যখন সংসদীয় রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছে তখন তাকেও এক সময় বা অন্য সময় সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে হচ্ছে। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের পর যে সব সমস্যার মোকাবিলা করেছিল এখানে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে কিছু পরিমাণে হলেও এই মুহূর্তে সেগুলির মোকাবিলা করতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। তবু আমরা এদিকে যথোচিত মনোযোগ দিই নি। আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই—মার্কসবাদ-বিরোধীরা প্রচার করে থাকে যে ভারতে শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব অচল। সে প্রচারের মোক্ষম জবাব হতে পারে শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বেরই সাহায্যে জটগুলির গ্রন্থি উন্মোচনের পথনির্দেশ।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী রাজনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, সুচতুর। তারা বৈদেশিক ক্ষেত্রে ও দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে manouvering অর্থাৎ যখন যেমন পরিস্থিতি সেই অনুসারে নমনীয় কৌশল অবলম্বনে দক্ষ। তার উপর রয়েছে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বের এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের ঐতিহ্য। স্বাধীনতা আন্দোলনে বুর্জোয়া নেতৃত্বের ভূমিকা যত দ্বিধাগ্রস্ত ও ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন, জনগণের সামনে অন্য কোন বিকল্প স্বাধীনতালাভের আগে বা পরে গড়ে ওঠে নি। ফলে জনমানসে সে ঐতিহ্যের প্রভাব এখনও প্রবল। স্বাধীনতার পরবর্তী ৩২ বৎসরে জাতীয় বুর্জোয়াদের অনুসৃত ধনতান্ত্রিক পথের সঙ্কট চরমে উঠেছে, রাজ-

নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট আপনা থেকেই জনগণকে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাবমুক্ত করে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের দিকে ঠেলে দেবে এমন কথা তত্ত্বগতভাবে দুই কমিউনিস্ট পার্টির কেউই বলেন না। কিন্তু কার্যত এই সত্যের উপর কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে?

আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের বর্তমান স্তরে জাতীয় বুর্জোয়া-শ্রেণীর, সীমিত হলেও যতটুকু প্রগতিশীল ভূমিকা আছে তাকে উপেক্ষা করা যেমন মস্ত ভুল হবে তেমনি প্রকাণ্ড ভুল সেই প্রগতিশীল ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করে দেখা। তত্ত্ব হিসাবে বর্তমানে উভয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব সে কথা স্বীকার করছেন। কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বৈতচরিত্র এবং manoeuvering-এর যথাযথভাবে মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন বুর্জোয়াদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে কি ভূমিকা নিয়েছে ও নিচ্ছে, কি কি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ তাদের ভূমিকাকে প্রভাবিত করেছে ইত্যাদির একটি তথ্য-ভিত্তিক সর্বাঙ্গীণ হিসেব-নিকেশ করা। এ কাজটিও উপেক্ষিত হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কেউ কেউ হয়ত কিছু কাজ করেছেন। উপরে যে ছটগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, বুর্জোয়া নেতৃত্ব সেগুলি ঢুকোশলে কাজে লাগিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে, নিজেদের প্রভাব বজায় রাখে। এখনও রাখতে সমর্থ হচ্ছে।

জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বৈতচরিত্রের কথা মনে রেখে তাদের সম্বন্ধে যথোচিত মনোভাব গ্রহণের প্রাথমিক কর্তব্য শ্রেণী হিসেবে তাদের কার্যকলাপের সম্যক মূল্যায়ন। বুর্জোয়াশ্রেণীর বিশেষ কোন পার্টি বা বিশেষ কোন নেতার আবরণ তথা তাৎক্ষণিক ভূমিকাটি গৌণ। তা বিচার করতে হবে উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে। অথচ কমিউনিস্ট আন্দোলনের উভয় অংশই প্রাথমিক কর্তব্যটিকে হয় উপেক্ষা নতুবা দায়সারা গোছের আলোচনা করে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন গৌণ বিষয়টির প্রতি। **Politics of expediency** অর্থাৎ যখন যেমন তখন তেমন নীতি বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক পার্টির পক্ষে সুবিধাজনক হলেও কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে নয়। তাতে ক্ষণস্থায়ী সুবিধা মিলতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী ফল ত' মেলেই না, এমন কি স্বল্পমেয়াদীও নয়।

সব চাইতে বড় কথা বুর্জোয়াশ্রেণীর বা তাদের বিশেষ কোন রাজনৈতিক

অগ্রই হোক, কমিউনিস্টদের পক্ষে ফলপ্রসূ হতে পারে যদি আমাদের পায়ের তলার মাটি শক্ত হয় অর্থাৎ গণভিত্তি সুদৃঢ় হয়। সেই কাজটিকে কোন না কোনভাবে উপেক্ষা করলে মৈত্রীর সুযোগে বুর্জোয়া পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে নিজের কাজ হাসিল করে। বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টিগুলির নেতৃত্বে যাঁরা আছেন তাঁরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে সদা সচেতন, কখন কিভাবে কাজ হাসিল করতে হয় তা ভালভাবেই জানেন। অন্যদিকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব সামাজিক উৎপত্তির (Social origin) দিক থেকে এখনও পেটিবুর্জোয়া। মনের দিক থেকে তাঁরা শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে একাত্ম হলেও জীবনের দিক দিয়ে নয়। যারা একসময়ে জীবনের দিক দিয়েও একাত্ম ছিলেন তাঁরা বর্তমানে নানা কারণে অনেক দূরে সরে এসেছেন। জনগণের সঙ্গে নাড়ীর যোগ না থাকলে সুচতুর বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতাদের ফাঁদে পা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে, আছে।

তৃতীয়ত, আমাদের দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র বজায় রয়েছে। যতদিন বজায় থাকে ততই ভাল ত' বটেই। উপরন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা ও প্রসারিত করার চেষ্টা শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজতন্ত্রের উত্তরণের জন্য সংসদীয় গণতন্ত্রকে কতদূর পর্যন্ত কাজে লাগানো যেতে পারে বা না পারে সেই তত্ত্বগত আলোচনার অবতারনা এখানে করতে চাই না। বলতে চাই অন্য কয়েকটি কথা।

বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা গিয়েছে, যে সব দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র বজায় আছে সেখানে বিপ্লব হয় নি। ব্যতিক্রম শুধু প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর জার্মানী ও হাঙ্গেরী। তখন ঐ দুই দেশের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্যান্য দেশে বিপ্লব না হওয়ার কারণটা সম্ভবত এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিক্ষোভ প্রকাশের পথ খোলা থাকে ততক্ষণ জনগণ সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য মানসিকতাকে তৈরি করে না। সে যাই হোক, যে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রয়েছে এবং জনগণের অধিকাংশ তাতে বিশ্বাস করে সেখানে তাকে এড়িয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক কার্যকরী হয় না। আমাদের দেশের স্বাধীনোত্তর যুগের অভিজ্ঞতায় তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংসদীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে মনোভাব ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। একেবারে গোড়ার দিকে মাথা তুলেছিল রঙ্গনের

পর্যন্ত সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের লক্ষ্য ছিল তার সম্বন্ধে জনগণের মোহমুক্তি ঘটানো। ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়ের পর নতুন নীতি গৃহীত হয়। তখন সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা, যেখানে ফ্যাসিস্ট শক্তি তার বিলোপ ঘটিয়েছে সেখানে নতুন করে প্রতিষ্ঠা আর সেই সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণই আশু প্রধান কর্তব্য বলে নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগে স্তালিন ঘোষণা করেন যে এখন শ্রমিকশ্রেণীকেই গণতন্ত্রের পতাকা হাতে তুলে নিতে হবে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে স্তালিনোত্তর নেতারা স্তালিনের বহু সমালোচনা করলেও ঐ ঘোষণাকে বাতিল করেন নি। ব্যতিক্রম চীনের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব। গণতন্ত্রের পতাকা শ্রমিকশ্রেণীর হাতে তুলে নেবার অর্থ নিছক সংসদীয় গণতন্ত্রকে অবিকল যেমন আছে তেমনি বজায় রাখা নয়। তার অর্থ সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোতে এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো যাতে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে শ্রমজীবী জনগণ নানাভাবে সক্রিয় অংশ নিতে পারে। গণতন্ত্রের সম্প্রসারণের এটাই প্রকৃত অর্থ এবং সেই জন্যই লেনিন বলেছিলেন, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে গণতন্ত্রকে যতদূর সম্ভব সম্প্রসারিত করা যাবে ততই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক হবে।

আমাদের দেশে স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে সংসদীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে মনোভাবের বারবার পরিবর্তন ঘটেছে। গোড়ার দিকে জনগণের মোহভঙ্গ ঘটানোটাই প্রধান কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। ১৯৬৭ সালে কেরলে কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর পার্টির মধ্যে কোন কোন অংশে একটা gradualism অর্থাৎ প্রথমে একটি রাজ্যে, পরে কয়েকটি রাজ্যে এবং পরিশেষে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসা যাবে এই রকম একটা আশা গড়ে উঠতে থাকে। ঐ ধারণায় দুটি বড় ত্রুটি ছিল (১) অন্যান্য বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণতাবাদী মনোভাব (২) প্রচলিত প্রশাসনিক কাঠামোতে বড় রকমের রদবদল না ঘটালে যে রাজ্যে বা কেন্দ্রে কোথাও জনগণের জরুরী সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব নয় সে সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব। তাছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণীর manouvring-এর ক্ষমতাকে অত্যন্ত ছোট করে দেখা হয়েছিল। উল্লিখিত ত্রুটিগুলির প্রভাব থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলন আজও মুক্ত নয়।

১৯৬২সালের পর কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক অংশ স্থির করে যে এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের আয়ু খুব বেশি দিন নয়। অতএব গার্হস্থিক ছক তৈরী হয়ে

বিপ্লবের অনুকূল কিনা, দেশের মানুষ সে জন্য কতটা প্রস্তুত তা যাচাই করে দেখা হল না। শুরু হল সেই অতীতের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অনুরূপ বিপ্লবের রোম্যান্টিক উন্মাদনা সৃষ্টি। অবশ্য সেই অতীত যুগের সঙ্গে একটু তফাৎ আছে বৈকি! তখন প্রকাশ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা উচ্চারণের পরিণতি হত নির্ঘাৎ কয়েক বৎসরের সশ্রম কারাবাস। এই যুগে ময়দানের মঞ্চে বা রঙ্গমঞ্চে সশস্ত্র বিপ্লবের উন্মাদনা সৃষ্টি করে নানাভাবে আসর জমানো যায়। ১৯৬৭ সালে হল মনোভাবের আর একবার পরিবর্তন। সি পি এম নেতৃত্ব সংসদীয় গণতন্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। যে তরুণদের মনে উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়েছিল তাদের এক অংশ সশস্ত্র বিপ্লবের আওয়াজ আঁকড়ে রইল বটে কিন্তু অচিরেই তাদের আন্দোলন পর্যবসিত হল নেহাৎ ছেলেমানুষী ধরনের নৈরাজ্যবাদী ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে। যখন নকশালবাদী আন্দোলন প্রথম শুরু হয় তখন ভেবেছিলাম যে আদর্শনিষ্ঠ তরুণেরা সত্যি সত্যি যদি গ্রামে যেয়ে কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাস করতে পারে তাহলে বাস্তব পরিস্থিতির আসল চেহারাটা তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রোম্যান্টিক মোহ যাবে কেটে, লাভ হবে স্তিমিতপ্রায় কৃষক আন্দোলনে নতুন শক্তি সঞ্চার। যারা অতীতের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছেন তাদের বেশ কিছু সংখ্যক কর্মী ১৯৩৮-৪৬ সালে বন্দীশালা থেকে মুক্তি লাভ করে কৃষকদের মধ্যে যেয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনের শরীক হয়ে থেকে কাজ করেন। তাই সেদিন অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু হতাশ হতে হল। এ যুগের মধ্যবিত্ত তরুণেরা সামান্য কয়েকদিনের বেশি গ্রামে টিঁকতে পারলেন না। অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম আছে। মোটের উপর তাঁদের আন্দোলন হয়ে পড়ল শহর-কেন্দ্রিক আর চমক সৃষ্টি হল কাজের প্রধান অঙ্গ। অনেক কঠিন মূল্য দিয়ে আজ তাঁরা ভুলটা বুঝতে পেরেছেন। তবে ভুলের গোড়া খুঁজে পেয়েছেন মনে হয় না।

১৯৭২ সাল থেকে সি পি এম নেতৃত্বের মধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে মনোভাবে আবার পরিবর্তন দেখা দিল। স্বৈরতন্ত্রের বিপদ ঘনীভূত হচ্ছে সে কথা তাঁরা সবার আগে বুঝেছিলেন একথা সত্য। কিন্তু তা থেকে ঠিক সিদ্ধান্ত করা হয় নি। স্বৈরতন্ত্রের বিপদকে প্রতিরোধ এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য যতটুক উদ্যোগ নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল তা করা হয় নি।

বরং সংসদীয় গণতন্ত্রের বিলোপ অনিবার্য এইরূপ ধারণা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। ১৯৭৭ সালের মার্চের পর হল মনোভাবে আর এক বড় পরিবর্তন, যার ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় সি পি এমের নেতৃত্বে গঠিত হল বামফ্রন্ট সরকার।

পরিস্থিতি অনুযায়ী কৌশল পাল্টাতে হয়—সে কথা অবশ্যই মানি। আমার বক্তব্য হল পরিপ্রেক্ষিত পরিষ্কার থাকা চাই। পরিষ্কার থাকলে হঠাৎ হঠাৎ কৌশল পরিবর্তনে পার্টি বা আন্দোলনের মধ্যে সংকট সৃষ্টি হয় না। পরিপ্রেক্ষিত পরিষ্কার থাকা বলতে কি বোঝাতে চাইছি ব্যাখ্যা করার আগে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অপর অংশ অর্থাৎ সি পি আই নেতৃত্ব সংসদীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে কি মনোভাব নিয়েছেন সে সম্পর্কে আমার ধারণা ব্যক্ত করা দরকার। আমার মনে হয়, ১৯৬২ সাল থেকে সি পি আই নেতৃত্ব ক্রমশ সংসদীয় গণতন্ত্রের বুর্জোয়া পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। নতুবা বর্তমান রাষ্ট্রিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতে মৌলিক ধরনের রূপান্তর না ঘটিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে, এই ধরনের মোহের উদ্ভব কি করে সম্ভবপর হয়? একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় ঐ মোহ কতখানি সর্বনাশা হতে পারে অথচ তাকেই পার্টির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে সযত্নে লালন করা হয়েছে।

এবার আসি পরিপ্রেক্ষিত বলতে কি বোঝাতে চাই সেই কথায়। কোন দক্ষ সেনাপতিমণ্ডলী যখন কোন বিশেষ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখন সেই রণক্ষেত্রটির সুবিধা-অসুবিধা, অনুকূল ও প্রতিকূল দিকগুলি সমস্ত বিবেচনা করে একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন। আমরা, ভারতের কমিউনিস্টরা যখন ১৯৫২ সালে সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করি ঠিক সেই মুহূর্তে অবশ্য এরকম কোন পরিকল্পনার রূপরেখা রচনা সম্ভব ছিল না। একে ত' তখন সংসদীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে কিরূপ মনোভাব নেওয়া হবে তাই নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। উপরন্তু ছিল অভিজ্ঞতার অভাব। কিন্তু প্রথম পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতার পর এই কাজে হাত দেওয়া যেত। তখন ত' করা হয়ই নি, কয়েক দশক অতীত হওয়ার পরও হয় নি। সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন এবং যারা এ ধরনের কাজ করতে পারেন তাঁরা কেউই এগিয়ে আসেন নি। বাধ্য হয়েই, সংসদীয় গণতন্ত্রের মঞ্চে দশ বৎসরের

সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে কাজ করার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিক অর্থাৎ সম্ভাবনা ও বিপদ দুইই আছে। ইতিবাচক দিকের মধ্যে সভাসমিতি, সংগঠন, মতপ্রকাশ, প্রচার অভিযান ইত্যাদির সুযোগ ত' আছেই। সবচেয়ে বড় সুযোগ—সংসদীয় মঞ্চের মাধ্যমে আমরা জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশের, যারা কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংগঠিত প্রভাবের আওতার বাইরে আছে, তাদের কাছে বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারি। উক্ত পরিকল্পনায় সুযোগের সদ্ব্যবহারের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি কাজ হল (১) জাতীয় পুনর্গঠনের একটি বিকল্প পথের রূপরেখা মূর্তভাবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারি। সংসদীয় মঞ্চে তথ্যসংগ্রহ, বিভিন্ন সমস্যার নানা দিক ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানলাভের যেসব সুবিধা রয়েছে সেগুলিকে কাজে লাগাতে পারি। (২) ধনতান্ত্রিক পথের সংকটের চরিত্রকে বহু মূর্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে তুলে ধরে জনগণের জীবনের দৈনন্দিন সমস্যাবলীর সঙ্গে সঙ্কটের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বোঝাতে পারি। (৩) সংসদীয় মঞ্চে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিরা জনগণকে সংগ্রামের মূল লক্ষ্য থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য যেসব কৌশল অবলম্বন করে সেগুলির প্রকৃত মতলব ও চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখাতে পারি। এ কাজটি নিছক নেতিবাচক নয়। গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেকটি পদক্ষেপের গুণাগুণ বিচার করে দরকারমত কখনও বিরোধিতা, কখনও আংশিক বিরোধিতা ও আংশিক সমর্থন, কখনও বা শর্তসাপেক্ষ সমর্থন, নিজস্ব বিকল্প প্রস্তাব, সংশোধনী, বে-সরকারী বিল উত্থাপন ইত্যাদি বহুবিধ উপায় রয়েছে। সব ক্ষেত্রেই সংশোধনী বা বিকল্প প্রস্তাব ইত্যাদি শ্রমজীবী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তুলে ধরা (৪) জনগণের দাবীদাওয়া, আংশিক দাবীদাওয়ার জন্য সংগ্রামের প্রতি সমর্থন, গণ-আন্দোলনের উপরে নিপীড়ন তথা দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিরোধের সমর্থনে একনিষ্ঠ যোদ্ধা হিসাবে তাদের রাজনৈতিক আস্থা অর্জন করা (৫) গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণের জন্য, সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের ভিত্তিতে নিরলস সংগ্রাম পরিচালনা (৬) সংসদের বাইরে জনগণের আংশিক দাবী পূরণের সংগ্রাম, বিক্ষোভ ইত্যাদি সংগঠিত ও সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক শিক্ষামূলক প্রচার অভিযানের দ্বারা মৌল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলা। এইভাবেই প্রকৃত প্রস্তাবে সংসদীয় ও সংসদ বহির্ভূত কার্যকলাপের সমন্বয় ঘটিয়ে তাদের সচেতন করে তোলা।

এইভাবেই প্রকৃত প্রস্তাবে সংসদীয় ও সংসদ বহির্ভূত কার্যকলাপের সমন্বয় ঘটিয়ে তাকে মূল লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করা যেতে পারে।

এবার নেতিবাচক দিকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক: (১) বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবেশে একটানা দীর্ঘদিন থাকার ফলে বৈপ্লবিক নিষ্ঠা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় ভাটা পড়ার বিশেষ আশঙ্কা থাকে। (২) পার্টির অভিজ্ঞ পরীক্ষিত নেতাদের অধিকাংশই যদি সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন তাহলে গণসংগঠনের কাজটি ক্রমশ উপেক্ষিত হতে থাকে। (৩) সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশের আগে পার্টির সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তা ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে। জনগণের কাছে যাওয়া হয় যখন কোন সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল, আন্দোলন, সম্মেলন ইত্যাদির প্রয়োজন দেখা দেয়। (৪) তাৎক্ষণিক নির্বাচনী সাফল্যের খাতিরে সুবিধাবাদী আঁতাত করার প্রবণতা বড় হয়ে ওঠে (৫) সংসদের মধ্যে মৌল প্রশ্নগুলি তুলে ধরার বদলে অ্যাজিটেশান তথা অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা ও চমক সৃষ্টির সাহায্যে আসর মাৎ করার প্রবণতা। এইভাবে সস্তায় বাজিমাৎ করার ঝোঁকটা সংসদের বাইরের কাজকর্মে ক্রমশ সঞ্চারিত হতে থাকে।

কমিউনিস্টরা সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের আড়াই দশক অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। এই সময়কালে অনুষ্ঠিত কার্যকলাপের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকের একটা সামগ্রিক হিসেব নিকেশের প্রয়োজন আছে।

চতুর্থত, আমাদের দেশে বামপন্থী জাতীয়তাবাদের প্রভাব রাজনীতি-ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রবল। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে তার কোন সংগঠিত পার্টি নেই বটে তবে বাম ও গণতান্ত্রিক বহু মানুষের মানসিকতায় এই ধারার অস্তিত্ব যথেষ্ট শক্তিশালী। এমন কি যেসব অ-কমিউনিস্ট—বামপন্থী পার্টি মার্কসবাদে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করেন তাঁদের উপরেও এই ধারার প্রভাব প্রবল। কংগ্রেস ও জনতা পার্টি দুইয়েরই মধ্যে যেসব প্রগতিশীল ব্যক্তি আছেন বলে বর্তমানে সি পি আই ও সি পি এম উভয় পার্টিই স্বীকার করছেন তাঁদের অধিকাংশকে এই পর্যায়ে ফেলা যায়। এরা দেশের শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে মৌলিক রূপান্তর সাধনের সংগ্রামে অনেক দূর পর্যন্ত যাবেন কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের সম্বন্ধে এঁদের ধারণা স্পষ্ট নয়। তাছাড়া শ্রেণী অবস্থানের দিক থেকে পেটিবুর্জোয়া হওয়ার দরুন এদের মধ্যে অনেক দোদুল্যমানতা, দ্বিধা প্রভৃতি আছে। সেইজন্যই এঁরা অনেক ক্ষেত্রে

জনগণের উপর বুর্জোয়া প্রভাব বজায় রাখতে সাহায্য করেন নিজেদের অজানিতে। সর্বোপরি বামপন্থী জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্ব হল এই যে এঁরা সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদবিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরাধীন দেশগুলির মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নে এঁদের অবস্থান কমিউনিস্টদের অবস্থানের থেকে ভিন্ন। আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে জাতীয় পরিস্থিতির সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে এঁরা pragmatic বা ব্যবহারবাদী নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী। এই শক্তিটি জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের বর্তমান পর্যায়ে মিত্রশক্তি নিঃসন্দেহে। তবে মিত্রতাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে হলে এঁদের বুর্জোয়া চিন্তাধারা, মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব থেকে মুক্ত করে আনার জন্য নিরলস প্রয়াসের প্রয়োজন আছে। বন্ধুভাবাপন্ন আলোচনা ও সমালোচনার সাহায্যেই সেটা করা সম্ভব। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে বামপন্থী জাতীয়তাবাদ এযাবৎ বিভিন্ন পর্যায়ে কি কি ভূমিকা নিয়েছে সেটি পর্যালোচনা করে দেখতে হবে, ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকের প্রতি দৃষ্টি রেখে। বৃহত্তর বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলার পক্ষে এই কর্তব্যটিও অপরিহার্য। এঁদের সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণতাবাদও মুরুব্বিয়ানার মনোভাব বর্জন করতে হবে আর সেই সঙ্গে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর ভ্রান্তিগুলিকে, কর্মক্ষেত্রে দ্বিধাগুলিকে, মিত্রসুলভ আলোচনার সাহায্যে তুলে ধরতে হবে। কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে এঁদের তরফ থেকে যেসব সমালোচনা ও সংশয় রয়েছে সেগুলিকে জানার ও বোঝার চেষ্টা করতে হবে অত্যন্ত সহিষ্ণুভাবে।

আমার মনে হয় উভয় কমিউনিস্ট পার্টি'র উপরোক্ত চারটি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা অবশ্য কর্তব্য। দুই পার্টি'র মধ্যে ঐক্যের কামনা যদি দৃঢ়ভাবে দানা বেঁধে উঠতে থাকে তাহলে উপরোক্ত প্রচেষ্টার সমস্ত ক্ষেত্রে যৌথ কার্যক্রম, চিন্তাবিনিময়, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা দুই পার্টি'র কর্মীদের পরস্পরের কাছে আসতে সাহায্য করবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যে দেয়াল গড়ে উঠেছিল, একের অপরের সম্বন্ধে যে ছুৎমার্গী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল তার অবসান চাই। মনে রাখা দরকার যে বিশের দশক থেকে

ধরতে হয় তবে দুই পার্টির প্রবীণ কর্মীদের সহযোগিতা ছাড়া তা সম্ভব নয়। এর অন্যথায় যা হবে সেটা হবে একদেশদর্শিতার দোষে দুষ্ট সুতরাং প্রকৃত ইতিহাসের কিছু না কিছু পরিমাণে অঙ্গহানি বা বিকৃতি ঘটতে বাধ্য। কমিউনিস্ট আন্দোলনে গত এক দশকের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে যেসব কর্মী এসেছেন তাঁদের কাছে এবং ভাবীকালের প্রজন্মের কাছে ইতিহাসের তথানিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরার দায়িত্ব কি কেউ এড়িয়ে যেতে পারেন ?

আমার একান্ত বিশ্বাস, আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপরোক্ত মৌল দুর্বলতাগুলির প্রতি মনোযোগ না দিয়ে বা এড়িয়ে গিয়ে কমিউনিস্ট ঐক্যের পথে বেশিদূর এগোনো সম্ভব হবে না। দেশের রাজনৈতিক জীবনে নিয়ামক ভূমিকা দূরে থাকুক, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়াও সম্ভব হবে না।

সি পি আই এবং সি পি এম কোন পার্টিকে বা পার্টি নেতৃত্বকে আক্রমণ অথবা হেয় করার অভিপ্রায় আমার নেই। আমি সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন অংশীদার হিসাবে যা ভেবেছি অকপটে নিবেদন করেছি। সমস্ত মতপার্থক্য সত্ত্বেও সকলকেই সহযোদ্ধা হিসাবে বিবেচনা করি। বহুদিন ধরে মনে যেসব প্রশ্ন জমে আছে, পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে যেসব মনোবেদনা সেগুলিকে খোলাখুলিভাবে সকলের সামনে তুলে ধরছি।

ঐক্য প্রচেষ্টার আশু পরিস্থিতি

আশু সম্ভাবনা যা দেখা যাচ্ছে তাতে দুই পার্টির ঐক্যকে কেউ দূর-ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে গ্রহণ করেছেন মনে হয় না। ভাতিণ্ডা ও জলন্ধর অধিবেশনের পর দুই পার্টির নেতাদের মধ্যে এক দফা আলোচনা হয়েছে। যৌথ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের প্রস্তাব স্বীকৃতি লাভ করেছে। তারপর বিভিন্ন রাজ্যস্তরে আলোচনা চলেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে গণ-সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে। সূচনা শুভ সন্দেহ নেই। তবে উভয় পার্টির বক্তব্য পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে এখনও বহু চড়াইউৎরাই এবং গিরিসঙ্কট পেরোতে হবে। মনে হয় যেন উভয় পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্যটাকেই বড় করে দেখাবার

দেওয়া হয় তাহলে অবশ্য ব্যবধানটা বড়। সি পি আই নেতৃত্ব মনে করেন যে বর্তমানে প্রধান লক্ষ্য কেন্দ্রের জনতা পার্টির গভর্ণমেন্টের জনস্বার্থবিরোধী নীতি ও কাজের বিরুদ্ধে অভিযান। সি পি আই নেতৃত্ব জনতা পার্টি এবং উভয় কংগ্রেসকে একই পর্যায়ভুক্ত করেন। অন্যদিকে সি পি এম নেতৃত্ব মনে করেন যে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও রক্ষাকারী শক্তি হিসাবে জনতা পার্টির ভূমিকা এখনও নিঃশেষিত হয় নি। অতএব জনতা পার্টি এখনও মিত্রশক্তি, অভিযানের প্রধান লক্ষ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারের স্থায়িত্বের স্বার্থেও তাঁরা অন্ততঃপক্ষে অদূর ভবিষ্যতে কেন্দ্রের জনতা সরকারের সঙ্গে কোন সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে চান। অবশ্য এটা তাঁদের দীর্ঘমেয়াদী নীতি নয় বলে বলা হচ্ছে। তাঁদের মতে স্বৈরতন্ত্রের প্রধান বিপদ এখনও ইন্দিরা কংগ্রেস, সুতরাং অভিযান তার বিরুদ্ধে পরিচালনা করতে হবে। আমার মনে হয় দৃষ্টিকে নাকের ডগায় সীমাবদ্ধ না করে যদি একটু বড় পরিসরে প্রসারিত করা যায় তাহলে দুই পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীর আপাত পার্থক্যকে অতিক্রম করা আদৌ কঠিন নয়। গণতন্ত্রের উপরে আক্রমণ, স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ইত্যাদি বুর্জোয়া শ্রেণীর বিশেষ কোন পার্টি বা নেতার একচেটিয়া ব্যাপার নয়। তা আকস্মিক-ভাবে কারুর মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত হয় নি। দুই কমিউনিস্ট পার্টিই বলছে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মূল রয়েছে ধনতান্ত্রিক পথের গভীর সঙ্কটের মধ্যে নিহিত। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে প্রাক্তন শাসক পার্টি প্রথমে চেষ্টা করেছিল বামপন্থী আওয়াজ দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে রাখতে। সেই কৌশলের অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা যখন তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল তখন থেকেই শুরু হয় স্বৈরতন্ত্র তথা ব্যক্তিতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। জরুরী অবস্থা যেভাবে ঘোষিত হয় এবং জরুরী অবস্থার সময়ে যতটা বাড়াবাড়ি হয় ঠিক ততখানি হয়ত প্রাক্তন শাসকপার্টির কর্ণধারদের সকলের অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু তাপমাত্রার হেরফের হলেও তাঁরা সকলেই ছিলেন অল্পবিস্তর পরিমাণে সেই প্রয়াসের অংশীদার। তাঁদের শ্রেণীভিত্তি ও চরিত্রই সেদিকে ঠেলে দিচ্ছিল। জনতা পার্টিও বুর্জোয়া শ্রেণীর পার্টি। জনতা সরকারের অধিকাংশ নেতারাও দীর্ঘদিন প্রাক্তন শাসকপার্টির শীর্ষে ছিলেন। তাঁরাও ছিলেন ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ এবং সেজন্য সৃষ্ট সঙ্কটের অংশীদার। এখনও জনতা পার্টি ধনতান্ত্রিক

প্রবণতা এক বৎসরের মধ্যেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। মেহনতী মানুষের বিরুদ্ধে দমননীতি জরুরী অবস্থার পর্যায়ে না পৌঁছালেও প্রাক্তন শাসকপার্টির আমলে প্রাক জরুরী অবস্থায় যেমনভাবে চলেছিল সেভাবেই চলেছে। দেশে যে অস্থিতিশীল অবস্থা চলেছে তাতে ১৯৭৯ সালে কি পরিস্থিতি দেখা দেবে কেউ বলতে পারে না। সি পি এম নেতারাও স্বীকার করেন যে স্বৈরতন্ত্রের বিপদ কখন কোন দিক থেকে আসবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সি পি এম নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে অদূরভবিষ্যতে হয়ত এমন অবস্থা আসতে পারে যখন স্বৈরতন্ত্রের বিপদের বিরুদ্ধে সাময়িকভাবে হলেও ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে হতে পারে। জনতা গভর্ণমেন্টের বেশ কিছু নীতি ও কাজের বিরুদ্ধে সি পি এমকে এরই মধ্যে সোচ্চার হতে হচ্ছে, প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করতে বা তাতে যোগ দিতে হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে মনোযোগকে নাকের ডগায় কেন্দ্রীভূত করে রাখা কি রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয়? কেন দুই পার্টি ধনতান্ত্রিক পথের উচ্ছেদ, বুর্জোয়া শাসনের উচ্ছেদ, জনগণের স্বার্থে মৌলিক সামাজিক অর্থনৈতিক রাষ্ট্রিক রূপান্তরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করাকে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করতে সমর্থ হবে না। ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কাজটি ত' রাতারাতি হওয়ার মতন ব্যাপার নয়। সেজন্য চাই দীর্ঘস্থায়ী ধৈর্যশীল প্রয়াস। বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের লক্ষ্য ত' কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা এবং আশু দাবীদাওয়া পূরণের আন্দোলন নয়। তা যুগপৎ গণতন্ত্রকে প্রসারিত করার মৌল দাবিগুলির পিছনে শ্রমজীবী জনগণকে সমাবেশ করার, তাদের রাজনীতি সচেতন ও শিক্ষিত করে তোলার আন্দোলন। আমাদের দেশের বর্তমান বিষয়গত পরিস্থিতি, তাতে উক্ত মূল প্রশ্নগুলিকে আজকার দিনের কর্মসূচী হিসাবে জনগণের সামনে তুলে ধরার মুহূর্ত সমাগত। আর এইটাই হল গণতন্ত্র রক্ষা ও সম্প্রসারণের সবচেয়ে শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচ—বুর্জোয়াশ্রেণীর কোন বিশেষ পার্টির সাময়িক ভূমিকা বা নেতৃত্বের মতিগতি গৌণ জিনিস: তার মূল্য নেই বলি না কিন্তু উক্ত সামগ্রিক প্রয়াসের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে অবশ্যই তার মূল্য বেশি নয় বা বেশিদিন স্থায়ী হওয়ার নিশ্চয়তাও নেই।

খুব বেদনার সঙ্গেই বলতে হয়, এক চক্ষু হরিণের নীতি অনুসরণ করাটা [illegible]

পার্টিতে এবং ভাগাভাগি হওয়ার পরে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন প্রশ্নে কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক অংশ অথবা অপর অংশ ঐ নীতি অনুসরণ করেছেন। ফলে, যেদিক থেকে বিপদের আশঙ্কা নেই মনে করা হয়েছে বিপদ এসেছে ঠিক সেই দিক থেকেই। এছাড়া ঐক্য প্রচেষ্টার পথে আর একটি বিশেষ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। দুই পার্টি'র মধ্যে যেমন অনেকে আন্তরিকভাবে ঐক্য কামনা করেন তেমনি ঐক্যবিরোধী উপাদানও উভয় পার্টি'তে যথেষ্ট প্রবল। সেদিকে অতন্দ্র সতর্কতার প্রয়োজন আছে।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা ও তার সম্বন্ধে মনোভাব

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার, বিশেষত তার প্রধান শক্তি সি পি এমের উপর ইতিহাস অত্যন্ত গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার কিভাবে কাজ করেন, কতটা সাফল্য অর্জন করেন বা না করেন তা সারা ভারতে কমিউনিস্ট ঐক্য তথা বৃহত্তর বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলার কাজকে প্রভাবিত করবে। তার উপর নির্ভর করবে বুর্জোয়া পার্টি'গুলি সম্বন্ধে শ্রমজীবী জনগণের মোহমুক্তির প্রক্রিয়া কতটা ত্বরান্বিত হবে। পশ্চিমবঙ্গ আজ সারা ভারতের পরীক্ষাক্ষেত্র। ইতিহাস যে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে সে বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকারের শরীক দলগুলির, বিশেষত সি পি এম নেতৃত্বের যেমন সজাগ হওয়া প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সি পি আই সহ অন্যান্য বাম ও গণতন্ত্রী মনোভাবাপন্ন পার্টি' ও নাগরিকদের। সি পি এম নেতৃত্ব যেকোন প্রকারে পার্টির প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টার বদলে যদি তাঁরা ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিত ও দূরদৃষ্টি নিয়ে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন তাহলে সারা ভারতের বাম ও গণতন্ত্রী মনোভাবাপন্ন মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করবেন। অন্যদিকে সি পি আই সহ অন্যান্য বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির কর্তব্য হল এই সরকার যাতে ঘোষিত লক্ষ্যের দিকে সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারেন সেজন্য সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করা। সহযোগিতার অর্থ অন্ধ বা নিঃশর্ত সমর্থন নিশ্চয়ই নয়। সরকারের ভুলত্রুটি বিচ্যুতিগুলি দেখিয়ে দিতে হবে।

বড় জিনিস হল মনোভাব। যাঁরা এই সরকার পরিচালনা করছেন তাঁরা আমাদের সহযোদ্ধা। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আমরাও সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা দুটোরই অংশীদার। দুটোরই দায় আমাদের উপর বর্তাবে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বাইরে রয়েছে শ্রমজীবী জনগণের যে বিশাল অংশ তাদের উপর এই সরকারের সাফল্য বা অসাফল্য বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে।

বামফ্রন্ট সরকার সংযমের যে পরিচয় দিচ্ছেন তা বজায় রাখার অর্থ অবশ্যই গণ আন্দোলন গড়ে তোলা এবং মূল দাবীগুলির পিছনে সমাবেশ করার কাজে নিষ্ক্রিয়তা বা ঔদাসীন্য হতে পারে না। আন্দোলন বলতে আমি শুধু আংশিক দাবী দাওয়ার আন্দোলনের কথা বলছি না। যে পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছেন তার পটভূমিতে গণ-আন্দোলনকে নতুন রূপ দিতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার কোন বৈপ্লবিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন নি। বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোতে রাজ্য সরকারের হাতে যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতা রয়েছে তাই নিয়ে কাজ করতে হবে। অথচ তাঁদের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। কয়েক দশক ধরে নির্বাচনী অভিযানে জনগণকে এটাই বোঝানো হয়েছে যে রাজ্যস্তরেও শাসকদলের পরিবর্তন ঘটলেই অনেক সমস্যার সমাধান হবে। তাছাড়া বড় কথা, জনগণের দৈনন্দিন জীবনের জরুরী সমস্যাগুলি এমন চরম সীমায় পৌঁছেছে যে তারা সমস্যার সুরাহা ছাড়া অন্য কোন কথা শুনতে প্রস্তুত নয়। বর্তমান পরিস্থিতির বিপজ্জনক সম্ভাবনার মূল এখানে নিহিত। বিষয়গত দিক থেকে এক হিসাবে পরিস্থিতিকে বৈপ্লবিক বলা চলে অর্থাৎ বর্তমান অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক কাঠামোর একেবারে শিকড় ধরে টান না দিলে জনগণের দৈনন্দিন জীবনের জরুরী সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু সেই সত্যটি সম্বন্ধে জনগণ সচেতন নয়। সমস্যার গোড়া কোথায় বা কিভাবে, কোন পথে সমাধান সম্ভব সে সম্বন্ধে তাদের মনে বহু ধরনের প্রচুর বিভ্রান্তি রয়েছে। সেইজন্য বিষয়গত দিক থেকে পরিস্থিতিকে বৈপ্লবিক বলা গেলেও বিষয়ীগত অর্থাৎ মানসিক প্রস্তুতির দিক থেকে বলা চলে না। ফলশ্রুতি—জনগণের মনে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ সঠিক পথনির্দেশের অভাবে বিভিন্ন

প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক প্রভৃতি নানা বিভেদের শক্তি এবং সমাজবিরোধী উপাদানগুলি।

বৈপ্লবিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় এলে যেভাবে সমস্যাগুলির মোকাবিলা সম্ভব হত, তা হচ্ছে না। বর্তমানে ত' নয়ই, অদূর ভবিষ্যতেও সে সম্ভাবনা নেই। এহেন অবস্থায় সর্বপ্রধান কর্তব্য জনগণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষামূলক রাজনৈতিক প্রচার অভিযান রাজ্য সরকারের হাতে যে সীমিত ক্ষমতা আছে তার সদ্ব্যবহার দ্বারা জনগণের সমস্যার যতটুকু সুরাহা করা যায় এবং আংশিক দাবিদাওয়ার আন্দোলন পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে গণআন্দোলনকে এক নতুন dimension বা আয়তন দিতে হবে যাতে তারা সমস্যাগুলির প্রকৃত স্বরূপ এবং সমাধানের পথ সম্বন্ধে অতিদ্রুত সচেতন হয়ে ওঠে। অভিযান পরিচালনা করতে হবে নানা পদ্ধতিতে, নিরবচ্ছিন্নভাবে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনায় যে উদ্যোগ বামফ্রন্ট নিয়েছেন তেমনিভাবে অন্যান্য মৌল সমস্যা যথা : বর্তমান অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক কাঠামোর প্রকৃতি, শিল্পায়ন ও কৃষির উন্নতির সম্পর্ক, ভূমি সংস্কার, কর্মসংস্থান, মজুরী বনাম মূল্যবৃদ্ধি, প্রকৃত অর্থে শিক্ষাসংস্কার, আঞ্চলিক বৈষম্যের মূল কারণ ইত্যাদি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও বিশ্লেষণের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। আলোচনাকে শহুরে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শহরের ও গ্রামের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে, অবশ্য তাদের বোধগম্যভাবে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য অঞ্চলে এবং তরাই ও ডুয়ার্সের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে প্রায় দুই দশক কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের যাঁরা অগ্রণী কর্মী তাঁদের মধ্যে অনেক কিছু জানার প্রবল আগ্রহ আছে। আমরা দিতে পারি নি, দিই নি বা অতি সরলীকৃত কয়েকটি স্লোগান দিয়ে কাজ সারতে চেয়েছি। এখন পরিস্থিতি অনেক বেশি কিছু দাবী করে। সে ডাকে সাড়া দিলে পার্টির বিপুলসংখ্যক কর্মী নিষ্ক্রিয়তার অবসাদ কাটিয়ে উঠতে পারবেন, ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ গণকার্যক্রমের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হবে।

কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ (৮)

রণেন সেন

ঘটনাবহুল ১৯৩৬ সাল

পার্টির রাজনীতির মোড় ঘুরল। প্রকাশ্য কাজের হাল ধরা সোজা ছিল না। আবার সেই পুলিশের আনাগোনা, অর্থাভাব, প্রায় অর্ধাহারই শুরু হল। বাইরে প্রকাশ্য সভাসমিতি সংগঠিত করার মত লোকও কম। সারা ভারত পার্টিরও সেই অবস্থা প্রায়। তবে নিত্যানন্দ চৌধুরী '৩৬ এর গোড়ায় ছাড়া পাওয়াতে আবার দুজনে কিছু করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হলাম।

১৯৩৬ এর মার্চ-এপ্রিল নাগাদ যোশী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গোপন পার্টি কেন্দ্রের হাল হাতে নিলেন। তার প্রথম কাজ হল পার্টিকে সংগঠিত করা, নতুন লাইনে প্রস্তুত করা, দ্বিতীয় কাজ হল অন্য যে সব ব্যক্তি ও পার্টি মার্কসবাদে বিশ্বাসী অথচ পার্টির বাইরে বা অনেক ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী সেইসব ব্যক্তি ও পার্টিকে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আনার চেষ্টা করা। দ্বিতীয়টির রাস্তা সুগম হল প্রথমেই লেবার পার্টির সভ্যদের আনার সম্ভাবনা দেখা দিল। নীহারেন্দুর লণ্ডন থাকাকালে ডাঃ জেড এ আহমদ, ডাঃ কে এম আশরফ ও সাজ্জাদ জহীরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, একই মার্কসবাদী ছাত্র গ্রুপে ছিলেন। তাঁদের কথা হয় বিলেতেই যে, দেশে এসে কমিউনিস্ট পার্টি করতে হবে। নীহারেন্দু এসেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগাযোগ না করে লেবার পার্টি শুরু করে। খানিকটা আত্মম্ভরিতার বশবর্তী হয়ে উল্টো রাস্তায় যায়। কিন্তু '৩৬ এ ডাঃ আহমদ প্রভৃতি দেশে ফিরে পার্টিতে সোজা চলে আসেন ও নীহারেন্দুকেও পাকড়াও করেন। ফলে নীহারেন্দু সমেত অনেক লেবার পার্টির সভ্যই আমাদের পার্টিতে যোগ দেন। যোশী সৌম্যেনের সঙ্গেও যোগাযোগ করে। এবং ঠিক হয় বাংলার পার্টির সঙ্গে মিটমাট করার প্রচেষ্টা হবে। সৌম্যেনের সঙ্গে যোশী যোগাযোগ রাখতেন। এও ঠিক হয় অজয় কলকাতা এসে দুদলের নেতাদের একত্রে বসাবে।

এদিকে বাংলাদেশের পার্টির অবস্থা মোটামুটি কাজ চালিয়ে যাওয়ার মত। আমার শরীর অনাহারে ও পরিশ্রমে ভেঙ্গে পড়েছিল। কিন্তু উপায় ছিল না —আমার ও নিত্যানন্দর ঘাড়ে গণসংগঠন এ্যাজিটেশন, টি ইউ প্রভৃতির ভার। একদিন পথে এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। সে আমাকে জোর করে তার মেসে রাখল তার খরচায়। তখন দিনকয়েক দুবেলা খাওয়া জুটল।

এমন একদিনে দুটি ঘটনা ঘটে। বোম্বাই থেকে পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সভা চিংলে ৪১নং মারফৎ আমার মেসে হাজির। সে বলল যে খুবই একটা গোপন ব্যাপার আমাকেই হাতে নিতে হবে। বাংলাদেশের হোম সেক্রেটারী আই সি এস মাইকেল ক্যারিট সি পি জিবির গোপন সদস্য। সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় যাতে পার্টির সাথে তার যোগাযোগ থাকে। বোম্বাইতে ঐ রকম উচ্চপদে আর একজন বিলেতের কমিউনিস্ট ছিলেন যার মারফৎ ক্যারিটের খবরটা বোম্বাই পার্টি পায় ও সেই কথা আমাকে সশরীরে বলতে আসে। অন্তত চিংলের বক্তব্য এই ছিল।

কোড মত আমি ও চিংলে লিটল রাসেল স্ট্রীটের পূর্বের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকি সন্ধ্যার কিছু পরে। ধীরে একখানা গাড়ী গায়ে এসে লাগে ও আমরা তাতে উঠে পড়ি। গাড়ীটা একজন সায়েব চালাচ্ছিলেন বুঝলাম সেই ক্যারিট। আমরা অন্ধকারে গাড়ীতে বসে কথাবার্তা চালালাম। ঠিক হল আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না। তবে যোশী এলে সেই যাহোক ব্যবস্থা করবে।

তখন বয়সটা অল্প। ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্চিকও আর যা তা লোক নয়, একেবারে সাহেব হোম সেক্রেটারী! তখন থেকে এক কপি করে ইনপ্রিকর ও অন্যান্য সি আই-এর দলীল ইংরাজীতে পাওয়া শুরু হল। কারণ ক্যারিট তো নিজেই সরকারের জন্য অনেক কপি আনাত। আমাদের বাংলা পার্টির মধ্যে কোনও পুলিশের চর আছে কিনা সেটা ক্যারিট আই বি, এসবির কন্‌ফিডেন্সিয়াল ফাইল দেখে আমায় জানাবে। তৃতীয়, আসন্ন ধরপাকড়ের খবর আমাকে জানাবে। আমি আমার একটা টেক ব্যবস্থা করলাম দুই হাসপাতালের দুই বন্ধুর মারফৎ। সুতরাং একেবারে পাকা ব্যবস্থা হয়ে থাকল। ১৯৩৬-এ ইউরোপ থেকে চিকিৎসা শেষে সুভাষবাবুর কলকাতায় ফেরার কথা ছিল। ক্যারিট আমায় বলে যে সুভাষবাবু কলকাতায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার হবেন এবং করতে হবে ক্যারিটকেই সাপ্লিশ। ঘটনাটা

সেই রকমই ঘটেছিল। ক্যারিট অনেক পরে বোধ হয় 'তা এ ধরা পড়ে ভারত থেকে বহিষ্কৃত হয়। ক্যারিটের সঙ্গে ১৯৪৭ সালে লণ্ডনে আর পি ডির ঘরে আমার (সি পি জি বি অফিসে) দেখা হয়। সে সি পি জি বির আন্তর্জাতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অর্থাৎ আর পি ডির দক্ষিণ হস্ত। আমি আসব জেনে দেখা করতে আসে। তখন জানতে পারি সে কি করে মেসে যায়। তার কাহিনীটাও চমকপ্রদ। আমাদের পার্টির কোনও ত্রুটির জন্য নয়, সে ধরা পড়ে অক্সফোর্ডের পুরাতন যোগসূত্র ফাঁস হওয়ার জন্য। সে-যুগে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের ছাত্র মহলে কমিউনিস্টদের ভাল কাজ ছিল (কিম ফিলবী ও গাই বার্জেস প্রভৃতির কথা সকলেই জানেন)। সেখান থেকে বেরিয়ে তারা বৃটিশ সরকারের ভাল ভাল কাজে যোগ দিতেন ও গোপনে যা করার নির্দেশ আসত তাই করতেন। কিম ফিলবীর লেখা "আমি সোভিয়েতে গোয়েন্দা ছিলাম" নামক বই এ এদিককার চিত্র পাবেন।

ক্যারিট বলেন যে অক্সফোর্ডের পুরাতন ছাত্রদের যারা উঁচু সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিল কি একটা কারণে তাদের সব রেকর্ড বৃটিশ পুলিশ খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। বিলেত থেকে নির্দেশ আসে যে ক্যারিটের উপর একটু চোখ রাখতে হবে কারণ সে কমিউনিস্ট ছাত্র মহলে নাকি ঘোরাফেরা করত। তখন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ব্যুরোর ডিরেক্টর স্যার হোরেস উইলিয়মসন কলকাতায় কার্যোপলক্ষে এসে একদিন ক্যারিটকে রহস্য করে বলে যে তার পুরাতন ইতিহাস ভাল না। কিন্তু কিছু হয় না। তারও ছ মাস পরে কোথায় একটা যোগাযোগ সি পি জি বির সঙ্গে ক্যারিটের ধরা পরে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যারিটকে লাটসায়েব তলব করে বলে যে ইংরাজ আই সি এস-কে গ্রেফতার করলে সায়েব আই সি এস-এর জাত যাবে, চাকরী থেকে ডিসমিস ঐ কারণে করা যাবে না। অতএব সে পদত্যাগ করে বিলেত রওনা হোক। নতুবা তাকে গ্রেফতার করতে সরকার বাধ্য হবে।

সেইমত তিনি ভারত ত্যাগ করেন ও আর পি ডির সহকারী হিসাবে প্রকাশ্যে সি পি জি বির দফতরে কাজ করতে থাকেন।

দ্বিতীয় ঘটনা—একদিন নিত্যানন্দ এসে খবর দিল যে সৌম্যেন লোক মারফৎ আমার খবর করেছে। আমি সৌম্যেনের সঙ্গে দেখা করতে ঠাকুর-বাড়ী যাই। সে বলে যে পি সি যোশী বা অজয় ঘোষ কলকাতা আসছে তাই আমার ঠিকানা চায়। ব্যাপারটা গোপন। আমি আমার মেডিকেল মেসের

ঠিকানাটা দিই। তার প্রায় দশদিন পরে একদিন আমার মেসে অজয় এসে হাজির। অজয় জানাল যে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময় সেখানে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা হবে, জেনারেল সেক্রেটারী ও পিবি নির্বাচন হবে ও নতুন পরিস্থিতির আলোকে কাজকর্ম ঢেলে সাজতে হবে। সে আরও বলে যে সৌম্যেনের সঙ্গে কথা চলছে। তবে বড় অহঙ্কারী, একে ঠাকুরবাড়ীর ছেলে তাতে আবার তাকে হিটলার গ্রেফতার করেছিল! যাই হোক শেষ পর্যন্ত সৌম্যেনের সঙ্গে আর যোগাযোগ অগ্রসর হয় নি।

এরই কয়েকদিন পরে আমার ডবল নিমুনিয়া হওয়ায় হাসপাতালে ডাক্তার-বন্ধুরাই ভর্তি করে ও আমার বাবাকে খবর তারাই দেয়। প্রায় মরতে মরতে বেঁচে ফিরি। কিন্তু ৪১-নং এ না ফিরে পিতার অনুরোধে তাঁর বাড়ীতেই ফিরি। হাসপাতালে যে সব পার্টি নেতারা দেখা করতে আসত তাঁদের পরামর্শও তাই ছিল। তাছাড়া জানা গেল হালিম, জগজ্জিত প্রভৃতি বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে জেলে আটক বন্দী এবং আমার নামেও ওয়ারেন্ট আছে। দুদিন তো এসবির জ্ঞান দত্ত হাসপাতালে দেখতে এল যে সত্যিই মৃত্যুপথের যাত্রী কিনা। সুতরাং পিত্রালয়ে যাওয়ার ফলে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স (বিসিএলএ) ও পুনরায় অনাহারও শরীরের উপর অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল।

ছমাস হাসপাতাল ভোগের পর বাড়ীতে এক রাত্রে গোপনে যোশী দেখা করতে আসে। তার কাছে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণী শুনি। সেই কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় স্থির হয় যে আমরা সভ্য হিসাবে কংগ্রেসের মধ্যে কাজ করব যাতে কংগ্রেসকে সম্মিলিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগঠন (জোট) হিসাবে বৃঃ শাসন থেকে মুক্তির জন্য আপোষহীন সংগ্রামে লিপ্ত করা যায়। কংগ্রেসের মধ্যে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলির যৌথ অন্তর্ভুক্তি হতে পারে (কলেক্‌টিভ এ্যাফিলিয়েশন), শ্রমিক, কৃষকের দাবীগুলি কংগ্রেস গ্রহণ করে, সামন্তবাদবিরোধী দাবী ও সংগ্রামে কংগ্রেসকে লিপ্ত করা যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। জোশী বলেন যে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে নেহরুর অভিভাষণে যৌথ অন্তর্ভুক্তি ও সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা ছিল এবং অভিভাষন ও গৃহীত প্রস্তাবগুলির ফলে পার্টির কাজও করা সম্ভব হবে কংগ্রেসের মধ্যে থেকে। কেন্দ্রীয় কমিটি এক পিবি নির্বাচন করেছে যার সভ্য অজয়, ভরদ্বাজ, ডাঃ অধিকারী ও যোশী

সাধারণ সম্পাদক। কলকাতায় পার্টির গোপন কেন্দ্র হবে, ডাঃ অধিকারীকে বিজাপুর অন্তরীণ থেকে গোপনে আনা হয়েছে, অজয় বোম্বাই ও ভরদ্বাজ ইউ পি (কানপুরে) তে কর্মস্থল করবে। নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে সত্য ঘোষ বাদ পড়েছে, আমি, লাহিড়ী ও হালিম বাংলা থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য থাকলাম।

স্পেনের ঘটনাবলী

'৩৬ সালেই প্রথম বাংলার তারপর সর্বভারত ভিত্তিতে ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হয়। বাংলায় উদ্যোগীদের মধ্যে বিশ্বনাথ মুখার্জি ও নন্দ বোসের নাম উল্লেখযোগ্য।

এই বছরেই নিখিল ভারত কৃষকসভা গঠিত হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বঙ্কিমবাবু, স্বামী সহজানন্দ, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমবাবু এই বছরই পার্টি সভ্য পদ গ্রহণ করেন। এই দুটি সংগঠনেই বিশেষ করে কমিউনিস্ট, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট ও কংগ্রেস সভ্য ও মনোভাবের লোকেরা ছিলেন। স্বামীজী অবশ্য কোন দলেই ছিলেন না।

যোশী গোড়া থেকেই কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলের সাথে মিতালীর চেষ্টা করে। জয়প্রকাশের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত ও যথেষ্ট সম্প্রীতি হয় ও বহুদিন পর্যন্ত চলে। এই দুই দলের কর্মসূচী অনেকটা জাতীয় সমস্যায় এক রকম হওয়ায় অনেক জায়গায় মিলে মিশে কাজও হতে থাকে। দক্ষিণ ভারতে সব কমরেডরাই সি এস পিতে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরে বাংলায়ও ঐ দলের অন্যতম সম্পাদক হন প্রফেসার হীরেন মুখার্জি ও নৃপেন চক্রবর্তী—দুজনেই পার্টিসভ্য।

এই সময়ই আর পি ডি ও ব্রাডলের স্বাক্ষরিত একটা দলীল আসে—যা দত্ত-ব্রাডলে থিসিস হিসাবে খ্যাত হয়। এই দলীলেও কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জোটে (মোর্চায়) পরিণত করার আহ্বান থাকে।

'৩৬ এ স্পেনের ঘটনায় ভারতও আলোড়িত হয়। স্পেনের নির্বাচিত সাধারণতান্ত্রিক সরকার (যাতে কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, উদারনৈতিক এমনকি এ্যানারকিস্টরাও ছিল) দেশে গণতান্ত্রিক ভিত্তি রচনা করবার ব্যবস্থা করছিল। তাকে উৎখাত করার জন্য জেনারেল ফ্রাঙ্কো মূর সৈন্য নিয়ে [illegible]

পিছনে প্রকাশ্যেই ছিল। স্পেনের ঘটনা এক আন্তর্জাতিক ঘটনায় রূপান্তরিত হয়। '৩৫-এ সপ্তম কংগ্রেসের থিসিসে প্রমাণিত হয় যে ফ্যাসিজমকে রোখা যায়—স্পেন তার নিদর্শন। বিশ্বের গণতান্ত্রিক মানুষ সাধারণতন্ত্রী সরকারের সমর্থনে ও প্রতিক্রিয়াচক্রী ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে স্পেন সরকারের সমর্থনে সামরিকবাহিনী গঠিত হতে থাকল। এক বিরাট আন্তর্জাতিক ব্রিগেড এইভাবেই গঠিত হয়। এই ব্রিগেড স্পেনের সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদলের অংশ হিসাবে ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিজমকে আটক করার জন্য জীবনমরণ পণে ব্রতী হয়। সোভিয়েত সরকার অস্ত্র ও সামরিক কমাণ্ডার পাঠিয়ে সাধারণতন্ত্রী সরকারকে মদদ যুগিয়েছে। জেনারেল রকোসোভস্কি সামরিক নির্দেশনায় সাহায্য করেছেন। এক কথায় বিশ্ব ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব গণতন্ত্রের মিলিত অভিযান স্পেনে শুরু হল।

স্পেনে তখন আমরা ডলরেস ইবারুরির নাম শুনি। তিনি পৃথিবীতে 'লা প্যাসিওনারা' নামে বিখ্যাত। তিনিই প্রথম স্পেনের মানুষকে ডাক দিয়ে স্লোগান দেন "নো পাসারন" অর্থাৎ ফ্যাসিজমকে এগুতে দেব না। এই স্লোগান বিশ্ব গণতন্ত্রের আন্দোলনে অক্ষয় হয়ে আছে।

লা প্যাসিওনারাকে আমি প্রথম দেখি সুইডেনে ১৯৪৭ সালে সুইডেনের কমিউনিস্ট পার্টির অতিথি হিসাবে। পরে দেখি তাঁকে মস্কো ১৯৭২-এ সংযুক্ত সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট সাধারণতন্ত্রের ৫০তম বার্ষিক উৎসবে ক্রেমলিনের হল অব কংগ্রেসে। আমি সেখানে এ আই টি ইউ সির প্রতিনিধি ছিলাম।

স্পেনের সেই জীবনমরণ সংগ্রামের উপর অনেক দলীল ও পুস্তক আছে, কেন, কিভাবে সাধারণতন্ত্রীরা পরাজিত হল।

নেহেরু ঐ সময় লণ্ডন থেকে স্পেনে যেয়ে সাধারণতন্ত্রীদের পক্ষে সমর্থন জানাল। আন্তর্জাতিক বাহিনীতে দুজন ভারতীয়ের নাম পেয়েছিলাম। এখন নাম মনে নেই।

স্পেনের ধাক্কা ভারতেও পড়ে। আমরা স্পেনের সাধারণতন্ত্রীদের সমর্থনে অনেক সভা ও মিছিল করি। স্পেনের প্রভাব ভারতের রাজনীতিতে পড়ে অর্থাৎ জাতীয় সংযুক্ত ফ্রন্টের কথাও ব্যাপকতা লাভ করে।

'৩৬-এর শেষে বা '৩৭ এর গোড়ায় মুজাফ্ফর আহমদ সন্দীপে নিজ গৃহে

কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন

'৩৬-এর অন্য ঘটনাগুলিতে যাবার পূর্বে জেল, বন্দীশালা ও আন্দামানের বন্দীদের কমিউনিস্ট হওয়ার কাহিনীতে আসা প্রয়োজন।

১৯৩০-৩১ এ বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মধ্যে আঙ্গুলে গোণা কয়েকজন কমিউনিস্ট ছিলেন—যথা : খ'া সাহেব, বোখারী, মোমিন প্রমুখ। কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসীদেরও আঙ্গুলে গোনা যেত—যথা : পাঁচু ভাদুড়ী, কালী সেন, ভবানী সেন, মণি সিং ও আরও কয়েকজন। সংখ্যাই বড় কথা নয়, মতবাদের সত্যতা ও কালোপযোগিতাই বড় কথা। তাই ১৯৩২-৩৩ থেকেই জেলে জেলে আত্মজিজ্ঞাসা শুরু হল। বিপ্লবের ঐ পথেই কি স্বাধীনতা আসবে, ইংরাজকে ঐভাবেই কি তাড়ান যাবে দেশ থেকে। জেলের মধ্যে গোপনে ও প্রকাশ্যে মার্কসবাদী সাহিত্য, পত্রপত্রিকা আসতে লাগল। বৃটিশ সরকার বিশেষ বাধা দিল না কারণ হয়ত তারা ভেবেছিল যে অন্তত মার্কসবাদের পথে বন্দীরা গেলে সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হবে। সত্যিই বৃটিশ অফিসাররা বহু ক্ষেত্রে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। টেগার্টের মত দুরন্ত অফিসার বিলেতে ভাগল, মেদিনীপুরের বার্জেসের চিঠি পড়ে বোঝা যায় তারা কি ভীষণ ভয়ে ভয়ে ছিল।

যাই হোক, জেল ও বন্দীশালায় ঐ মুষ্টিমেয় কমিউনিস্টরা আলোড়ন তুললেন, পড়াশুনা ব্যাপকহারে হতে থাকল, স্টাডি সার্কেলের পর স্টাডি সার্কেল। বিপ্লবীদলের দাদারা ব্যতিব্যস্ত! দল যে যায়! প্রতিটি জেল ও বন্দীশালায় মার্কসবাদীর সংখ্যা এত বৃহৎ হতে থাকে যে সেখানে "তৃতীয় চৌকার" পত্তন হল।" অর্থাৎ "যুগান্তর বা অনুশীলনের কোনও চৌকায় আমরা যাব না, আমাদের চৌকা হবে আলাদা"। সব দলে ভাঙ্গন হতে থাকল—যুগান্তর, অনুশীলন, বিপিনদার দল, শ্রীসংঘ, বিভি, চট্টগ্রাম দল—সব ভেঙ্গে যেতে লাগল। সব জেলে, বন্দীশালায় কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন গঠিত হল।

এই রকম ব্যাপার আন্দামানেও। সেখানে মুখ্য ভূমিকা নেন ডাঃ নারায়ণ রায় এবং কিছু পরে নিরঞ্জন সেন। সেখানে সারা ভারতের বন্দীরাই ছিলেন যদিও বাঙলারই প্রায় সব—প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ। পাঞ্জাবের সংখ্যা তার পরেই, তারপর ইউ পি, বিহার ইত্যাদি।

কমিউনিস্ট নেতা নলিনী দাস। সকলের মনীষা গ্রন্থালয় দ্বারা প্রকাশিত ঐ বই পড়া দরকার।

আন্দামানে কমিউনিস্ট হওয়ার সংগ্রাম আরও ভয়ঙ্কর। নামীনামী বিপ্লবী দাদারা ভয় দেখালেন 'খবরদার ওপথে নয়'। কিন্তু বাধ ভেঙ্গে স্রোতের মত ছেলেরা মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ল। এমন সংক্রামণ যে দাদারাও—অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রভৃতিও একটু একটু করে মার্কসবাদ বুঝতে ও পড়তে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট তাঁরাও হলেন।

বিরাট আন্দামান জুড়ে কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন গঠিত হল। আমরা ১৯৩৫-৩৬-এ এসবের খবর পেতে থাকি ও নানা উপায়ে পার্টির কাগজপত্র জেলে বন্দীশালায় পাঠাতে থাকি। ফলে বাইরে যে একটা কমিউনিস্ট পার্টি কাজ করে যাচ্ছে আর তা যে কমিন্টার্ণের অংশীদার জেলে সে খবর বেশ চাউড় হল। আর হল ৪১ নং এর কথা। সে কথা সুদূর আন্দামানেও পৌঁছুল। বাইরে থেকে আমাদের যোগাযোগের বিচিত্র কাহিনী লেখার এখানে দরকার নেই। তবু শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে শুরু থেকে আমাদের মতাদর্শের লড়াই সত্য মত ও পথের জন্য, মার্কসবাদের জন্য ও কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের জন্য প্রতিফলন কোন না কোনভাবে জেল ও আন্দামানে পৌঁছয়। ১৯৩৪-৩৫-এ সৌম্যেন বা লেবার পার্টির সাথে কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনের যোগাযোগ ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে কিছু বন্দী নানা কারণে জেল থেকে বেরিয়ে ওদিকে গিয়েছে। আর পরে প্রধান ও একমাত্র স্রোত—কমিউনিস্ট পার্টির স্রোতে এসে মিশে গেছে যেমন বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট নেতা মুকুল সেন যিনি জেল থেকে বেরিয়ে প্রথম সৌমেনের দলে যোগ দিয়েছিলেন পরে আমাদের পার্টিতে।

জেলে যাঁরা কমিউনিস্ট হন তাদের অনেকে মুক্তির পর নিজেদের কাজ-কর্মের গুণে পার্টির খুব উচ্চ শিখরে ওঠেন—যেমন : ভবানী সেন, পাঁচু ভাদুড়ী, মণি সিং, সুধীন রায় (খোকা), আলতাব আলি, নেপাল নাগ প্রভৃতি। শেষের কজন এখন বাঙলাদেশের পার্টির নেতা (নেপাল বাদে)।

১৯৩৭ থেকেই বিনাবিচারে আটক বন্দীরাও ছাড়া পেতে থাকেন।

মুক্তি পেতে থাকেন। ফলে পার্টির ভিতরে ও আশপাশে এই সব মুক্তি পাওয়া কমরেডরা জমায়েত হতে থাকলেন।

পার্টির নির্দেশে তাঁরা কংগ্রেস ও সি এস পির সভা হতে লাগল। ফলে বামপন্থী শক্তি কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে আরও প্রচণ্ডভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে যুগান্তর, অনুশীলন প্রভৃতি পার্টির নেতা ও কর্মীরাও নিজ নিজ পার্টির নির্দেশে কংগ্রেস ও সি এস পিতে যোগ দেয় সর্বত্রই। একমাত্র আমাদের কমরেডদেরই প্রভাব বাড়ল না, মোটের উপর বামপন্থী শক্তি বাঙলাদেশের কংগ্রেসের তলা থেকে উপর পর্যন্ত ছেয়ে গেল। বাঙলায় পুরোনো দিনে কংগ্রেসের মধ্যে প্রধান পাণ্ডা পাঁচজনের প্রভূত শক্তি ছিল শরৎ বোস, তুলসী গোসাই, কিরণ শঙ্কর ইত্যাদি পাঁচজনকে বিগফাইভ বলা হত)। সেটা পরে ভেঙ্গে যায় কিন্তু সুভাষ ও জে এম সেনগুপ্তের মধ্যে রেষারেষির ফলে কংগ্রেস বাইরে এক থাকলেও আগাগোড়া বিভক্ত হয়েছিল। খবরের কাগজগুলিও এই দ্বন্দ্বের অংশীদার ছিল যেমন আনন্দবাজার ও এ্যাডভান্স সেনগুপ্তের সমর্থক ছিল।

১৯২১ থেকেই বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী দলগুলিও ঐভাবে সুভাষ বা সেনগুপ্তকে সমর্থন করতে থাকে। জেল থেকে বেরিয়েও ঐ ধারা চলে।

এই বন্দী মুক্তির ফলস্বরূপ সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের মুক্তির দাবীও দেশে প্রবল হতে থাকে বিশেষত বন্দীদের অন্তত নিজ নিজ প্রদেশের জেলে স্থানান্তরিত করার দাবী ৩২ থেকেই দুর্বার হয়ে উঠতে থাকে। আন্দামানে ঐ দাবীতে অনশনের পর অনশন চলে ও বাইরে তার প্রতিফলন হয়।

সমগ্র '৩৭ ও ৩৮ এ এই বন্দী মুক্তি আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের রূপ নেয়। সে প্রসঙ্গে ৩৮ সালের ঘটনাবলী লেখার সময় আলোচনা করব।

আন্দামান থেকেও যারা মুক্তিলাভ করেন তাদের মধ্যেও অনেকে পার্টিতে যোগ দেন যেমন রণধীর দাশগুপ্ত (চট্টগ্রাম দলের), সুরেন ধরচৌধুরী (চিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় সাজাপ্রাপ্ত) প্রভৃতি। মুক্ত বন্দীরা অনেকেই টি ইউ আন্দোলনে শরিক হন, যেমন ভবানী সেন ইষ্টবেঙ্গল রেল শ্রমিক ইউনিয়নের কাজে রত হন। জাতীয় আন্দোলনে বামপন্থার প্রচণ্ড শক্তির সাথে সাথে টি ইউ আন্দোলনও প্রবল শক্তিশালী হতে থাকে। বাঙলাদেশে কমিউনিস্ট

কংগ্রেসের চেহারাও অন্য প্রকারের, কমিউনিস্ট, সি এস পি, পুরানো বিপ্লবী দল, গান্ধীবাদী ও অন্যান্য শক্তির সমাবেশে কংগ্রেস প্রচণ্ড শক্তিধর সংগঠনে পরিণত হয়। যদিও পাশাপাশি মুসলিম লীগও তার প্রভাব ব্যাপক ও গভীর করে তোলে।

১৯৩৬-এর ডিসেম্বরে নেহরুর সভাপতিত্বে ফৈজপুরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এই বামপন্থার জোয়ার আরও ব্যাপক হয়। ঐ অধিবেশনে পার্টির তরফ থেকে যে জাতির উদ্দেশে ইস্তাহার দেওয়া হয় তা আর পি ডি তাঁর ইণ্ডিয়া টুডে (পুরান সংস্করণ)-তে ৬০ পৃষ্ঠায় বিশদ দিয়েছেন বলে আর সেগুলির পুনরাবৃত্তি করছি না।

১৯৩৭-এ বৃটিশ সরকার ভারতে বৃটিশ পার্লামেন্টে নতুন "ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট অব ১৯৩৫" প্রবর্তনের ঘোষণা করে। যার ফলে দেশবাসীর হাতে আরও কিছু বেশী ক্ষমতা অর্পণের ও প্রাদেশিক ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিত্ব আরও প্রসার করে তাদের নির্বাচিত মন্ত্রিসভার দ্বারা প্রাদেশিক সরকার গঠনও পরিচালনার কথা বলা হয়। স্বাধীনতা এমন কি ডোমিনিয়ান ষ্টেটসের ধারে কাছেও এই অধিকারগুলি না গেলেও বৃটিশ সরকার মন্ত্রীসভার কাজে হস্তক্ষেপ করবে না এই রকম একটা প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে কংগ্রেস নির্বাচনে যোগদান ও মন্ত্রিসভা গঠনে রাজী হয়।

১৯৩৭-এ এই নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্বাচন হয়। জনগণের সার্বজনীন ভোটাধিকার না থাকলেও আরও কিছু বেশী লোকের ভোটাধিকার হয়। নির্বাচনে বাঙলা ছাড়া সর্বত্রই কংগ্রেসের জয়জয়কার হয়। বাঙলা থেকে বঙ্কিমবাবু ও নীহারেন্দু আমাদের তরফ থেকে নির্বাচিত হন (পার্টি বেআইনী থাকায় পার্টি টিকেটে নয়)।

বাঙলাদেশে নির্বাচনে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজাদল ও তার বিরুদ্ধে নাজিমুদ্দিন, সারওয়ার্দির নেতৃত্বে মুসলিম লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। মুসলিম ও অমুসলিম (সাধারণ) আসনের ভিত্তিতে নির্বাচন হয়। হকসাহেবের দল বেশী শক্তিতে নির্বাচিত হলেও চাপে পড়ে লীগের সাথে যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করে। সাধারণ আসনে কংগ্রেস প্রায় সর্বত্রই জয়লাভ করে। বঙ্কিমবাবু ও নীহারেন্দু কিছুটা কংগ্রেসের সমর্থন পেয়েছিলেন। আগেই এ বিষয়ে

পার্টির কথা

'৩৬-'৩৭ সালে পার্টির কেন্দ্রীয় দফতর কলকাতায়ই গুপ্তভাবে কাজ করছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। পার্টির মধ্যে নতুন লাইন সর্বত্র স্বীকৃত হয় না। যেমন ডাঙ্গে ও রণদীভে নতুন লাইনের ঘোর বিরোধী ছিলেন (যদিও তাঁদের ব্যক্তিগত রেষারেষি প্রচণ্ড ছিল)। নতুন লাইনের পক্ষে বিপক্ষের মতামত সাইক্লো করে পার্টির মধ্যে গোপনে দেওয়া হত ও তার ভিত্তিতে পার্টি সেলে ও কমিটিতে আলোচনা হত।

১৯৩৭ সাল নাগাদ বাঙলার প্রায় সব জেলায় ছোট-বড় পার্টি কমিটি গঠিত হয়। ঐ সময় বরিশাল পার্টি গঠনের প্রচেষ্টায় জগজ্জিত ও আমি কলকাতা থেকে রওনা হই। বরিশালে তখন গৈলা গ্রামে মুকুল সেন অন্তরীণ। তিনি সেখানে দখল করে বসে আর তিনি তখন ঠাকুরপন্থী। আমাদের কিছু ছেলে প্রস্তাব দেয় যে মুকুলবাবুর সঙ্গে কথা বলে অন্তত তার বিরোধিতা কিছুটা কমান গেলে আমাদেরও বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। গোপনে কলকাতা থেকে খুলনা, সেখান থেকে স্টীমারে পাটগাথী স্টেশনে নেবে ছোট নৌকায় খাল বেয়ে বেয়ে ৮ ঘণ্টা পরে গৈলা গ্রামে আমাদের আড্ডায় পৌঁছান গেল। তার পরের দিন মুকুলবাবুর ঘরেই আলোচনা অনেক হল। কিন্তু ফল কিছু হল না। কারণ তিনি স্টালিনবাদী পার্টির সঙ্গে কোনও সমঝোতাই করতে রাজী না। যাইহোক, বন্দীমুক্তির ফলে তাঁর একচেটে অধিকারও খর্ব হল, আমাদের পার্টিই প্রধান প্রধান গ্রামে গঞ্জে জেগে উঠল। আরও পরে ঠাকুরদল থেকে অমিয় দাশগুপ্ত (মহারাজ) মণিকুন্তলা, অমৃত নাগ প্রভৃতি সৌমেনকে পরিত্যাগ করে আমাদের পার্টিতে যোগ দেন। আরও পরে মুকুলবাবুও যোগ দেন ও তিনি এখন বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য।

১৯৩৭-এ আমাদের অনেক পুরানো টি ইউ নষ্ট হয়ে গেলেও নতুন নতুন শিল্পে ও এলাকায় শক্তিশালী টি ইউ গঠিত হতে থাকে। প্রধানত চটকল ও বিশেষ করে বারাকপুর এলাকায় চটকল ও অন্যান্য শিল্পে একচেটে প্রভাব বিস্তার হয়। নীহারেন্দু ঐ এলাকায় থেকে নির্বাচিত হওয়ার পর চটকলে সর্বত্রই আমাদের যোগাযোগ হয়। কর্পোরেশন শ্রমিকদের মধ্যে, মেটেবুরুজে সুতাকল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে, পোর্টে ও ডকে পার্টি নেতৃত্বে

টি ইউ-র বিরোধিতায় আমরা যাই না, কারণ তিনিও এ আই টি ইউ সি'র সাথে যুক্ত ছিলেন। এই সময় আলাদা আলাদা চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন একত্রিত করে বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন স্থাপিত হয় ও একটা বড় হরতাল অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩৭-এ কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হবার ফলে পার্টির কেন্দ্রীয় দফতর বছরের শেষ দিকে বোম্বাই স্থানান্তরিত হয়। এবং কাজকর্ম প্রায় প্রকাশ্যেই হতে থাকে।

হিন্দু পেট্রিয়ট [১৮৫৪-৬১] ও বাঙলার নবজাগরণ

অমর দত্ত

১

বাঙলাদেশের নবজাগরণে উনিশ শতকের পাঁচের দশকের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। উক্ত দশক আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ—কেননা এই সময়েই বিধবা বিবাহের আন্দোলন, সিপাহী যুদ্ধ, নীলের হাঙ্গামা, ঈশ্বর গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। এই দশকেই বাঙলাদেশের উল্লেখযোগ্য ইংরাজী সংবাদপত্র Hindoo Patriot পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। এদেশে ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জন্ম হয়েছিল উনিশ শতকে—উপনিবেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোজাত বৈপরীত্য সত্ত্বেও তাঁরাই এদেশে মানবমুখিন বুর্জোয়া জীবনদর্শন প্রচারের প্রথম মাধ্যম এবং Hindoo Patriot তাঁদের অন্যতম মুখপত্র।

১৮৫৩ খৃঃ মধুসূদন রায় নামক জনৈক স্বদেশ-হিতৈষী ধনী ব্যক্তি একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করে সাপ্তাহিক হিন্দু পেট্রিয়ট ১৭ নং দর্পনারায়ণ স্ট্রীট হতে প্রকাশ করেন। প্রথমে গিরীশচন্দ্র ঘোষ এবং পরে প্রখ্যাত হরিশচন্দ্র মুখার্জীকে তিনি সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত করেন। সেই সময় ইংরাজী সংবাদ-পত্র পড়বার লোক এত কম ছিল যে হিন্দু পেট্রিয়টের গ্রাহক সংখ্যা একশতের বেশী হল না। অনুরূপ অবস্থায় মধুসূদন রায় নিজের মুদ্রাযন্ত্রটিকে বিক্রয় করে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' হরিশচন্দ্র মুখার্জীকে দান করে পশ্চিমে যাত্রা করলেন। হরিশচন্দ্র মুখার্জী তাঁর ভ্রাতা হারানচন্দ্রকে নামতঃ সাপ্তাহিক কাগজটির সত্বাধিকারী ও প্রকাশক করে নবোদ্যমে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র প্রচারে ব্রতী হলেন। তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার গুণে Hindoo Patriot অল্প দিনে বহুল প্রচারিত হল। সিপাহী যুদ্ধ ও নীল হাঙ্গামার সময় পেট্রিয়টের নির্ভীক

পেট্রিয়টের ভুল থাকতে পারে, কিন্তু বাকজালের আড়ালে পেট্রিয়ট সিপাহী-যুদ্ধ সম্বন্ধে নিজের মতামতকে অস্পষ্ট রাখেনি। নীলকরদের স্বরূপ উদ্ঘাটনে পেট্রিয়টের অগ্নিবর্ষী লেখনী পেট্রিয়টকে তদানীন্তন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদ-পত্রের মর্যাদা দান করল। পেট্রিয়টের মতামত এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে স্বয়ং বড়লাট লোক পাঠিয়ে পেট্রিয়টের প্রতিটি সংখ্যা প্রথম সংগ্রহ করতেন।

১৮৯২ খৃঃ ৬ই জুন পর্যন্ত পেট্রিয়ট সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান প্রবন্ধটি ১৮৫৪ খৃঃ থেকে ১৮৬১ খৃঃ পর্যন্ত হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত তথ্যাদি নির্ভর করে রচিত হয়েছে।

ইংলণ্ডের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে আস্থাশীল হওয়ায় পেট্রিয়ট ভারত-বর্ষের প্রশাসকদের কাছ থেকে একই মানের ঐতিহ্য আশা করত। কিন্তু উপ-নিবেশের ন্যায়নীতি ও স্বদেশের ন্যায়নীতি এক হতে পারে না—এইজন্য পেট্রিয়টের অনেক রচনায় হতাশার চিহ্ন আছে। ঝান্সীর রাণীর দত্তক পুত্র গ্রহণের অধিকার অস্বীকার করে লর্ড ডালহৌসী ঝান্সী অধিকার করলে পেট্রিয়টে বড় লাটের নিন্দা করা হয় এবং **People and Parliament of Great Britain** কে সুবিচারের জন্য হস্তক্ষেপ করতে বলা হয় (হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৮ মে, ১৮৫৪)। বাণিজ্যিক স্বার্থে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের প্রতি সুবিচার করতে পারে না—পেট্রিয়টের এই ব্যাপারে সঠিক উপলব্ধি ছিল না—এটাই উক্ত সংবাদপত্রের সীমাবদ্ধতা।

সিপাহী যুদ্ধের সাফল্যে পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন ও সতীদাহ জাতীয় কুপ্রথার পুনঃপ্রবর্তনের আশঙ্কা করে পেট্রিয়ট সিপাহী যুদ্ধকে সমর্থন জানাতে পারেনি; কিন্তু ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারের বিষয়ে পেট্রিয়ট কোনদিনই নীরব ছিল না। 'English Radicalism and Indian Officialism' নামক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এদেশের ইংরেজ শাসকদের সমালোচনা এবং ইংরেজের মুক্তিবাদের উপর আস্থা প্রকাশিত হয়েছিল (হিন্দু পেট্রিয়ট, ডিসেম্বর ২৫, ১৮৫৭)। হিন্দু পেট্রিয়টের একাধিক প্রবন্ধে অনুরূপ মনোভাব সুস্পষ্ট।

উপনিবেশের আমদানী-রপ্তানী ব্যবসা যে জনগণের পক্ষে ক্ষতিকারক একথা হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার একাধিক প্রবন্ধে ও পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

বর্ষের বর্তমান অবস্থা রপ্তানী বাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। এই দেশের বর্তমান উৎপাদন জনগণের পক্ষে এবং বিদেশে রপ্তানীর পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাছাড়া, আমাদের দেশ থেকে রপ্তানীকৃত বস্তুগুলি নিত্যব্যবহার্য আবশ্যক সামগ্রী এবং আমদানীকৃত বস্তুগুলি বিলাসসামগ্রী। চাল, চিনি, সরিষার বীজ, এবং অন্যান্য মূল্যবান বস্তুগুলি প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করা হচ্ছে এবং মদ, বিলাসদ্রব্য ও প্রচুর পরিমাণে রাস্তা তৈরী করার পাথরকুচি আমদানী করা হচ্ছে। এই বিনিময়ে যেটুকু মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে তাও মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সম্পত্তি বৃদ্ধি করছে এবং নিম্নশ্রেণীর জনগণ বিন্দুমাত্র উপকৃত হচ্ছে না ...'' (হিন্দু পেট্রিয়ট, মে ২৭, ১৮৫৮)।

হিন্দু পেট্রিয়টের লর্ডক্যানিং এর শাস্তির সপক্ষে মতামত খুব সম্পষ্ট। পেট্রিয়টে ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে স্বায়ত্ত-শাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছিল যে কেন্দ্রীভূত শাসন নয়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলজনক এবং সিপাহীযুদ্ধ থেকে সরকারের উক্ত শিক্ষাগ্রহণ প্রয়োজন (হিন্দু পেট্রিয়ট, জানুয়ারী ১৩, ১৮৫৯)। সিপাহীযুদ্ধের পূর্ব থেকেই হিন্দু পেট্রিয়টে কেন্দ্রীভূত শাসনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হয়েছিল— এই প্রসঙ্গে Policy of the Government should be Federal নিবন্ধটি উল্লেখযোগ্য (হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৫৬)। পেট্রিয়টে ভারতীয় ব্রিটিশ প্রশাসনের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ধোঁয়াটে ভাবের নিন্দা করে একাধিক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। অনুরূপ একটি পত্রের কিয়দংশের সারমর্ম উদ্ধৃত করছি :—

"...সরকারের স্বরূপ তার নীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। গণতান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক, স্বেচ্ছাচারী, উদারনৈতিক প্রভৃতি জাতীয় সরকারের সঙ্গে তাদের নীতিগুলির গভীর সম্বন্ধ বর্তমান। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে সরকারের নীতিগুলি দিয়ে ভারতবর্ষের সরকারের চরিত্র যথার্থ উপলব্ধি করা যাবে না। পার্লিয়ামেন্টারী সরকারের আদর্শ আমাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করলেও নীতিগুলির ভীতিজনক অপব্যবহার আমাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করছে। ভারতবর্ষের সরকার জাতিবিদ্বেষ প্রচারে উৎসাহ দিয়ে পার্লিয়ামেন্টারী

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনেতারা নিপীড়িত দেশবাসীর কথা চিন্তা করেন না।..... (হিন্দু পেট্রিয়ট—মার্চ ২৪, ১৮৬০)

পেট্রিয়টে আইনসভায় ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের দাবী জানান হয় (হিন্দু পেট্রিয়ট, মার্চ ১৭, ১৮৬০)।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যশোর, নদীয়া, পাবনা এবং নিম্নবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে নীলের চাষ আরম্ভ হয়। নীলকররা অল্পব্যয়ে অধিক লাভের জন্য বলপূর্বক দাদন প্রদান করে রায়তদের উৎকৃষ্ট জমিতে নীলচাষে বাধ্য করা ও অন্যান্য অবৈধ উপায় অবলম্বন করত। রায়তরা অস্বীকৃত হলে প্রহার, কয়েদ, লুণ্ঠন,গৃহদাহ প্রভৃতি নৃশংস অত্যাচার চালাত—অনেক সময় নীলকররা জমিদার হয়ে রায়তদের ধনে-প্রাণে শেষ করত। ১৮৫২ খৃঃ লক্ষ লক্ষ প্রজা ধর্মঘট করে নীলচাষ করতে অস্বীকৃত হওয়ায় নীলকরদের অত্যাচারের মাত্রা খুব বেড়ে যায়। একদিকে নীলকর, অন্যদিকে রায়ত—এই বিবাদে জেলার শ্বেতাঙ্গ প্রশাসকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীলকরদের পক্ষাবলম্বন করতেন। নিপীড়িত প্রজার সপক্ষে দাঁড়ানোর কেউই থাকত না। অনুরূপ অবস্থায় হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা নীলচাষীর সপক্ষে জনমত সংগঠন করার জন্য নীলকরদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিল। মূলত পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জীর অগ্নিবর্ষী লেখনী সরকারকে ১৮৬০ খৃঃ 'ইণ্ডিগো কমিশন' নিয়োগে বাধ্য করে। হরিশচন্দ্র মুখার্জী কমিশনে সাক্ষ্য দিলেন—তাঁর সাক্ষ্যে দেশব্যাপী নীলকরদের উপরে ধিক্কার রব উঠল। নীলকরা আর্চিবল্ড হিলস নামে জনৈক নীলকরকে খাড়া করে পেট্রিয়টের নামে সুপ্রিম কোর্টে ফৌজদারী মামলা উপস্থিত করল। এই সময় অত্যধিক পরিশ্রমে মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে হরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়—তখন আর্চিবল্ড হিলস আলিপুর কোর্টে হরিশচন্দ্রের বিধবা পত্নীকে প্রতিবাদী গণ্য করে দশহাজার টাকার দেওয়ানী মামলা দায়ের করে। একথা অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় যে হরিশচন্দ্রের বিধবা পত্নীর সপক্ষে মামলা চালানোর জন্য কোন সাহায্য পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত অসহায় বিধবা হিলসকে এক হাজার টাকা মামলার খরচ দিয়ে আপোসে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে বাধ্য হন।

নীলচাষীরা ধর্মঘট করে নীলচাষে অস্বীকৃত হওয়ার পূর্বেই হিন্দু পেট্রিয়টে নীলকরদের অনাচার বিষয়ে বহু সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। নীলকররা

Planters as Justices" (বিচারকের আসনে নীলকরগণ) শীর্ষক সংবাদটি উল্লেখযোগ্য (হিন্দু পেট্রিয়ট—৩রা জুলাই, ১৮৫৬)। এই অনাচার বিষয়ক কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সংবাদের সূত্র উল্লেখ করছি (উৎসাহী পাঠক ও গবেষকরা হয়ত উপকৃত হবেন):

(1) Indigo Planters in the Mofussil (মফস্বলের নীলকরগণ)

—৭ই আগস্ট, ১৮৫৬

(2) ,, ,, ,, ,, ,, ,,

—২১শে আগস্ট, ১৮৫৬

(3) The Indigo Planters Petitions to the Governor General of India and the British Parliament (গভর্নর জেনারেল ও ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের নিকট নীলকরদের আবেদন)—১২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৭

ব্রিটিশ নাগরিক হওয়াতে নীলকররা নেটিভদের সাহায্যে বিচার, জুরির সাহায্যে বিচার, প্রশাসনিক কার্যে দেশীয় দারোগাদের অযোগ্যতা প্রভৃতির উল্লেখ করে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা হতে অব্যাহতি চেয়ে, উক্ত আবেদন করেছিল। এই সম্পর্কে হিন্দু পেট্রিয়টে মন্তব্য করা হয়েছিল—"...বহুজনের স্বার্থের প্রতি মনোযোগী হওয়া সরকারের কর্তব্য—সুতরাং মুষ্টিমেয় আবেদনকারীর আবেদনের প্রতি কর্ণপাত করা সরকারের পক্ষে অবিধেয়।"

(4) Indigo Planters (হিন্দু পেট্রিয়ট ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৬)

(5) Missionaries' Memorial (মিশনারীদের স্মারকপত্র)

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৬

পুলিশ ও বিচারব্যবস্থা, জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার, দরিদ্র-শ্রেণীর উপর অত্যাচার প্রভৃতি বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ কমিশন নিয়োগের আবেদন করা হয়েছিল। আবেদনকারীদের মধ্যে ছিলেন পাদরি জেমস লঙ, পাদরি আলেকজাণ্ডার ডাফ, পাদরি লালবিহারী দে, পাদরি জোসেফ মুলেন্স প্রমুখেরা।

(6) The Missionaries and the Planters (হিন্দু পেট্রিয়ট)

—এপ্রিল ২৪, ১৮৫৬

১৮৫৯ খৃঃ নীলচাষকে কেন্দ্র করে রায়তদের মধ্যে প্রচণ্ডবিক্ষোভ দেখা দেয়

একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সিপাহীযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করলেও নীলচাষীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। রক্ষণশীল ইংরাজী পত্রিকা Friend of India (৮ই মার্চ, ১৮৬০) লিখেছিল :—

".....কৃষ্ণনগর থেকে প্রাপ্ত খবর খুব আশঙ্কাজনক না হলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় উক্ত অঞ্চলের শান্তি বিপন্ন হতে পারে। রায়তদের আন্দোলন কলকাতা হতে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বলে সন্দেহের অবকাশ আছে। ইওরোপীয় জমিদারদের বিতাড়নের চিন্তা এদেশীয় দেশপ্রেমিকদের মধ্যে সুস্পষ্ট।.....প্রকৃতপক্ষে বাঙলাদেশের কোন অঞ্চলেই সৈন্যবাহিনী নিয়োগ না করে যথার্থ শান্তি বজায় রাখা সম্ভব নয়। আমরা আশা করব যে সরকার শেষমুহূর্তে সৈন্যবাহিনী নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। .....আমরা ভীতিজনক বিপর্যয় এবং সবিরাম কৃষক বিদ্রোহ না চাই তবে যে কোন উপায়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে" (মর্মানুবাদ)। উদ্ধৃত অংশে নীলবিক্ষোভের সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের যোগসূত্রের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

১৮৬০ খৃঃ ৭ই জানুয়ারী পেট্রিয়টে নদীয়া জেলার দৌলতগঞ্জ থানার দিগম্বরপুর গ্রামের জমিদার কৈলাসচন্দ্র রায়ের নীলকর সাহেবের হাতে নির্যাতন, কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই জাতীয় একাধিক সংবাদ নীল হাঙ্গামার সমসাময়িককালে প্রকাশিত হয়েছিল—দুই একটি সূত্র উদ্ধৃত করছি :—

(1) The Gomastha—A tale of Indigo Planting
(হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৪ই জানুয়ারী, ১৮৬০)
(2) Anarchy in Bengal („ ৪ঠা জানুয়ারী, ১৮৬০)
(3) Planter-Zeminder in Nuddea
(„ „ „)
(4) Mofusil Magistrate („ ৩রা মার্চ, ১৮৬০)
(5) Indigo Planting in Bengal („ ১৭ই মার্চ, ১৮৬০)

১৮৬০ খৃঃ ঢাকা শহর থেকে প্রকাশিত নীলদর্পণ নাটকটি ১৮৬১ খৃঃ ইংরাজীতে প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে পাদরি লঙ হিউম্যানিস্টের পবিত্র

সর্বত্র যে ঝড় উঠেছিল এবং লঙের জীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, লঙের সেই বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনে পেট্রিয়টের ভূমিকা প্রশংসনীয়। পেট্রিয়টে মন্তব্য করা হয়েছিল, 'সিপাহী যুদ্ধের পরবর্তীকালে শাসক ও শাসিতের বন্ধন শিথিল হয়ে গিয়েছে। ব্রিটিশ ভারতীয় রাজনীতি এর জন্য দায়ী।' ইংরেজ প্রশাসনের প্রতি আস্থাহানি আমাদের জাতীয়তাবোধের বিকাশের পথ খুলে দিয়েছে। হিন্দু পেট্রিয়টে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের কথা বলা হয় নি একথা সত্য, কিন্তু একাধিকবার আস্থাহানির মনোভাব প্রকাশ করে আমাদের জাতীয় চেতনাকে উত্তপ্ত করেছে।

হিন্দু পেট্রিয়টে পাদরি লঙ সংক্রান্ত বিষয়গুলির সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হত। লঙের বিচারের সময় এদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের লঙের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন সৃষ্টিতে পেট্রিয়টের বিশেষ ভূমিকা ছিল। লঙ সংক্রান্ত কতকগুলি সংবাদের সূত্র উল্লেখ করছি :—

(1) The Trial of the Revd. Mr. Long—
(হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৫শে জুলাই, ১৮৬১)

(2) Long's letter— (হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৫ই আগস্ট, ১৮৬১)

(3) The Libel Law and the Nil Durpan—
(হিন্দু পেট্রিয়ট, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬১)

(4) The Nil Durpan Affair in England—
(হিন্দু পেট্রিয়ট, " ")

(5) Mr. Long's Trial— (হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৪শে অক্টোবর, ১৮৬১)

(6) The Church Missionary Society on the conviction and imprisonment of the Rev. James Long for Libel—
(হিন্দু পেট্রিয়ট, নভেম্বর ২১, ১৮৬১)

(7) Address to the Rev. James Long from the Aborigines Protection Society—
(হিন্দু পেট্রিয়ট, ২১শে নভেম্বর, ১৮৬১)

(8) English opinion of the Nil Durpan Trial—
(হিন্দু পেট্রিয়ট, ২রা ডিসেম্বর, ১৮৬১)

সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে হিন্দু পেট্রিয়ট কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেনি। পেট্রিয়টের এই পরিবেশন রীতি প্রশংসার্হ। মেহিনীপুরের

একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। উক্ত পত্রিকায় সরকারকে রায়তদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছিল। এই বিষয়ক সংবাদটির শিরোনামা ছিল 'A renewed permanent settlement' (হিন্দু পেট্রিয়ট, এপ্রিল ৩, ১৮৫৬)।। সিপাহীযুদ্ধের পূর্ববর্তীকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের দাবী যেমন অভিনব, ঠিক তেমনি অভিনব উক্ত বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন। আবার পেট্রিয়টের পাতায় (ফেব্রুয়ারী ১২, ১৮৫৭) বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পুস্তিকার উপর নির্ভর করে বাঙলাদেশের জমিদার শ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকার উল্লেখ করা হয়েছিল।

হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ ও পত্রাদিতে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। জনৈক রায়তের নামে প্রকাশিত 'The Zemindar and the Ryot' নামক পত্রে রাশিয়ার সার্ফদের মুক্তিদাতা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের উল্লেখ আছে (হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৫শে নভেম্বর, ১৮৫৮। জারের সংস্কার প্রচেষ্টা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসে প্রভাব বিস্তার করেছিল। মস্কোর অভিজাতদের সভায় রাশিয়ায় সম্রাট আলেকজাণ্ডারের ভাষণের প্রতি পত্রলেখক বাঙলাদেশের জমিদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন —কেননা এদেশে ইংরেজ শাসনের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ ছিলেন নব্য জমিদারগণ।

ঊনিশ শতকের পাঁচের দশকে বাঙলাদেশের কৃষকসমাজ অসংগঠিতভাবে কিছু ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট সম্বন্ধে হিন্দু পেট্রিয়টে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির নাম 'English Strikes and Bengalee Dhurmghuts'। প্রবন্ধটিতে সমাজের নব-বিন্যাসের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ সাধনকে প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। লেখক বাঙলাদেশের কৃষকদের ধর্মঘটের কারণ হিসাবে socialistic doctrines এর প্রভাব অনুমান করেছেন এবং সমাজের উচ্চশ্রেণীকে নিম্নশ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পরামর্শ দিয়েছেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলনের আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিল। ১৮৫৫ খৃঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারীর পেট্রিয়টে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলনের আন্দোলনকে সময়োপযোগী বলে মনে করে মন্তব্য করা হয়েছিল, "বিধবা বিবাহের ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রতার ফল ভালো না হতে পারে এবং রাজবল্লভের প্রচেষ্টার মত বর্তমান বিধবা বিবাহ

বাঙলা সরকার প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থাপনের পূর্বে 'Papers relating to the establishment of the Presidency College of Bengal' প্রকাশ করেন। পাঠ্যসূচীতে ল্যাটিন শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। শিক্ষার ক্ষেত্রে উদারনীতির সমর্থক হিন্দু পেট্রিয়টে 'An apology for a University'-তে মন্তব্য করা হয়েছিল, "...দেশীয় যুবকগণ প্রাচীন ইওরোপীয় ক্লাসিকের অধ্যয়নকে উদারনৈতিক শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন। ল্যাটিন ও গ্রীকভাষা ইওরোপের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বদ্ধ রেখেছে—আমরা প্রেসিডেন্সী কলেজকে সেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ দেখতে চাই...।" (হিন্দু পেট্রিয়ট, ৮ই জুন, ১৮৫৪।

২

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ বাঙলা নবজাগরণের সুবর্ণযুগ। প্রথমার্ধে ইংরাজীর মাধ্যমে ইওরোপের উন্নত সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমাদের চিন্তাকাশে যে সূর্যোদয় হয়েছিল সেই সূর্যোদয়ে অনেক আশা ও সম্ভাবনা ছিল—আমরা ইংরেজের সহযোগিতায় চিন্তার ক্ষেত্রে নবলব্ধ দেশপ্রেম, জাতীয়তা প্রভৃতির বাস্তব অবয়ব প্রত্যাশা করেছিলাম; কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে বণিক ইংরাজের বাস্তব প্রশাসন, আমলা ইংরাজের পক্ষপাতিত্ব ও জাতিবিদ্বেষ আমাদের মনে আস্থাহানির সূত্রপাত করেছে। ইংরাজ—ইওরোপের উত্তরসাধক এবং গণতন্ত্র ও অন্যান্য বুর্জোয়া মূল্যবোধের ধারক-বাহক ইংরাজ সম্পর্কে আমাদের মোহ-ভঙ্গের সূত্রপাত হয়েছে। ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইওরোপের চিত্তবৃত্তির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বাঙলাদেশে সীমাবদ্ধ নবজাগরণের যে জলকল্লোল শুরু হয়েছিল দ্বিতীয়ার্ধে সেই কল্লোলের জোয়ার অনেকখানি স্তিমিত হয়ে গিয়েছে অথচ ভাটার সময়ও আসেনি। ফলে সংস্কৃতির জগতে, বিশেষ করে সাহিত্যের জগতে আমাদের ফসল ফলতে আরম্ভ করেছে। প্রথমার্ধে কর্ষণ—দ্বিতীয়ার্ধে ফসল উৎপাদন। এই উৎপাদনে ইওরোপের স্পর্শ ছিল অথচ মাটি ছিল উপনিবেশ ভারতবর্ষের। ফলে দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ-বিতাড়ন একটি অসম্ভব কল্পনা ছিল—কিন্তু ইওরোপের মূল্যবোধে দীক্ষিতরা ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির অনাচারকে নীরবে মেনে নেয় নি—নিয়মতান্ত্রিক পথে সেই অনাচার দূর করতে চেয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী নবাবী অত্যাচার, বর্গীর আক্রমণ, প্রশাসনিক পঙ্গু-

শতাব্দীর ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সমস্ত অনাচার ও অত্যাচারের কারণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—নিয়মতান্ত্রিক পথে তা দূর করার চেষ্টা করেছেন —এটাই বাঙলা রেনেসাঁসের ইতিবাচক দিক। পরাধীনতা সর্ব দুঃখের কারণ জানা সত্ত্বেও ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদে সামন্ততান্ত্রিক শক্তির পুনঃপ্রত্যাবর্তনের সদা আশঙ্কা, অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত জীবনযাপন, বিভিন্ন অভ্যুত্থানে নিজেদের ভূমিকা যথাযথ পালন না করা ইত্যাদি বাঙলা নবজাগরণের ধারক-বাহকদের অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক বিরাট অংশের নেতিবাচক দিক। বর্তমান প্রবন্ধে বাঙলা নবজাগরণের উপরোক্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক-গুলি সম্বন্ধে বিশদ ও সূক্ষ্ম আলোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয়, পত্রাদির উদ্ধৃতি থেকে একথা অস্বীকার করা যায় না যে পেট্রিয়টের একটি ইতিবাচক দিক ছিল। নীল হাঙ্গামা একটি জাতীয় আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছিল—কেননা নীলকরদের অত্যাচার জমিদার থেকে কৃষক পর্যন্ত সকলকেই স্পর্শ করেছিল। নীল-হাঙ্গামা কৃষকদের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম—এই সংগ্রাম শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়নি। এবং এই সমর্থন অর্জনে পেট্রিয়টের একটি বিশেষ ভূমিকা অনস্বীকার্য। উন্নত সভ্যতার মূল্যবোধ ও স্বার্থের সংঘাত আমাদের জাতীয়তা-বোধের ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল—পেট্রিয়ট একদিকে এই উন্নত সভ্যতার মূল্যবোধের ফসল রক্ষার জন্য বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন, লিবারেল শিক্ষাব্যবস্থা, ইওরোপের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে সর্বদা সরব প্রচার করেছে, অন্যদিকে নিপীড়িত প্রজাদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে জনমত গঠনে সক্রিয় হয়েছে। শুধু তাই নয়, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে অত্যাচার প্রতিরোধের জন্য নিপীড়িত প্রজাদের, বিশেষ করে নীলচাষীদের অনুপ্রাণিত করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের, শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্তদের যাঁরা বৈপরীত্যের অভিযোগে বাতিল করতে চান তাঁরা হিন্দু পেট্রিয়টের কৃষক-দরদী ভূমিকাটির কথা স্মরণ করবেন। শ্রমজীবী শ্রেণীর সংগ্রামে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সহযোগী শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে—ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের যুগে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা অন্ততঃ সীমিত অর্থে সেই সহযোগী শক্তির ভূমিকা পালন করেছে—এবং পেট্রিয়টে তার অজস্র প্রমাণ আছে। অথবা পেট্রিয়টই মধ্যবিত্তকে তার ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছে একথা

ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন বাঙলা নবজাগরণের মূল কারণ হওয়ায় নব-জাগরণের বাহক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে এবং তাদের মুখপত্র-গুলিকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের দালাল হিসাবে চিহ্নিত করার একটি অতি আধুনিক প্রবণতা এ যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। উপনিবেশে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ লাভ করার ফলে বাঙলা নব-জাগরণের বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ইওরোপীয় মানের হতে পারে না—সেখানে বৈপরীত্য ও সীমাবদ্ধতা একটি অনিবার্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং বৈপরীত্য ও সীমাবদ্ধতা দেখে বাঙলা নব জাগরণের একটি ফসল দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ এবং উক্ত বোধের ধারক-বাহকদের দালাল শ্রেণীভুক্ত করা অযৌক্তিক। বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় জনগণের দুর্দশা, স্বায়ত্তশাসনের সপক্ষে বক্তব্য রাখা, ব্রিটিশ র‍্যাডিকালিজমের প্রশংসা ও ইণ্ডিয়ান অফিসিয়ালি-জমের নিন্দা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী, কৃষকদের রায়তী স্বত্বদানের ব্যাপারে রাশিয়ান সম্রাটের প্রচেষ্টা প্রভৃতি সংবাদ ও পত্রাদি প্রকাশ করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালালী করেছে? বরং বাঙলা নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিন্দু পেট্রিয়ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে সমাজমুখিন কর্মযজ্ঞে, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় চিন্তা থেকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় চিন্তার জগতে সমুন্নত করতে চেয়েছে এবং এটাই হিন্দু পেট্রিয়টের সাংবাদিকতার ইতিবাচক নিদর্শন।

নাট্য আন্দোলন ও বাংলা থিয়েটারের বিকৃত ব্যাখ্যা

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়া ইতিহাস রচনায় কোন ভূমিকা গ্রহণ বা তার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া তো দূরের কথা, সেই ইতিহাস জানার বা তা বোঝার চেষ্টা না করে পরম বিজ্ঞের মত ইতিহাসের ব্যাখ্যাতা সাজতে যাওয়া ব্যাপারটা ভাল নয়। সেটা যে কতটা হাস্যকর, প্রমাদপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠতে পারে—তার প্রমাণ বাংলা ১৩৮৩ সালের শারদীয় কালান্তর পত্রিকায় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর মহা মূল্যবান রচনা "বাংলা নাটকের চড়াই উৎরাই"। "অন্য থিয়েটার"-এর প্রবক্তা সেজে গদার প্রহারে তিনি কেবল গণনাট্য সংঘেরই নয়, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যকেই ধরাশায়ী করতে চেয়েছেন। রুদ্রপ্রসাদ নিজেই বলেছেন, "১৯৬১ সাল থেকে আমি নান্দীকারের সঙ্গে তথা বাংলা নাট্যের সঙ্গে যুক্ত। মোটা-মুটি নিয়মিত এবং দায়িত্ববান হয়ে কাজ শুরু করেছিলাম চৌষট্টিতে।" গণনাট্য সংঘের জন্ম ১৯৪৩ সালে এবং ১৯৬২ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে তা বেশ সক্রিয় ও সজীবই ছিল। তা হলে দেখা যাচ্ছে, গণনাট্য সংঘের জন্মকালে রুদ্রপ্রসাদ ছিলেন নিতান্ত অবোধ বালক। কোন্ নয়া শিল্পচিন্তা থেকে গণনাট্য সংঘের জন্ম হয়েছিল আর কোন্ শক্তিবলেই বা তা সর্বভারতীয় আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল তা বোঝার মত বয়স তখন তাঁর ছিল না।

গণনাট্য সংঘ ও তার সারা ভারতব্যাপী আন্দোলনের কোন অভিজ্ঞতাই নেই তাঁর। অথচ তিনি রায় দিয়ে বসেছেন: "আদর্শ ও উদ্দেশ্য দু-দিক থেকেই গণনাট্য সংঘ ছিল রাজনীতিনির্ভর। ফলত এর কর্তৃত্বে এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা মনে করতেন যে রাজনীতিই গণনাট্য সংঘের চালিকা শক্তি হবে। ...এই কর্মকর্তাদের অনেকেই মনে করতেন যেহেতু তাঁরা ভাল রাজনীতি বোঝেন (বা মনে করেন বোঝেন) তাই শিল্পও তাঁরাই ভাল বুঝবেন। আসলে এঁরা অনেকেই রাজনীতি যতটা বুঝতেন (বা মনে করতেন বুঝতেন) সেই [illegible]"

এই হঠকারিতা করার আগে রুদ্রপ্রসাদ যদি গণনাট্য সংঘের ইতিহাস জানার একটু চেষ্টা করতেন তবে নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে হয়ত খানিকটা সচেতন হতেন। প্রথমেই তিনি জেনে রাখুন, গণনাট্য সংঘ কোন বিশেষ গোষ্ঠী থিয়েটারের (রুদ্রপ্রসাদের 'অন্য থিয়েটার') মত সংকীর্ণ চার দেয়ালে আবদ্ধ ছিল না। সেটা ছিল একটা সর্বভারতীয় শিল্প আন্দোলন আর তার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও ছিল। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা ও মণিপুর থেকে গুজরাট পর্যন্ত ছিল তা ব্যাপ্ত। দুর্ভাগ্য রুদ্রপ্রসাদের যে গণনাট্য সংঘের কোন সর্বভারতীয় সম্মেলনে সেই বিশাল শিল্পী সমাবেশ দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। কিন্তু তেমন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গণনাট্য কর্মী আজও এই পশ্চিমবঙ্গেই বেঁচে আছেন এবং লেখকও তাঁদেরই একজন। রুদ্রপ্রসাদকে আরও জানিয়ে রাখা দরকার যে গণনাট্য সংঘের মঞ্চে কেবল নাটকই স্থান পেত না; নর্তক, গায়ক, কবি প্রভৃতিরাও সেখানে স্থান পেতেন। যেমন স্থান পেত নতুন সৃষ্টি, তেমনি মর্যাদা পেতেন ট্রাডিশনাল ও ক্লাসিক্যাল শিল্পী। লোকশিল্প ও নাগরিক মার্জিত শিল্প সমভাবেই স্থান পেত সেই মঞ্চে। শিল্পের এক মহা মিলনতীর্থ হয়ে উঠেছিল বলেই গণনাট্য সংঘ সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পরিণত হতে পেরেছিল যা এনে দিয়েছিল এক নতুন শিল্পচেতনা ও প্রাণের জোয়ার।

রুদ্রপ্রসাদ গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বের রাজনৈতিক চেতনার প্রতিযতই কটাক্ষ করুন না কেন, তিনি জেনে রাখুন তাঁদের জীবনমুখীন রাজনৈতিক চেতনা ছিল বলেই অবক্ষয়বিরোধী এক নব্য শিল্পদৃষ্টি তাঁরা এনে দিতে পেরেছিলেন। তাঁদের রাজনৈতিক চেতনা ও শিল্পদৃষ্টির মধ্যে বিরোধ ছিল না। বরং রাজনৈতিক প্রেরণা ছিল বলেই তাঁরা শিল্পের মূল লক্ষ্য স্থির করতে পেরেছিলেন এবং জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তন আনার জন্যে দৃঢ়সংকল্প নিয়ে কাজে নেমেছিলেন। রুদ্রপ্রসাদের 'অন্য থিয়েটার'-এর মত লক্ষ্যহীন দিকভ্রষ্ট হয়ে তাঁরা জনসাধারণকে ধোঁয়াশার মধ্যে ফেলেন নি।

যাঁদের শিল্পজ্ঞান ছিল না বলে রুদ্রপ্রসাদ চাবকাতে চেয়েছেন তাঁরা সারা ভারতে প্রথম সারির যেসব শিল্পীকে গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে এনে দাঁড় করাতে পেরেছিলেন, রুদ্রপ্রসাদের 'অন্য থিয়েটার' (অন্য থিয়েটার বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন তিনিই জানেন। বোধ হয় মঞ্চোবের খিচুড়ি) কি

পৃথ্বীরাজ কাপুর, বলরাজ সাহনি, গণশিল্পী ওমর শেখ, মারাঠী লোকগায়ক গাভস্কর, আধুনিক মারাঠী থিয়েটারের জন্মদাতা আন্নাভাও নাঠে, নৃত্যবিদ শান্তি বর্ধন, সংগীতসাগর রবিশংকর, 'নবজীবনের গান' রচয়িতা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, লোকসংগীত বিশেষজ্ঞা শীলা ভাটিয়া, খ্যাতনাম্নী পাঞ্জাবী লোকসংগীত গায়িকা সুরিন্দর কাউল, আসামের নৃত্যবিশারদ বিষ্ণু রাভা, সুখ্যাত সংগীত-বিদ ডঃ ভূপেন হাজারিকা, ময়মনসিংহের নিবারণ পণ্ডিত, চট্টগ্রামের কবিয়াল রমেশ শীল ও মুর্শিদাবাদের শেখ গোমানি, উত্তরবঙ্গের দোতারা বাদক টগর, বরিশালের ঢুলী ক্ষীরোদ নট্ট, এ রাজ্যের নাট্য জগতের দুই স্তম্ভ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও শচীন সেনগুপ্ত, অভিনেতা কালী সরকার, সুরকার-অভিনেতা-নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি গণনাট্য সংঘে এসেছিলেন কি শুধু রাজনীতি করতে, না শিল্পের টানে ? নির্মলেন্দু চৌধুরী ও সলিল চৌধুরী কি গণনাট্য সংঘের মঞ্চ থেকেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি ? শম্ভু মিত্রই বা গণনাট্য সংঘে এসেছিলেন কিসের টানে ? নাম বাড়িয়ে লাভ নেই। গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বের যদি শিল্পজ্ঞানই না থাকত তবে এসব খ্যাতনামা শিল্পীকে সংঘে টেনে আনত না। যাদের নাম করা হল তাঁদের চেয়ে রুদ্রপ্রসাদ নিজেকে অতি বড় শিল্পী মনে করেন বলেই হয়ত এমন বাচালতা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

তারপরে তিনি বলেছেন যে, গণনাট্য সংঘের কর্তাব্যক্তিদের শিল্পজ্ঞান ছিল না বলেই "ঠোকাঠুকি লাগত, তিক্ততা এসে কাজ পণ্ড করে দিত। ফল-শ্রুতিতে, প্রথমে গেলেন শম্ভু মিত্র আর কিছু সহযোগী, ধীরে ধীরে অনেকে বেরিয়ে গেলেন।" রুদ্রপ্রসাদের জানা দরকার যে শম্ভু মিত্র বেরিয়ে যাবার পরেও গণনাট্য সংঘের বহু সফল নাট্যাভিনয় ও নৃত্যগীত হয়েছে এবং ১৯৬১ সালেও ইণ্ডোর রঙ্গি স্টেডিয়ামে সপ্তাহাধিককাল ব্যাপী নাট্যোৎসব হয়েছে যাতে যোগ দেয় গণনাট্য সংঘের বিভিন্ন শাখা ও নামকরা অতিথি শিল্পীরা। শম্ভু মিত্র গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে যান ১৯৪৮ সালে। তাঁর বেরিয়ে যাবার কারণটা হয়ত অনেকের জানা নেই। 'নবান্ন' প্রযোজনার পরেই গণনাট্য ছেড়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র জগতে ভাগ্যান্বেষণে। ফিরে এসে তিনি তাঁর অভিরুচি অনুযায়ী দীনবন্ধুর 'নীল দর্পণ'কে বিকলাঙ্গ করে 'লাল দর্পণ' করতে চেয়েছিলেন। বাধা পেয়ে

শিল্পগত মতভেদ। তাতে দোষের কিছু নেই ; এমন তো হয়েই থাকে। শিল্পাদর্শ নিয়ে বিতর্ক, আলোচনা বা মতান্তর হওয়াটা কি দোষের ? রুদ্রপ্রসাদ তাকে বলেছেন 'ঠোকাঠুকি'। কেউ দল ছেড়ে গেলেই কি সেটা 'ঠোকাঠুকি' হয় ? তবে তুলসী লাহিড়ী, কালী সরকার, সবিতাব্রত দত্ত, মহম্মদ ইসরাইল একসঙ্গে বহুরূপী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন কি শম্ভুবাবুদের সঙ্গে 'ঠোকাঠুকি' করে ? নান্দীকার ছেড়েই বা কয়েকজন বেরিয়ে গিয়ে থিয়েটার ওয়ার্কশপ গড়েছিল কেন ? অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যে 'নান্দীকার' ছেড়ে 'নান্দীমুখ' গড়েছেন তাও কি তবে রুদ্রপ্রসাদের সঙ্গে 'ঠোকাঠুকি' করে ? কিসের ঠোকা-ঠুকি ? রুদ্রপ্রসাদের 'অন্য থিয়েটার'-এর দলগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে অন্তিম দশায় এসে পৌঁচেছে কেন ? রুদ্রপ্রসাদ জেনে রাখুন, ঠোকাঠুকি করে গণনাট্য সংঘের কেউ কারো মাথা ফাটায় নি। যারা গণনাট্য সংঘের সচেতন শিল্পকর্মকে সহ্য করতে পারে নি তারাই বরং গণনাট্য কর্মীদের মাথা ফাটিয়েছে এবং আজও তার সংগ্রামী ঐতিহ্যকে ম্লান করার চেষ্টায় আছে। ভাবতে কষ্ট হয়, রুদ্রপ্রসাদ কি তাদেরই দলে ? রুদ্রপ্রসাদের বোঝা উচিত ছিল, কাঁচের ঘরে বাস করে অন্যের গায়ে ঢিল ছোঁড়ার প্রতিফল কি দাঁড়ায়।

গণনাট্য সংঘের ঐতিহ্যকে ম্লান করার চেষ্টা আগের বছরও রুদ্রপ্রসাদ কালান্তর শারদীয় সংখ্যায় "রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন হাত ধরাধরি করে চলুক" শীর্ষক এক প্রবন্ধে করেন। তাতে তিনি লেখেন : "আমি আই পি টি এ র (ভারতীয় গণনাট্য সংঘ) সঙ্গে কোনদিন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম না, আজকে দূর থেকে দেখে আমার নিজের মত করে একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করছি। সেটা হচ্ছে যে, আই পি টি এ-র সাংগঠনিক কর্তৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা মনে করতেন তাঁদের কথাই শেষ কথা। শিল্পীরা স্বভাবতই একটু 'সেন্সিটিভ' হয় এবং শিল্পকে তাঁরা এই তাত্ত্বিকদের চেয়ে একটু বেশি বোঝেন। তার ফলে একটা 'স্ট্রেট জ্যাকেট' পরাবার চেষ্টা ছিল ঐ সাংগঠনিক কর্ণধারদের। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যেহেতু তাঁরা মার্কসীয় তত্ত্বের অধিকারী সেহেতু তাঁরা শিল্পেরও অধিকারী। এরকম একটা সহজ সরল অঙ্কের হিসাবেই তাঁরা নানান কাণ্ডকারখানা করতেন।"

রুদ্রপ্রসাদের মতে কোন শিল্পীর রাজনীতিসচেতন ও শিল্প আন্দোলনের

তাঁর যত আক্রোশ। গণনাট্য সংঘের সংগঠকরা কিন্তু রাজনীতিসচেতন হওয়াটা মোটেই অপরাধ মনে করতেন না বা মার্কসবাদের নাম শুনলেই রুদ্রপ্রসাদের মত তাঁদের এলার্জিও দেখা দিত না। তিনি কি বলতে চান যে মার্কসবাদের সঙ্গে শিল্পের বিরোধ আছে? মার্কসই তো বলেছিলেন, যা কিছু মানবীয় তাই তাঁর কাছে গ্রহণীয়। শিল্পের বড় কথাই তো মানবতা আর এই মানবতা যেখানে লাঞ্ছিত সেখানেই সচেতন শিল্পীর বিবেক তার বিরুদ্ধে সোচ্চার। গণনাট্য সংঘের সংগঠক শিল্পীরা যদি সেই দায়িত্ব কিয়ৎ পরিমাণেও পালন করে থাকেন এবং যাঁরা মার্কসবাদে বিশ্বাসী নন অথচ শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বে বিশ্বাসী তেমন শিল্পীদেরও গণনাট্য সংঘে এনে নবচৈতন্যের এক গণশিল্পমঞ্চ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়ে থাকেন তবে মার্কসবাদী হওয়াটা কি তাঁদের অপরাধ হয়েছিল? অন্য রাজ্যের কথা ছেড়ে দিই, এ রাজ্যে গণনাট্য সংঘ গড়ার মূলে বিনয় রায়, সুধী প্রধান, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য প্রভৃতি যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই মার্কসবাদী হয়েই এসেছিলেন শিল্প আন্দোলন করতে। শম্ভু মিত্রও তখন মার্কসবাদী ছিলেন বলেই জানি। পরে মার্কসবাদে তাঁর বিতৃষ্ণা এসেছিল কি না, রুদ্রপ্রসাদ হয়ত বলতে পারবেন; আমার জানা নেই বা জানার চেষ্টাও করি নি; কারণ একজনের শিল্পকর্মের মধ্যেই রয়েছে তাঁর প্রকৃত পরিচয়। উপরে যাঁদের নামোল্লেখ করা হল, রুদ্রপ্রসাদ কি বলতে চান তাঁদের কারোই শিল্পজ্ঞান ছিল না বা তাঁরা শিল্পী নন? মার্কসবাদে কি শিল্পের রূপকল্প নিয়ে বিতর্ক বা মতান্তর হওয়া নিষিদ্ধ নাকি। মার্কসবাদ জীবনবর্জিত শুষ্ক তত্ত্ব নয়, গতিশীল প্রয়োগবিজ্ঞান। জীবনের গতির সঙ্গে শিল্প সম্পৃক্ত বলেই ইতিহাসের মোড় ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পচিন্তারও পরিবর্তন হয়। তা নিয়ে বিতর্ক হলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না বা মার্কসবাদে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও আলাদা হয়ে স্বকীয় ধ্যানধারণা অনুযায়ী শিল্পকর্ম করলে তাতে দোষের কিছু থাকে না। তেমনভাবে বেরিয়ে গিয়ে কেউ যদি আলাদাভাবে শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করে তাতেই গণনাট্য সংঘ অশুচি হয়ে গেছে এবং সেজন্যে তার মুণ্ডপাত করতে হবে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বোঝা ও তা স্বীকার করার মত সামান্য জ্ঞান এবং সংবুদ্ধিও যাঁদের আছে তাঁরা গণনাট্য সংঘ তথা গোটা গণনাট্য আন্দোলনেরই গায়ে এরূপ কর্দমনিক্ষেপ করতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হবেন। রুদ্রপ্রসাদের জানা না থাকলেও

মুখার্জী, তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, নিবেদিতা দাস, ঋত্বিক ঘটক, সাধনা রায়চৌধুরী, জ্ঞানেশ মুখার্জী, কালী ব্যানার্জী, তাপস সেন প্রভৃতি আজ যাঁরা সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পক্ষেত্রে তাঁদের প্রকাশ ও বিকাশ যে গণনাট্য সংঘেরই মঞ্চে, যাঁরা সামান্য খোঁজখবরও রাখেন তাঁরাই জানেন এবং এঁদের কেউ বোধ হয় তা অস্বীকারও করবেন না। জীবিকার তাগিদে ব্যবসায়িক শিল্পের জগতে গেলেও প্রাণের টান যে তাঁদের গণনাট্য সংঘের শিল্পাদর্শেরই প্রতি আছে, যাঁরা তাঁদের সংস্পর্শে আছেন তাঁরাই জানেন। প্রসঙ্গত চিত্র-জগতের অতুলনীয়-শিল্পী বলরাজ সাহনির একটি উক্তি মনে পড়ে। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে দিল্লীতে গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধি-দের সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি প্রথমেই বলেন: "কোন্‌টা কুশিল্প আর কোন্‌টা সুশিল্প তা জানলাম আমি গণনাট্য সংঘেই এসে।" উৎপল দত্ত ও মৃণাল সেনের গণশিল্পচেতনাও যে গণনাট্য সংঘের সংস্পর্শে এসেই, তাঁরাও নিশ্চয়ই তা স্বীকার করবেন।

মোদ্দা কথা, গণনাট্য সংঘ একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বলেই তার যেমন ছিল প্রবহমানতা তেমনি ছিল গ্রহণশীলতা। একদিকে এই আন্দোলন যেমন জাতির পরম্পরাগত উচ্চাঙ্গকলা ও লোককলার ধারাগুলিকে আত্মসাৎ করে তার যোগ্য উত্তরাধিকারী হবার চেষ্টা করেছে তেমনি অন্যদিকে সৃষ্টির নতুন সম্ভাবনাগুলিকে জনসমক্ষে তুলে ধরে বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। তাই উচ্চাঙ্গকলা ও লোককলার শিল্পীরা যেমন গণনাট্য মঞ্চে এসে এই আন্দোলনে শক্তি সঞ্চার করেছেন তেমনি নতুন নতুন শিল্পীরা এসে প্রকাশের সুযোগ পেয়ে শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন। তাই গণনাট্য সংঘ থেকে বহু নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সংগীত রচয়িতা ও সুরকার, গায়ক-গায়িকা, নৃত্যশিল্পী, মঞ্চকুশলী ও নানাবিধ শিল্পকর্মী বেরিয়েছেন যাঁদের মধ্যে অনেকে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন এবং বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে শিল্প-সৃষ্টিতে নতুন মাত্রা যোগ করতেও সমর্থ হয়েছেন। গণনাট্য সংঘের শিল্পাদর্শ তার নিজেরই বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তার প্রভাব যে বাইরেও পড়ে এবং আজও যে তা আছে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের তা নজরে না পড়ার কথা নয়। এমন একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে যখন কোন ক্ষুদ্র এক নাট্যগোষ্ঠীর

মনে পড়ে। কুয়োর ব্যাঙ যেমন এক লাফে কুয়ো ডিঙিয়ে সমুদ্রের ব্যাঙকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তার সমুদ্র কি এর চেয়েও বড়, রুদ্রপ্রসাদেরও বোধ করি প্রকারান্তরে তেমনি প্রশ্ন, তাঁর 'অশ্ব থিয়েটারের' নাটকগুলির চেয়ে গণনাট্য সংঘের নাটকগুলি কি কোনদিক থেকেই উৎকৃষ্ট? এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে ইতিহাসে। একটা গোষ্ঠী থিয়েটারের মাপকাঠি দিয়ে একটা সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিমাপ করতে গেলে তো সেই কুয়োর ব্যাঙের দশাই হয়। তিনি যদি বলেন, সে-সব নাটকে শিল্পসৌকর্য ছিল না তবে তার উত্তরে বলতে হয়, লক্ষ লক্ষ দর্শক যে সেসব নাটক দেখে কেবল মুগ্ধই হয় নি, অনুপ্রাণিতও হয়েছে, সেকি কেবল সেগুলোর নাট্যসৌকর্যহীনতা ও দুর্বল প্রযোজনার জন্যেই। যেসব বুর্জোয়া পত্রিকার প্রশংসা পেলে রুদ্রপ্রসাদরা এখন ধন্য হন, সেসব পত্রিকাই তখন গণনাট্য সংঘ ও তার ভ্রাতৃপ্রতিম নাট্য-সংস্থাগুলির প্রযোজিত নাটকসমূহ সম্পর্কে কি বলেছে সেগুলির পাতা একটু উল্টিয়ে দেখলেই তাঁদের চক্ষুস্থির হয়ে যাবে। কমিউনিস্ট পত্রিকার কথা ছেড়েই দিলাম; কারণ রুদ্রপ্রসাদের মত নাট্যপ্রবক্তাদের কাছে তা 'দলীয় ব্যাপার' হতে পারে। গণনাট্য আন্দোলনের নাটকগুলি নিয়ে যে গবেষণা হয়েছে (দুটি থিসিস এরই মধ্যে গৃহীত) ও হচ্ছে তার খবর রাখেন কি রুদ্রপ্রসাদ? সেই গবেষকরা কি বলেন তা একবার দেখে নিলে নিশ্চয়ই তাঁর হাস্যকর গদা আস্ফালন থেমে যাবে। হ্যাঁ, গণনাট্য সংঘ যেমন আহরণও করেছে তেমনি সৃষ্টিও করেছে, কেবল পরের ধনে পোদ্দারি করে নি। আর গণনাট্য সংঘ ছিল নাটক, নৃত্য, সঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক সর্বকলার সৃষ্টি ও বিকাশের ক্ষেত্র। তাছাড়া গণনাট্য সংঘের নাট্যকাররা তাঁদের নাটকে গণ-জীবনকেই আনতে চেয়েছেন। রুদ্রপ্রসাদ তাঁর থিয়েটারে কোন্ গণজীবন এনেছেন যেখানে দেখা যায় শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রাম? পাশ্চাত্য দুনিয়ার অবক্ষয়ী চিন্তার নাটকগুলিকে গণনাট্য সংঘের কর্মীরা যদি আদর্শ মনে না করে থাকেন তবে কি তাঁরা তাতে কিছু দোষ করেছেন যে রুদ্রপ্রসাদের এত রাগ তাঁদের ওপর?

রুদ্রপ্রসাদ 'অশ্ব থিয়েটার' বলতে কি বোঝাতে চান তিনিই জানেন। তবে গণনাট্য সংঘের শিল্পাদর্শের সঙ্গে তাঁর সেই 'অশ্ব থিয়েটার'-এর শিল্পাদর্শের যে পার্থক্য আছে তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। ১৩৮৩

থিয়েটার'-এর প্রথম ও শেষ কথা : শিল্প"।—তার অর্থ শিল্পের জন্যেই শিল্প—তার কোন লক্ষ্য বা সামাজিক দায়িত্ব নেই। এই বুর্জোয়া পচা তত্ত্বটা জাহির করতে গিয়ে তিনিধরা পড়ে গেছেন। তিনি কি জানেন না যে ঊনবিংশ শতকেই পশ্চিম দুনিয়ায় এ নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক হয়ে গেছে এবং কলাকৈবল্যবাদীদের শিল্পতত্ব অগ্রাহ্য করেই এবং সামাজিক দায়ভাগ স্বীকার করেই শিল্পসাহিত্য তার আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে! অক্টোবর মহাবিপ্লবের পরে যাঁরা নতুন সামাজিক দায়বোধ স্বীকার করেন তাঁরা নতুনভাবেই শিল্পসৃষ্টি করে চলেন। সেখানে শিল্প আর শ্রেণীনিরপেক্ষ থাকে না, শ্রেণীসাপেক্ষ হয়ে ওঠে। গণনাট্য সংঘের কর্মীরা যদি সেই নতুন সামাজিক দায়বোধ থেকেই শ্রেণীসচেতন শিল্পসৃষ্টি করে থাকেন আর রুদ্রপ্রসাদের 'অন্য থিয়েটার' যদি তার শিল্পচিন্তাকে তার সঙ্গে মেলাতে না পারেন তবে তার জন্যে কি দায়ী গণনাট্য সংঘ বা তার কর্মিবৃন্দ অথবা সংগঠকরা? তাঁর 'অন্য থিয়েটার' কলাকৈবল্যবাদ চালাতে চায় চালাক, কিন্তু গণনাট্য সংঘের গায়ে কাদা ছোঁড়া কেন? প্রসঙ্গত তাঁরই দল 'নান্দীকার' সম্পর্কে একটি বৃত্তান্ত উপহার দিই। গণনাট্য সংঘেরই শাখা হিসেবে নান্দীকার যখন পিরানদেলোর Six Characters in Search of an Author অবলম্বনে রচিত 'নাট্যকারের সন্ধানে' প্রযোজনা করে তখন গণনাট্য সংঘের রাজ্য কমিটির অনেকেই তাতে বিরূপ হয়ে নাটকটি বন্ধ করার জন্যে প্রস্তাব নিতে চান। সবিনয়ে জানাই—আমি তখন রাজ্য কমিটির সভাপতি ছিলাম বলে ব্যাপারটা জানি। সে-সময়ে আমি তাঁদের নিরস্ত করতে চেয়েছিলাম এই বলে যে, পুলিসী খবরদারী করার দায়িত্ব গণনাট্য সংঘ কখন নিতে পারে না। তাছাড়া এটি একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। নান্দীকার এই নাটকের অভিনয় বন্ধ না করলে তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ স্বাভাবিকভাবেই উঠবে আর সেক্ষেত্রে শাস্তিমূলকব্যবস্থা নেয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। শিল্পের ক্ষেত্রে এতটা অসহিষ্ণুতা ভাল নয়। তার চেয়ে বরং মতাদর্শগত সমালোচনা করা হোক। সেটা নান্দীকারকে জানিয়ে দিলেই হবে। আমার যুক্তি মেনে নিয়ে তাই করা হয়। রুদ্রপ্রসাদের সেটা জানা বা মনে নাও থাকতে পারে; কিন্তু নান্দীকারের তখনকার দলপতি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে থাকারই কথা। এর পরেও কি রুদ্রপ্রসাদ বলবেন যে গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বের সহিষ্ণুতা ছিল না? তার কিছুকাল

কারণে ; শিল্পপ্রত্যয়ে মতান্তর হওয়ায় গণনাট্য সংঘ থেকে নান্দীকারকে বহিষ্কৃত করার কোন সিদ্ধান্তই কখনো হয় নি। হয়তো গণনাট্য সংঘ থেকে মতাদর্শগত সমালোচনাটাই সহ্য হয় নি বলে নান্দীকার সংঘ ছেড়ে দিয়েছিল। গণনাট্য সংঘের একটা শিল্পাদর্শ ছিল বলেই সেই মতাদর্শগত সমালোচনারও প্রয়োজন ছিল। এমন আরো অনেক নাটকেরই সমালোচনা হয়েছে। সেই সমালোচনা সহ্য করতে না পেরে য'ারা গণনাট্য সংঘ ছেড়ে চলে গেছেন ত'ারা তা করেছেন নিজ দায়িত্বে ; তার জন্যে গণনাট্য সংঘ দায়ী নয়।

রুদ্রপ্রসাদ গণনাট্য সংঘের 'সাংগঠনিক কর্ণধারদের' বিদ্রূপ করেছেন এই বলে যে "তাঁরা বিশ্বাস করতেন যেহেতু তাঁরা মার্কসীয় তত্ত্বের অধিকারী সেহেতু তাঁরা শিল্পেরও অধিকারী। এ রকম একটা সহজ সরল অঙ্কের হিসাবেই তাঁরা নানান কাণ্ডকারখানা করতেন।" রুদ্রপ্রসাদ কি এর দ্বারা বলতে চান যে মার্কসীয় তত্ত্বের অধিকারী য'ারা তাঁদের শিল্পজ্ঞান থাকতে নেই বা য'ারা অ-মার্কসবাদী তাঁদেরই শিল্পজ্ঞান মার্কসবাদীদের চেয়ে বেশি ? না রুদ্রপ্রসাদবাবু, মার্কসবাদীদের শিল্পজ্ঞান অন্য কারো চেয়ে কম নয় বা তাঁরা এমনও মনে করেন না যে কেউ মার্কসবাদী না হলে তাঁর শিল্পজ্ঞান থাকে না। তবে মার্কসবাদী হয়ে য'ারা শিল্পচর্চা করেন, শিল্পবিচারের দৃষ্টিতে অন্যদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য থাকে বই কি ! নির্বিচারে তাঁরা যেমন শিল্পসৃষ্টি করেন না, তেমনি কোন শিল্পকে নির্বিচারে তাঁরা গ্রহণও করেন না। শিল্পবিচারে গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্নটা তাঁরা এড়িয়ে চলেন না। কোথাও ভেজাল থাকলে তাঁরা তা খুঁজে বার করেন আর যা গ্রহণীয় তাই গ্রহণ করেন। সময় সময় বিচারে তাঁদের ভুল হতে পারে ; কিন্তু তা বলে বিচারবুদ্ধিকে তো বর্জন করা যায় না। সব কিছুকেই বিচার করে গ্রহণ বা বর্জন করাই মার্কসীয় পদ্ধতি। যান্ত্রিক নিয়মে ফেলেই বিচার হয়। বিচারে ভুল কার না হতে পারে বা তা নিয়ে বিতর্ক হওয়াও অসম্ভব নয়। কোন সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়াও মার্কসবাদসম্মত নয়। যুক্তি দিয়ে সেটাকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। রুদ্রপ্রসাদ ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। সাহিত্যের তিনি যে ব্যাখ্যা বা ভাষ্য দেন সেটাই যে অভ্রান্ত ও শেষ কথা তা কি তিনি হলফ করে বলতে পারেন ?

নেই ; কিন্তু গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বকে আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি মার্কসবাদীদের আক্রমণ করেছেন বলেই তার উত্তরে এই কথাগুলো বলতে হল।

গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বের প্রতি রুদ্রপ্রসাদের আক্রোশটা—দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয়, তাঁর অজ্ঞতা থেকেই এসেছে। গণনাট্য সংঘের প্রধান সংগঠক যে কমিউনিস্টরা ছিলেন, তাঁর একথা সত্য। কিন্তু একথাটা কি তাঁর জানা নেই যে সাংগঠনিক নেতৃত্ব ছিল যৌথ? সেখানে মার্কসবাদী ও অ-মার্কসবাদী শিল্পজগতের প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিরাই যৌথ নেতৃত্ব দিতেন। মার্কসবাদীরা যদি তেমন একটি সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক শিল্পসংস্থা গড়ে তুলে থাকেন তাতে তাদের দিক থেকে দোষের কি আছে! বরং এটা তো প্রশংসনীয়। প্রধান সংগঠকরা মার্কসবাদী ছিলেন বলেই তাঁদের এই সার্বিক দৃষ্টি ছিল আর তা ছিল, বলেই জাতীয় স্তরে একটা প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। তার আগে বা পরে কেউ বা কোন একটি গোষ্ঠী কি পেরেছে তেমন একটা আন্দোলন সৃষ্টি করতে? সাংগঠনিক নেতৃত্বে যে কেবল মার্কসবাদীরাই ছিলেন না, গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন প্রগতিশীল ব্যক্তিরাও যে ছিলেন, তার দু-চারটি উদাহরণ দিলেই রুদ্রপ্রসাদের বোধোদয় হতে পারে। মহর্ষি আখ্যাত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হয়েও গণনাট্য সংঘে এসে সভাপতিরূপে তার কর্ণধার হন। প্রথিতযশা নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত প্রথমে সংঘের সর্বভারতীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ ও পরে সভাপতি হন এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরও মার্কসবাদে দীক্ষা ছিল না। তুলসী লাহিড়ীর মত খ্যাতিমান শিল্পী ও নাট্যকার গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বে বসেছিলেন কমিউনিস্ট না হয়েই ; কালী সরকারের মত খ্যাতিমান অভিনেতা অ কমিউনিস্ট হয়েও গণনাট্য সংঘে এসেছিলেন শিল্পেরই আকর্ষণে। সুখ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী শৈল্পিক প্রেরণায়ই গণনাট্য সংঘে এসেছিলেন ; মার্কসীয় তত্ত্বে পাঠ নেবার জন্যে নয়। রবিশংকর বা শান্তি বর্ধন কেউ মার্কসিস্ট ছিলেন না। এমন আরো বহু খ্যাত অখ্যাত শিল্পী সেদিন এসে গণনাট্য সংঘ ভরিয়ে দিয়েছিলেন—রাজনৈতিক দিক দিয়ে মার্কসবাদের প্রতি যাঁদের আনুগত্য ছিল না। অথচ রুদ্রপ্রসাদ গণনাট্য সংঘে 'লাল জুজু'র 'কাণ্ড-কারখানা' দেখিয়ে নতুন নতুন 'কচি মুখ, উজ্জ্বল চোখগুলিকে' ভয় পাইয়ে

সুতরাং গণনাট্য সংঘ কেবল মার্কসীয় কচকচিরই আড্ডা ছিল, রুদ্রপ্রসাদের এই তত্ত্ব ধোপে টেকে না। সেটা ছিল শিল্পচর্চা ও অনুশীলনেরই একটা প্রশস্ত ক্ষেত্র। শিল্প ছাড়িয়ে রাজনৈতিক প্রবণতা যদি কখনও মাথা তুলবার চেষ্টা করেও থাকে তবে সেটা সংঘের মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্য হয় নি বা সবাই নতমস্তকে মেনেও নেয় নি। শিল্পের মূল লক্ষ্য সামনে রেখে যে ঘোষণাপত্র রচিত ও গৃহীত হত তাই মেনে চলতেন সবাই। তাতে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেত না, থাকত সর্বসম্মত গণতান্ত্রিক শিল্পবোধ। অবশ্য তত্ত্ব ও রাজনীতি এড়িয়ে চলার উদ্দেশ্য গণনাট্য সংঘের কোনদিনই ছিল না। তা নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা ও বিতর্ক হত, আর তা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তা হত শিল্পেরই লক্ষ্যকে সামনে রেখে, রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণের জন্যে নয়। রাজনীতি-বর্জিত শিল্পে বিশ্বাস ছিল না বলেই গণনাট্য সংঘের শিল্পনীতি আলোচনায় রাজনীতিও স্থান পেত ; তবে সেটাই থাকত মূল উদ্দেশ্য একথা বললে ভুল হবে। রাজনীতি তো জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আবার শিল্পে জীবনেরই প্রতিফলন। সুতরাং জীবনের কথা শিল্পে বলতে গেলে রাজনীতি এসেই যায়। কিন্তু রুদ্রপ্রসাদ গণনাট্য সংঘকে এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যেন সেটা ছিল নিছক একটা রাজনৈতিক আড্ডা। তাঁর জানা দরকার, মার্কসবাদ কেবল রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ; সেটা এমন একটা জীবনবাদী গতিশীল দর্শন যা জীবনের সর্বদিকেরই ওপর আলোকপাত করে। সুতরাং শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কেও মার্কবাদীদের একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে বই কি। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের অভিমতগুলি পড়লেই রুদ্রপ্রসাদ এর সারবত্তা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবেন। তবে এও তাঁর জেনে রাখা ভাল যে, মার্কসবাদের তাত্ত্বিকমাত্রই গণনাট্য সংঘে সাংগঠনিক নেতৃত্ব করতে আসেন নি ; মার্কসবাদীদের মধ্যে যাঁরা শিল্পী ও শিল্পের প্রতি বিশেষ অনুরাগী তাঁরাই এগিয়ে এসেছিলেন গণনাট্য সংঘের সাংগঠনিক কাজে।

কেবল গণনাট্য সংঘেরই নয়, বাংলা নাট্যজগতের বহু কৃতী ব্যক্তিরই কর্ণমর্দন করতে চেয়েছেন রুদ্রপ্রসাদ। তা করতে গিয়ে কত অজ্ঞতার যে পরিচয় দিয়েছেন তিনি, তার দু-একটি নমুনা তুলে ধরা যাক। তিনি লিখেছেন, "শিশিরকুমারের মত প্রতিভাসম্পন্ন নাট্যনির্দেশকও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলা

দিকে শরৎচন্দ্রকে (যিনি কদাচ নাটক লেখেন নি) তিনি বাংলা থিয়েটারের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্যরচয়িতা হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।" রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে নাটক লেখাবার চেষ্টা শিশিরবাবু করেন নি এ খবর রুদ্রপ্রসাদ পেলেন কোথায় ? যাঁরাই শিশিরকুমারের সংস্রবে এসেছেন তাঁরাই জানেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাঁর। সাধারণ রঙ্গালয়ের উপযোগী করে নাটক লেখার জন্যে শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথকে অনেক অনুরোধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যদি তা না লিখে থাকেন বা তেমন নাটক লিখতে যদি তাঁর রুচিতে বাধে তবে তার জন্যে কি শিশিরকুমার দায়ী ? রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা'-কে রুদ্রপ্রসাদ বলেছেন কাঁচা কমেডি। অবশ্য তাঁর কাছে শম্ভু মিত্রের তরল হাসির স্থূল নাটক 'কাঞ্চনরঙ্গ' হল পাকা কমেডি। শিশিরকুমার কেবল 'চিরকুমার সভা' বা 'শেষরক্ষা'ই প্রযোজনা করেন নি, 'যোগাযোগ' উপন্যাসের নাট্যরূপ এবং 'রাজা ও রাণী' নাটকের পরিবর্তিত রূপ 'তপতী'ও তিনি মঞ্চস্থ করেছেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নাট্যরূপও প্রযোজনা করার ইচ্ছে ছিল তাঁর ; কিন্তু তার আগেই তাঁকে শ্রীরঙ্গম থিয়েটার ছাড়তে হয়। তারপরে আর কোন নিয়মিত থিয়েটার পান নি তিনি।

শরৎচন্দ্র কোন মৌল নাটকই লেখেন নি ঠিকই, আর কেন লেখেন নি তাও তিনি নিজেই বলে গেছেন। কিন্তু তাঁর উপন্যাস ও গল্পগুলিতে সাধারণের আবেদনগ্রাহ্য নাট্যগুণ থাকার জন্য সেগুলিকে শিশিরকুমার মঞ্চে পাদ-প্রদীপের সামনে এনেছিলেন। তাতে তাঁর অপরাধ কি ? বিদেশী অবক্ষয়ী নাটকের ছায়াবলম্বনে রচিত নাটক নিয়ে মাতামাতি করার চেয়েও কি সেটা বেশি গর্হিত কাজ ? উপন্যাসের নাট্যরূপ কি আর প্রযোজিত হয় নি বা এখন হচ্ছে না ? এটা দোষের হলে তো বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নাট্যরূপদানও নিন্দনীয়ই বলতে হয়। শরৎচন্দ্র কিন্তু 'পল্লীসমাজ' (রমা), 'দত্তা' (বিজয়া) এবং 'বেনামী' (ষোড়শী) উপন্যাসের নাট্যরূপ নিজেই দিয়েছিলেন। তাঁর নাট্যবোধ না থাকলে তিনি তা করলেন কী করে ! প্রথম বয়সে শরৎচন্দ্র যে একজন সু-অভিনেতা ছিলেন তার খবর রাখেন কি রুদ্রপ্রসাদ ?

তারপর তিনি চরম অবমাননা করেছেন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের পূর্বসূরীদের। লিখেছেন : "ছিল নামজাদা কিছু 'ষ্টার'-এর ব্যক্তিগত ক্ষমতাপ্রদর্শন বা যন্ত্রবিদ

বাংলা থিয়েটারের স্বনামধন্য অভিনেতৃবর্গ ও কলাকুশলীদের সম্বন্ধে এমন তাচ্ছিল্যপূর্ণ অশালীন মন্তব্য দেখে কে না চমকে উঠবেন! গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, অমর দত্ত প্রভৃতিরা তো আছেন ইতিহাসের গর্ভে; এমন কি এ যুগের নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, নরেশ মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, তারাসুন্দরী, প্রভা দেবী, নিভাননী, মলিনা দেবী, সরযূবালা দেবী প্রভৃতির অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্যও এককথায় বরবাদ করে দিয়েছেন রুদ্রপ্রসাদ। যে সতু সেন আলো ও মঞ্চকলায় একটা বিপ্লব এনে দিলেন বাংলা থিয়েটারে তাঁর সেই কৃতিত্বকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেও ছাড়েন নি তিনি। উন্নাসিক রুদ্রপ্রসাদের সঙ্গে মার্কসবাদী শিল্পীমহলের এখানেই পার্থক্য। তাঁরা কিন্তু এঁদেরকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করে থাকেন এবং নাট্যক্ষেত্রে এঁদের অপরিমেয় দানকে স্বীকারও করেন।

রুদ্রপ্রসাদের আরও অজ্ঞানতা প্রকাশ পেয়েছে যেখানে তিনি লিখেছেন: "কাব্যচর্চার পুরোগামী জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়; উপন্যাসের ক্ষেত্রে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশংকর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, সমরেশ বসু প্রমুখ আরও অনেক অনেক প্রতিভাধর লেখক···কেউই নাটক রচনায় হতে দেন নি। কিন্তু এঁদের চেয়ে অনেক কম ক্ষমতার লোকেরা—যেমন বিধায়ক ভট্টাচার্য, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রমুখ আরও অনেকে—নাটক লিখেছিলেন। অর্থাৎ থিয়েটার ক্রমশ সাহিত্যপ্রসাদ বঞ্চিত হচ্ছিল।"

রুদ্রপ্রসাদের এই তুলনা অতুলনীয়! কবি বা ঔপন্যাসিক হলেই যে নাটকও লিখতে পারবেন একথা তাকে কে বললে? সাহিত্যের কোন বিধানে আছে এটা? রুদ্রপ্রসাদ কি ইচ্ছে করলেই কবি হতে পারবেন যদি তার মধ্যে কাব্যশক্তি না থাকে? সৃজনশীল সাহিত্যের স্বীকৃত তিনটি শাখা আছে—নাট্য, কাব্য ও কথা সাহিত্য। এর মধ্যে নাটক সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াসম্পৃক্ত। কাব্য ও কথাসাহিত্য পাঠেই আনন্দ। নাটকের শুধু পাঠ্যগুণ থাকলেই হয় না, তার অভিনয়গুণও থাকা চাই। কবি বা কথাশিল্পীর রচনায় দ্বিতীয় গুণটি না থাকলেও চলে; কিন্তু নাট্যকারের রচনায় দুটি গুণই সমভাবে থাকা চাই।

আলাদা। সুতরাং একটির সঙ্গে অন্যটির গুণগত তুলনা হয় কী করে! নাট্যকার তাঁর শিল্পভাবনাকে রূপ দেবার উপযুক্ত মাধ্যম নাটক মনে করেন বলেই নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কবি এবং কথাশিল্পীও স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাই। অবশ্য ত্রিবিধ রচনায়ই যিনি পারঙ্গম তাঁর কথা আলাদা। কিন্তু কবিতা বা কথাসাহিত্য রচনা করলেই তিনি সাহিত্যিক হবেন, আর শুধু নাটক রচনা করলে তিনি অসাহিত্যিক হয়ে যাবেন, এমন রায় দেবার অধিকার রুদ্রপ্রসাদকে কে দিল? নাট্যসাহিত্য নিয়ে তুলনামূলক বিচার করলেই তার দোষগুণ সম্পর্কে বলা চলে, কাব্য বা কথা সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে নয়। বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রতি প্রবল অবজ্ঞা রুদ্রপ্রসাদের।

অজ্ঞতারও চূড়ান্ত। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় যে 'দুই পুরুষ' ও 'কালিন্দী'র নাট্যরূপদাতা এবং 'বাজী রাও', 'বিংশ শতাব্দী', 'পথের ডাক', 'চকমকি' প্রভৃতি মৌল নাটকের রচয়িতা তাও রুদ্রপ্রসাদের জানা নেই। বনফুলের 'বিদ্যাসাগর', 'মধুসূদন', 'কবয়ঃ', 'শিককাবাব' প্রভৃতি নাটকের কথা কে না জানে! রুদ্রপ্রসাদের 'অগ্র থিয়েটার'-এর জন্মের আগেই যে বুদ্ধদেব বসু 'পশ্চিমের হাওয়া' এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'রামমোহন', 'আগন্তুক' ও 'বিদায়' নাটক লিখেছিলেন তারও খবর তিনি রাখেন কি না সন্দেহ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একটি নাটক লিখেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু তো এক কাব্যনাট্য লিখে সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কারই পান। রুদ্রপ্রসাদের অবগতির জন্যে বলা দরকার যে 'কল্লোল' ও 'কালি কলম' গোষ্ঠীর লেখকদের অনেকেই নাটক লিখে শিশিরবাবুর কাছে আনাগোনা করেছেন। নাটক লেখাই যদি তাঁদের ধাত হত তবে কিছুতেই তা ছাড়তে পারতেন না, তা নিয়েই পড়ে থাকতেন তাঁরা। গল্প বা উপন্যাস লেখার মেজাজ ছিল বলে সেদিকেই তাঁরা গিয়েছিলেন। তাতে ভালই হয়েছে। বাংলা কথাসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তা বলে যারা আজীবন নাট্যসাধনা নিয়ে রইলেন তাঁদের এভাবে হেয় করে দেখাবার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে কি? একেই বলে অনধিকার চর্চা।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গত চার দশকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর বিবর্তনের যাবতীয় ইতিহাস অধ্যয়ন ও অনুধাবন না করে অতীতকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করার প্রয়াস ও চটুল

নির্বোধ কেউ নয়। তবে সব কিছুকেই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা মনের সুস্থতার লক্ষণ নয়। তাতে নৈরাজ্যবাদী চিন্তারই পরিচয় পাওয়া যায়। এ দেশের মাটির উপর দাঁড়িয়েই রুদ্রপ্রসাদ স্বজাতির শিল্পসাহিত্যের বিচার করুন। জাতির ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে তাতে মূল্যায়নের মানদণ্ড খুঁজে পাবেন। শিল্প সাহিত্যও একটা জাতির ইতিহাস ধরেই এগোয়; ছিন্নমূল হয়ে সে বাড়তেও পারে না, বাঁচতেও পারে না। রুদ্রপ্রসাদরা আজ যে থিয়েটার করছেন তারও পেছনে অনেকগুলি সি'ড়ি আছে। তিনি লাথি মারলেই সেগুলি ভাঙবে না বা তাঁর রুদ্ধ ফুৎকারেও সেগুলি হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে না। ইতিহাসই সেগুলিকে ধরে রাখবে। তিনি একটা থিয়েটার গোষ্ঠীর পরিচালক। তাঁর শক্তির প্রতি আস্থাও আছে অনেকের এবং অনুরাগীর সংখ্যাও কম নয়। এই আস্থা ও অনুরাগের মর্যাদা রক্ষার জন্যেই বাংলা থিয়েটার সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশে তাঁর আরও সংযত হওয়া ও সততার পরিচয় দেওয়া দরকার। প্রগলভতা ও বাচালতায় নিজেরই মর্যাদাহানি ও কর্মক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। না জানায় তেমন দোষ নেই; কিন্তু অজ্ঞতাকে বিজ্ঞতা বলে চালাতে গেলে লোকে হাসে। রুদ্রপ্রসাদ বয়ঃকনিষ্ঠ ও আমার স্নেহভাজন। তাঁর প্রতি আমার ঈর্ষা বা দ্বেষ থাকার কথা নয়। তাঁর ভুলগুলি ধরিয়ে দেবার জন্যেই খানিকটা তীব্র ভাষায় হলেও এই আলোচনা করতে বাধ্য হলাম। অবশেষে তাঁকে আমার একটি উপদেশ—গণনাট্য সংঘের ঐতিহ্যকে হেয় না করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেই রয়েছে বাংলা থিয়েটারের ভবিষ্যৎ। এদিকে নজর দিলে তখন আর তাঁকে 'অন্য থিয়েটার' খুঁজতে হবে না। তাঁর কাছে প্রত্যাশা আছে বলেই এই পরামর্শ।

বর্তমান যুগের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন*

সত্য রাস্ত্র

সোভিয়েত থেকে সম্প্রতি ২ খণ্ডে প্রকাশিতকে. এন. ব্রুটেন্টস-এর "বর্তমান যুগে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব" (ইং) একটি মূল্যবান গবেষণামূলক গ্রন্থ। অধ্যাপক ব্রুটেন্টস জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের গতি, প্রকৃতি, চালিকা শক্তি ইত্যাদি বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গীর আলোতে, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান যুগের জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের বিভিন্ন সমস্যার উপর নতুন আলোকপাত করেছেন। বইটির প্রথম খণ্ডে এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য—বিশেষত পুঁজিবাদবিরোধী প্রবণতার বিভিন্ন দিক—এবং এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বিপ্লবী গণতন্ত্রের সামাজিক ভিত্তি ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণ প্রক্রিয়ায় এর অবস্থান ও মতাদর্শ বিভিন্ন অ ধনতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং বইটি আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার দাবী রাখে।

বর্তমান যুগে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ঃ

অধ্যাপক ব্রুটেন্টস জাতীয় মুক্তি বিপ্লবকে বর্তমান যুগের পটভূমিকায় বিচার করেছেন। প্রতিটি যুগই জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্তব্য ও শ্রেণীগত মর্মবস্তুকে প্রভাবিত করে। লেনিন লিখেছেন যে, যে যুগে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব ঘটে, সে যুগের সাধারণ অবস্থা বুঝতে না পারলে, কোন জাতীয় মুক্তি বিপ্লবকে বোঝা সম্ভব নয়।

লেখক লেনিনের এই দৃষ্টিকোণ থেকে ক্লাসিক্যাল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদী যুগে, বা পরবর্তীকালে

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছেন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দেশগুলিতে বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এই সব দেশ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে রয়েছে।

সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের যুগে, অর্থাৎ যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল প্রধান বিষয়, তখন জাতীয় মুক্তি বিপ্লব ছিল সামন্ততন্ত্রবিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব ; এই বিপ্লব ছিল সাধারণ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অঙ্গ। তখন এই বিপ্লব শুধুমাত্র সামাজিক নির্যাতনের একটি রূপকে ধ্বংস করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। সুতরাং ঐযুগে সমস্ত জাতীয় মুক্তি বিপ্লব ছিল **"একটি শোষণমূলক ব্যবস্থা থেকে অন্য এক শোষণমূলক ব্যবস্থায়** উত্তরণের অঙ্গ।" (খণ্ড ১, পৃঃ ৪৮,--বড় হরফ লেখকের)।

কিন্তু বর্তমান যুগে, অর্থাৎ পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে **"এক শোষণমূলক ব্যবস্থা থেকে অ-শোষণমূলক ব্যবস্থায়"** উত্তরণের অঙ্গ (খণ্ড ১, পৃঃ ৪৯,—বড় হরফ লেখকের)। বর্তমান জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের প্রবণতা হচ্ছে সমস্ত ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হওয়া। এটা ঠিক যে রাজনৈতিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে অর্থনৈতিক মুক্তি সাধারণ গণতান্ত্রিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অস্তিত্বের ফলে পুঁজিবাদী পথের চৌহদ্দিতে এই সব গণতান্ত্রিক কর্তব্য সম্পন্ন হবার নয়। সুতরাং, পুঁজিবাদ আজ আর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দেশগুলির সামনে অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যত নয় ; তাদের সামনে আজ এক বিকল্প পথ উপস্থিত হয়েছে। এই পথ হচ্ছে অ-ধনতান্ত্রিক পথ, যা চূড়ান্তভাবে পুঁজিবাদবিরোধী। এই পথকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে সংগ্রাম চলে, তা জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের গতি ও প্রকৃতিকে চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত করে। সুতরাং, এই সংগ্রামে শ্রম-জীবী জনগণ, অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক ও পেটিবুর্জোয়াদের ভূমিকা ক্রমশ প্রধান হয়ে উঠছে। এই সব বিচার করেই এই বিপ্লবকে নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা শ্রমজীবী জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলা হয়।

জাতীয় মুক্তি বিপ্লব প্রধানত তার দ্বিতীয় স্তরে নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক

কোন পথে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবে, এই প্রশ্নটি প্রধান জাতীয় প্রশ্নে পরিণত হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব যদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তা হলে গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসমাপ্ত থেকে যায়। ভারতবর্ষ, তিউনিশিয়া, মরক্কো, লেবানন, কেনিয়া প্রভৃতি দেশে জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে বিপ্লবের নেতৃত্ব থাকায়, এই বিপ্লব বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে আটকে পড়ে। সুতরাং, এই সব দেশে বিপ্লবী গণতন্ত্রের পথে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলি সম্পন্ন করাই বিপ্লবী শক্তিদের লক্ষ্য। অন্যদিকে, চীন, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনামে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সংঘটিত হওয়ার ফলে, এই বিপ্লব জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করে এবং সরাসরি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এর দ্রুত বিকাশ ঘটে। আবার, ঘানা, গিনি, দক্ষিণ ইয়েমেন, তানজানিয়া প্রভৃতি দেশে প্রথম থেকে বিপ্লবের নেতৃত্ব শ্রমজীবী জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের হাতে থাকায় এই বিপ্লব জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করে। মিশর, সিরিয়া, বার্মা, সোমালি প্রভৃতি দেশে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা নেতৃত্বে আসে। ফলে, এই সব দেশেও এদের নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্বোধন ঘটে। বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের ঘটনা প্রমান করে যে বিপ্লবের প্রকৃতি ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এর বিকাশের সম্ভাবনা নির্ভর করে এর নেতৃত্বের শ্রেণীগত চরিত্রের ওপর এবং শ্রমজীবী জনগণ কি ভূমিকা পালন করে তার উপর।

জাতীয় মুক্তি বিপ্লবে শ্রমিক ও কৃষকের ভূমিকা ঃ

লেখক জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের প্রথম স্তরে ও দ্বিতীয় স্তরে শ্রেণী বিন্যাসের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্তর থেকে সামাজিক মুক্তির স্তরে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের উত্তরণকালে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকার মধ্যে পরিবর্তন ঘটে।

ঔপনিবেশিক বিজয়ের সময় এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি সামন্ততান্ত্রিক ও প্রাক-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বিকাশের স্তরে ছিল। এই সব দেশে বিদেশী

কিন্তু সেই সঙ্গে পুরানো সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোও বজায় থাকে। এই বিকৃত সমাজ বিকাশের ফলে আধুনিক শ্রেণীগুলির বিকাশও বিকৃতভাবে ঘটে। পুঁজিবাদী সমাজের মৌল শ্রেণীগুলির জন্মের পাশাপাশি পুরানো সামাজিক শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব থেকে যায়।

তা সত্ত্বেও, কিছু কিছু দেশে (যেমন, ভারতবর্ষ, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া) ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী হিসেবে গড়ে ওঠে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রথম স্তরে জাতীয়গুরুত্বসম্পন্ন রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। সে যাই হোক, এসব দেশে প্রলেতারিয়েতের জন্ম একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা; কারণ প্রলেতারিয়েতের জন্ম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগমনকে ঘোষণা করে। প্রলেতারিয়েত গণতান্ত্রিক বিপ্লবে এক দৃঢ় ও আপসহীন শক্তি। এর লক্ষ্য জাতীয় বুর্জোয়াদের লক্ষ্য থেকে পৃথক। ঔপনিবেশিক শক্তির উপর কোন আংশিক বিজয়ে এবং ঔপনিবেশিক বা সামন্ততান্ত্রিক শোষণের পরিবর্তে পুঁজিবাদী শোষণ প্রতিষ্ঠা করতে এর কোন আগ্রহ নেই। জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্যের সাথে এর শ্রেণীগত লক্ষ্য সঙ্গতিপূর্ণ, কারণ জাতীয় মুক্তি বিপ্লবে গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকে সে বাস্তবে রূপায়িত করতে চায়।

এই সব দেশের শ্রমিকশ্রেণী এমন এক যুগে গড়ে উঠেছে যখন আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। এর বিকাশের প্রাথমিক স্তরেও সে তার নিজস্ব শ্রেণীসংগঠন পেয়েছে—কমিউনিস্ট পার্টি ও বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন। আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ও প্রগতিশীল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সমর্থন সে লাভ করতে পেরেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী যে নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে তা তার বিপ্লবী শক্তির অন্যতম উৎস। দ্বিতীয়ত, এসব দেশে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থান দুর্বল হলেও শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ প্রলেতারিয় উপাদান হিসেবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে প্রভাবিত করছে। এসব দেশে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা আরেকটি প্রলেতারিয় উপাদান হিসেবে কাজ করছে। এসব দেশে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী তার স্বাধীন রাজনৈতিক অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। কোন কোন ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশে যেমন ভিয়েতনাম ও কোরিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি সৃষ্টি হওয়ার ফলেই শ্রমিকশ্রেণী

আত্মপ্রকাশ করেছে। এবং বহু দেশে সংখ্যাগতভাবে ক্ষুদ্র হলেও শ্রমিকশ্রেণী কৃষকের সাথে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে। আবার, শ্রমিকশ্রেণী ভারতবর্ষ, সিরিয়া, আলজেরিয়া, গিনি প্রভৃতি দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ না করলেও এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দ্বন্দ্বগুলি সামাজিক দ্বন্দ্বের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের সাথে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সামাজিক দ্বন্দ্বগুলি আত্মপ্রকাশ করছে। ফলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও সামাজিক মুক্তির সংগ্রামের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। এই দ্বিতীয় স্তরে শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হচ্ছে এবং এর শ্রেণীগত উদ্দেশ্য ও স্বার্থ বিষয়গতভাবে ও ঘনিষ্ঠ-ভাবে জাতীয় মুক্তির কর্তব্যের সাথে জড়িত হয়ে পড়ছে। লেখক মন্তব্য করেছেন যে ভারতবর্ষ, ইরান, সিরিয়া, আলজেরিয়া, সুদান, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে যেখানে প্রলেতারিয়েত জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল, সে সব দেশে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর বড় বড় রাজনৈতিক কার্যক্রম ও উদ্যোগের মধ্য দিয়ে সে প্রমাণ করেছে যে মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব অর্জন করার ক্ষমতা (potential) তার আছে (পৃঃ ২০৩)।

ঔপনিবেশিক দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ব্যাপ্তি প্রধানত নির্ভর করে কৃষকের অংশগ্রহণের উপর। কারণ, কৃষকই হচ্ছে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রধান সামাজিক ভিত্তি। যেখানেই কৃষক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে সেখানেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলন কার্যত দেশব্যাপী চরিত্র অর্জন করেছে। কিন্তু কৃষক যদিও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রধান সামাজিক ভিত্তি, তথাপি কৃষক কখনো স্বাধীন শ্রেণীশক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে না। কৃষকরা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে কোন কোন শ্রেণীকে অনুসরণ করে এবং কৃষকদের **আনুগত্যের** উপরই নির্ভর করে কোন শ্রেণী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে পারবে। কৃষকরা সব সময় জাতীয় বুর্জোয়াকে অনুসরণ করে না। প্রলেতারিয়েত, শহরের বুদ্ধিজীবী, শহরের পেটিবুর্জোয়া শক্তির মিত্র হিসেবেও কৃষকরা কাজ করে এবং রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কৃষকের এই ভূমিকা নির্ভর

শোষণের তীব্রতা, গ্রামাঞ্চলে দ্বন্দ্বসমূহের বিকাশ ও কৃষি সংকটের গভীরতার উপর। গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রভাবও এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। মোট কথা, জাতীয় মুক্তি বিপ্লবে শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রধান শর্ত।

জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা ঃ

জাতীয় মুক্তি বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে লেনিনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক চলছে ; কারণ জাতীয় বুর্জোয়ার প্রতি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপরই এই আন্দোলনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকাকে বড় করে দেখা বা ছোট করে দেখার ফলে, এইসব দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং কমিউনিস্ট আন্দোলনে জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা এখনও বিতর্কিত বিষয়। অধ্যাপক ক্রটেন্টস মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ও বর্তমান জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের অভিজ্ঞতার আলোতে জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা আলোচনা করেছেন। তাঁর এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ তাঁর আলোচনা জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকার উপর নতুন আলোকপাত করেছে।

পরাধীন দেশে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের এক ঐতিহাসিক ন্যায্যতা আছে ; কারণ এই জাতীয়তাবাদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক উপাদান আছে। সুতরাং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রতি এক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করাই প্রতিটি নির্যাতিত দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্তব্য। লেখক দেখিয়েছেন যে নির্যাতিত দেশের জাতীয় বুর্জোয়াদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের দ্বৈতচরিত্র। একদিকে সাম্রাজ্যবাদের সাথে দ্বন্দ্ব ও অন্যদিকে শ্রমজীবী জনগণের সাথে দ্বন্দ্ব তাদের দ্বৈতচরিত্রকে নির্ধারিত করে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্তরে সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমগ্র নির্যাতিত দেশের দ্বন্দ্বটাই ছিল প্রধান দ্বন্দ্ব ; কারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রশ্নটি ছিল প্রধান প্রশ্ন। এর ফলে, অভ্যন্তরীণ সামাজিক দ্বন্দ্ব ছিল অস্পষ্ট। এইসব

শ্রমজীবী জনগণের পার্টি ও অন্যান্য সংগঠনের দুর্বলতাকে জাতীয় বুর্জোয়ারা কাজে লাগাতে পেরেছিল।

এসব দুর্বলতা ও নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও জাতীয় বুর্জোয়ারা বহু ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের **"অন্যতম চালিকা শক্তির"** ভূমিকা পালন করেছিল (পৃঃ ১০১—বড় হরফ লেখকের)। ১৯২০ দশকের প্রথম দিকে কমিন্টার্ন এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে "বুর্জোয়ারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য দেশের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করতে পারে" (পৃঃ ১০১-১০২)। এই প্রসঙ্গে লেখক কমিন্টার্নের ৬ষ্ঠ কংগ্রেসের ঔপনিবেশিক থিসিস নিয়েও আলোচনা করেন। তিনি দেখিয়েছেন যে ৬ষ্ঠ কংগ্রেসে জাতীয় বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেছেন যে কয়েকজন কমিউনিস্ট (বেনেট, রথস্টেইন, নারায়ণ ও আরো অনেকে) যারা বিশ্বাস করতেন যে "সমগ্র জাতীয় বুর্জোয়ারা প্রতিবিপ্লবী ছাড়া কিছুই নয়", তাঁদের এই মত ৬ষ্ঠ কংগ্রেস পরিত্যাগ করেছে। তিনি ৬ষ্ঠ কংগ্রেসের "ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বিপ্লবী আন্দোলন সংক্রান্ত থিসিস" থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে এই থিসিসে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে "সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা অর্জন বুর্জোয়াদের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ" এবং এই ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের সাথে জাতীয় বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্ব মৌলিক চরিত্রের (পৃঃ ১০২)। এই প্রসঙ্গে তিনি এই থিসিসের দুর্বলতার দিকটিও তুলে ধরেছেন। দুর্বলতার দিকটি হচ্ছে যে এই থিসিসে জাতীয় বুর্জোয়াকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয় নি; বরং বলা হয়েছে যে জাতীয় বুর্জোয়ারা বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশে "প্রতিবন্ধক প্রভাব" ফেলে (পৃঃ ১০২-১০৩)। এই সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর কারণ হিসেবে লেখক উল্লেখ করেছেন যে নির্যাতিত দেশের নির্দিষ্ট অবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের তীব্রতাকে ছোট করে দেখা এবং নির্যাতিত দেশের মধ্যে শ্রেণীসংঘাতকে বড় করে দেখাই হচ্ছে এই দৃষ্টিভঙ্গীর উৎস (পৃঃ ১০৪-১০৫)। এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর আরেকটি কারণ হচ্ছে যে রাশিয়ার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ছককে নির্যাতিত দেশের সামাজিক বিকাশের

বুর্জোয়াদের ভূমিকার মধ্যে এক যান্ত্রিক সাদৃশ্য টানা হয়। ফলে রাশিয়ার পরিস্থিতি থেকে নির্যাতিত দেশের অবস্থার মৌলিক পার্থক্য ও এ সব দেশের বিশ্বের নির্দিষ্ট প্রকৃতিকে অস্বীকার বা ছোট করে দেখার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল (পৃঃ ১০৫)। লেখক এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শুরু থেকে, এই বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করার ধারণা বর্তমান ছিল; কারণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল রুশ বিপ্লবের বাস্তবসম্মত পরিপ্রেক্ষিত। কিন্তু নির্যাতিত দেশগুলিতে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা উচ্ছেদ করার সংগ্রামের স্তরে এই পরিপ্রেক্ষিত উপস্থিত হয় নি, যার ফলে এই সব দেশে জাতীয় বুর্জোয়ারা বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পেরেছিল। এই ঘটনাকে ছোট করে দেখা থেকেও এই ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল।

যাইহোক, পরবর্তী কালে, সি পি এস ইউ-র বিংশতিতম কংগ্রেসের দলিলে ও ১৯৫৭, ১৯৬০, ও ১৯৬১ সালের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সম্মেলনের দলিলগুলিতেও এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে সংশোধন করা হয়। এইসব দলিলে জাতীয় বুর্জোয়াদের সম্পর্কে লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব দলিলে জাতীয় বুর্জোয়াদের সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করা হয় তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটা সিদ্ধান্ত করা হয় যে সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হচ্ছে মৌলিক দ্বন্দ্ব; কিন্তু এই দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি ও বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক অবস্থান শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের সাথে এদের বৈর দ্বন্দ্ব কতটা গভীর ও তীব্র, তার উপর নির্ভর করে। ফলে, জাতীয় বুর্জোয়াদের ঔপনিবেশিকতাবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার সামর্থ্য থেকে শুধুমাত্র এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার মধ্যে সীমিত হয় (পৃঃ ১০৬)।

জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের প্রথম স্তরের মত দ্বিতীয় স্তরেও জাতীয় বুর্জোয়ারা দ্বৈতচরিত্রসম্পন্ন। বরং এই দ্বিতীয় স্তরের জাতীয় বুর্জোয়াদের দ্বৈতচরিত্র "অনেক বেশী স্পষ্ট ও গুণগতভাবে নতুন" (পৃঃ ২৫৮)। লেখক মন্তব্য করেছেন যে দ্বিতীয় স্তরে জাতীয় বুর্জোয়াদের গঠন ও সামাজিক কাঠামো এক থাকে না। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে জাতীয় বুর্জোয়াদের সামাজিক শক্তিগুলির মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের

হওয়ার ফলে বুর্জোয়াদের বিভিন্ন অংশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

নীতিগতভাবে সমগ্র জাতীয় বুর্জোয়া, **শ্রেণী** হিসেবে সাধারণ গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর কাজগুলি বিশেষ করে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্পন্ন করতে চায়। কিন্তু **কার্যত**, এর কিছু অংশের মধ্যে আপসের প্রবণতা অনেক বেশী, যদিও এরা বিদেশী পুঁজির সাথে সমান অংশীদারিত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের পথ ত্যাগ করে না।

যাই হোক, শ্রেণী হিসেবে জাতীয় বুর্জোয়ারা একই সামাজিক-অর্থনৈতিক পথ, অর্থাৎ পুঁজিবাদী পথ অনুসরণে একমত; এবং এই দিক থেকে তারা সবাই শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কিন্তু পুঁজিবাদী পথের রূপ সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। "অক্টোট্রিস্ট" বা রক্ষণশীল পুঁজিবাদী পথ গ্রহণ করা হবে, না গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী পথ গ্রহণ করা হবে, এ সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে (পৃঃ ২০০)।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এই নতুন স্তরেও জাতীয় বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীশক্তি। কারণ, জাতীয় পুঁজিবাদের যে বিকাশে সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে ঘটছে তা নয়া-উপনিবেশবাদের সাথে তাদের সংগ্রামের অর্থনৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি করছে। সুতরাং বিষয়গতভাবে জাতীয় পুঁজিবাদেরও এক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিক আছে।

কিন্তু তাই বলে এই স্তরে জাতীয় বুর্জোয়াদের বিপ্লবী শক্তি হিসেবে গণ্য করা যায় না। তাদের প্রবণতা হচ্ছে বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে দূরে থাকা। এ প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্য করেছেন যে "প্রধানত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি হলেও **শ্রেণী হিসেবে জাতীয় বুর্জোয়ারা আর বিপ্লবী শক্তি নয়। দ্বিতীয় স্তরে এরা আর জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের চালিকা শক্তির ভূমিকা পালন করতে পারে না; এই জন্যেই এরা এর নেতা হতে পারে না**"(পৃঃ ২৬১-বড় হরফ লেখকের)। লেখক দেখিয়েছেন যে জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রধান অংশ বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করে এবং বিশ্ব পুঁজিবাদের সাথে মোটামুটি সহযোগিতায় **সংস্কারবাদী বিকাশের** মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সমস্যা সমাধান করতে চায় (এর ফলে অবশ্য বিশ্ব পুঁজিবাদের সাথে এর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে না)। যাই হোক, জাতীয়

বিপ্লবী ও সংস্কারবাদী-আপসকামী, এই দুই প্রবণতায় আরো বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। এই একই কারণে বহু দেশে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা ক্রমশ কমে আসছে (পৃঃ ২৬১)।

সুতরাং, জাতীয় বুর্জোয়াদের এই পরিবর্তনশীল ভূমিকা সম্পর্কে মূল্যায়ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির রণনীতি ও রণকৌশলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

লেখক দেখিয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সম্মেলনের বিভিন্ন দলিলে জাতীয় বুর্জোয়ার এই পরিবর্তনশীল ভূমিকা বিচার করা হয়েছে।

১৯৫৭ সালের দলিলে জাতীয় বুর্জোয়াদের "এক দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তি" হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ১৯৬০ সালের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সম্মেলনের দলিলে জাতীয় বুর্জোয়াদের বিষয়গত-ভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই দলিলে জাতীয় বুর্জোয়াদের দ্বৈতচরিত্রের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দেশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী যে এরা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, এই সম্ভাবনার উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু লেখক দেখিয়েছেন যে ১৯৬০ সালের ঘোষণাপত্রে জাতীয় বুর্জোয়া-দের মূল্যায়ন নিয়ে যে ব্যাখ্যা বিভিন্ন মার্কসবাদী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তাতে, বিশেষ করে, জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রসঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়া-দের প্রগতিশীল শক্তিকে বড় করে দেখানোর প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। "জাতীয় বুর্জোয়াকে ঐ রাষ্ট্রের সামাজিক ভিত্তির অন্যতম প্রয়োজনীয় ও এমন কি সমান উপাদান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে" (পৃঃ ২৬৩)। অর্থাৎ, জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিক, কৃষকের ভূমিকার সাথে জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকাকে এক পর্যায়ে স্থাপন করার প্রবণতা এই সব ব্যাখ্যায় লক্ষ্য করা যায়।

লেখক মন্তব্য করেছেন যে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের বর্তমান স্তরে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ব্যাখ্যার পদ্ধতিবিদ্যাগত উৎস হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়াদের **সাম্রাজ্যবাদবিরোধী** শক্তি ও **বিপ্লবী** শক্তিকে এক করে দেখা ও গুলিয়ে ফেলা (পৃঃ ২৬৩—বড় হরফ লেখকের)। তার ফলে,

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে এই দুই ভূমিকার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য টানা। যদি এই পার্থক্য টানা না হয়, তাহলে জাতীয় বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকাকে বিপ্লবী ভূমিকা বলে ভুল করা হবে। আবার যখন জাতীয় বুর্জোয়া বিপ্লবী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃত হবে, তখন তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিকে অস্বীকার করা ভুল হবে। অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি ও বিপ্লবী শক্তির মধ্যে পার্থক্য না টানলে, জাতীয় বুর্জোয়াদের সম্পর্কে সংশোধনবাদী ও সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতি সৃষ্টি হবে।

১৯৬৯ সালের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মূল দলিলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বর্তমান স্তরে যে সব প্রগতিশীল ও বিপ্লবী সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়া সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই। "একদিকে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও পেটিবুর্জোয়ার দেশপ্রেমিক অংশ সহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার শক্তি, জাতীয় বুর্জোয়াদের কিছু অংশ যারা সাম্রাজ্যবাদের সাথে ক্রমশ আপস করছে" এদের মধ্যে যে সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠছে, সে সম্পর্কে দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে "**শ্রেণী হিসেবে**" জাতীয় বুর্জোয়ারা আর কোন দৃঢ় বিপ্লবী শক্তি নয়" (পৃঃ ২৬৫—বড় হরফ লেখকের)। কিন্তু এই মূল দলিলে জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা বা জাতীয় মুক্তির জন্য ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় বুর্জোয়াদের ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে নি (পৃঃ ২৬৫)।

মধ্যস্তরের জনগণের ভূমিকা ঃ

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে। এই শক্তি শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী শক্তি নয়; এই শক্তি সমাজতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়ায়। এরা সমাজতন্ত্রমুখী পথ অনুসরণে আগ্রহী। এরা বুর্জোয়াশ্রেণী বা প্রলেতারিয় শ্রেণীভুক্ত নয়। এরা মধ্যস্তর-ভুক্ত। শ্রেণীগত দিক থেকে এরা পেটিবুর্জোয়া। এদের শুধুমাত্র পেটি-বুর্জোয়া বললে ভুল হবে; এরা হচ্ছে পেটিবুর্জোয়ার বামপন্থী অংশ। এরাই

অধ্যাপক ক্রটেন্টস তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিপ্লবী গণতন্ত্রের সামাজিক ভিত্তি হিসেবে এদের ভূমিকা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।

যাই হোক, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এই শক্তির অভ্যুদয়ের প্রধান কারণ হচ্ছে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে শ্রমিক ও বুর্জোয়া শ্রেণীর অনুপস্থিতি বা দুর্বল অবস্থান। যে সব দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ অত্যন্ত দুর্বল ও সামন্ততান্ত্রিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক, ও প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের প্রাধান্য রয়েছে, সে সব দেশে কৃষক জনগণ, পেটিবুর্জোয়া, শহরের আধা-প্রলেতারীয় জনগণ, জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরাই হচ্ছে বিপ্লবী গণতন্ত্রের সামাজিক ভিত্তি। বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পার্টিগুলোর কার্যক্রম এই সব শক্তির স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত করে (খণ্ড ২, পৃঃ ১৬)।

যাই হোক, বিপ্লবী গণতন্ত্র কোন স্থিতিশীল শক্তি নয়, বিপ্লবী গণতন্ত্র হচ্ছে **গতিশীল সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি**। এরা শ্রেণীগতভাবে কোন চূড়ান্ত পক্ষ বেছে নেয় না; এদের কর্মপন্থা সমাজের উত্তরণকালীন পর্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য যে এরা সমচরিত্রসম্পন্ন নয়। এরা শ্রেণী-সংগ্রাম চায় না; বরং শ্রেণীসংগ্রাম এড়িয়ে যেতে চায়; বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা কামনা করে। কিন্তু শ্রেণী সহযোগিতা সম্পর্কিত এদের ধারণা বুর্জোয়া সংশোধনবাদী ধারণা থেকে পৃথক। শ্রেণী সহযোগিতা সম্পর্কিত বুর্জোয়া ও সংশোধনবাদী ধারণার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে পুঁজিবাদী পথ বজায় রাখা। সদ্যস্বাধীন দেশে শ্রেণী পৃথকীকরণের অভাব ও সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির পরিপক্কতার অভাব থেকেই এদের সামাজিক সহযোগিতার ধারণার জন্ম। এদের চেতনা দৃঢ় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী ও পুঁজিবাদবিরোধী চেতনায় মণ্ডিত। এদের মতাদর্শের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা প্রকাশ পায় না, প্রকাশ পায় পেটিবুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চেতনা। শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শের দিক থেকে এই মতাদর্শ পশ্চাৎপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু গণতন্ত্রের সংগ্রামে এই মতাদর্শের "ঐতিহাসিকভাবে এক যথার্থ মর্মবস্তু" আছে।

যাইহোক, ঘটনার গতি বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের সেইসব সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে যা পেটিবুর্জোয়া সম্পর্কের সীমানা ছাড়িয়ে সমাজতন্ত্র অভিমুখে যাত্রা করে। এদের মধ্যে অধিকতর প্রগতিশীল অংশ এই সমাজতন্ত্রমুখিনতাকে

প্রবণতা যত সংহত হতে থাকে তত আপেক্ষিকভাবে এদের সামাজিক গুরুত্ব কমে যায়; এবং শ্রমিকশ্রেণী এদের স্থান দখল করে।

মোট কথা, অধ্যাপক ক্রটেন্টস জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম থেকে উত্থিত কতকগুলি বহু-বিতর্কিত সমস্যা নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেছেন। তাঁর বক্তব্য মার্কসবাদী মাত্রকেই এই সমস্যাগুলির গভীরে অনুপ্রবেশ করতে সাহায্য করবে।

বাম গণতান্ত্রিক ঐক্যের শ্রেণীভিত্তি

রণধীর দাশগুপ্ত

জনতা পার্টির সরকারও নয়, কংগ্রেস সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়—একমাত্র তৃতীয় জাতীয় বিকল্প শক্তিই দেশকে সংকটমুক্ত করতে পারে। সেই বিকল্প শক্তি হচ্ছে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে কংগ্রেস সরকার যে ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করেছে তাতে কিছু কিছু ইতিবাচক সাফল্য থাকলেও সেই পথ বিশ্ব ধনতন্ত্রের সংকটের অংশ হিসেবে ভারতেও সংকট সৃষ্টি করেছে। সেই সংকট কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয় সেই সংকটের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি। ধনতন্ত্রের স্বাধীন ভূমিকার বিলোপ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংকের পরিকল্পনা তথা রপ্তানি-মুখীন অর্থনীতির প্রবর্তন, জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব, একচেটিয়া পুঁজি ও বহুজাতিক সংস্থাকে প্রভূত সুবিধা দান ইত্যাদি হল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির শক্তিবৃদ্ধির লক্ষণ কেবল নয়, এ হল প্রতিক্রিয়ার দিকে অর্থনীতির গতি পরিবর্তন। ১৯৫৯ সালে ভারতে একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সম্পদ ২৫০০ কোটি টাকার থেকে বেড়ে ১৯৭৫ সালে ৪৫০০ কোটিতে পরিণত হয়েছে। আবার অন্যদিকে ভারতে শতকরা ৪৬ জন মানুষ দারিদ্র্য সীমানার নীচে বাস করছে। এটা কেবল পুঁজির কেন্দ্রীভবন এবং বাজার সংকোচনকে ইঙ্গিত করছে না; এটা ইঙ্গিত করছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক আজ অর্থ-নৈতিক বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রপ্তানিমুখীন অর্থনীতির উপর প্রাধান্য আরোপকে উন্নয়নশীল দেশের অর্থ-নীতির বিকাশের সহায়ক বলে কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু বাস্তবে এই একমুখী পরিবর্তন স্বাধীন জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। রপ্তানিমুখীন অর্থনীতি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের উপর তৃতীয় বিশ্বের তথা ভারতের অর্থনীতিকে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত বিদ্যার জন্য নির্ভরশীল করে

এটা হচ্ছে নয়া-উপনিবেশবাদেরই কৌশল। এর ফলে শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি হয়, শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী মানুষের উপর আক্রমণও বাড়ে।

কেবল তা নয়, বিশ্ব ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির চৌহদ্দির মধ্যে দেশী ও বিদেশী পুঁজি সম-অংশীদারত্বের তত্ত্ব ও প্রয়োগ দেশকে বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক বাজার ও সাম্রাজ্যবাদী দেশের উপর নির্ভরশীল করে তোলে। ভারতে বিদেশী পুঁজি এবং বহুজাতিক ব্যবসা সংস্থার অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে এই অংশীদারত্ব।

লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণতত্ত্ব হল প্রতিক্রিয়াশীল তুঘলকীতত্ত্ব। বিশ্ব ব্যাংকের জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রাক্তন কংগ্রেস সরকার ভারতে প্রয়োগ করেছেন। দেশের সম্পদ বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে অসামঞ্জস্য দূরীকরণের অজুহাতে এই তত্ত্ব প্রয়োগের নির্মম শিকার হয়েছে মেহনতী মানুষ। উৎপাদনের সামাজীকরণ ও ব্যক্তিগত ভোগ বা উৎপাদনী শক্তির বিকাশের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ যত বাড়ে ততই বেকার শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যাও বাড়ে। প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারে জন্মনিয়ন্ত্রণ এই সমস্যার সমাধান করতে পারে না। অতি-জনসংখ্যা ধনতন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য, কারণ এই বৃদ্ধি একটা আপেক্ষিক বিষয় মাত্র।

ইন্দিরা গান্ধী এই সমস্ত তত্ত্বই ভারতে প্রয়োগ করে ধনতন্ত্রকে সংকটমুক্ত করতে পারেন নি বরং সংকট আরও তীব্র হয়েছে, দেশের অর্থনীতির স্বাধীন বিকাশকে রুদ্ধ করে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক বাজার ও সাম্রাজ্যবাদী দেশের উপর নির্ভরশীল করে তুলেছিলেন। বিশ্ব ব্যাংকের নির্দেশেই ইন্দিরা সরকার প্রতিক্রিয়ার দিকেই অর্থনীতির গতি পরিবর্তন করেছেন। জরুরী অবস্থা ছিল এ সব তত্ত্ব প্রয়োগের একটা স্বৈরতান্ত্রিক আবরণ এবং ধনতন্ত্রকে মেহনতী মানুষের স্বার্থের বিনিময়ে সংকটমুক্ত করার প্রয়াস মাত্র।

জনতা পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর সেই একই ধনতান্ত্রিক পথ আরও নগ্নভাবে অনুসরণ করছে। বিশ্ব ব্যাংক ও আই এম এফ প্রতিষ্ঠান তৃতীয় বিশ্বের জন্য যে নীতি অবলম্বন করেছে, জনতা সরকার ভারতে সেই নীতিকেই কার্যকর করছে। সাম্রাজ্যবাদীরা চায় তাদের উপর নির্ভরশীল ধনতন্ত্রের আরও বিকাশ হোক। বস্তুতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটছে। বিদেশী পুঁজি এবং বহুজাতিক ব্যবসায়ী সংস্থাকে ভারতের অর্থনীতিতে আরও ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ভারতের

যাতে তারা ভারতে অর্থবিনিয়োগ করে। ভারতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিদ্যার প্রয়োগের অজুহাতে দেশী ও বিদেশী পুঁজির সহযোগিতার পথে সমস্ত বাধা অপসারিত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীরা যে অসম বাণিজ্যের নীতি অনুসরণ করছে তার ফলে আমদানীকৃত শিল্পপণ্যের দর যেমন বেশী দিতে হচ্ছে, তেমনই রপ্তানীকৃত কাঁচা মালের দর কমে যাচ্ছে। এমনই ভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সংকটের বোঝা ভারতের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। বলা বাহুল্য, এই ভাবেই ভারত নয়া-উপনিবেশবাদের শিকারে পরিণত হয়েছে। এই কারণে সরকার বহুজাতিক ব্যবসায়ীর স্বার্থে FERA আইনকে শিথিল করছে।

জনতা সরকারের অর্থনৈতিক নীতির মর্মবস্তু হল একচেটিয়া পুঁজি ও বহু-জাতিকে ব্যবসাকে স্বাধীনতা দান এবং বড় বড় ব্যবসায়ী ও মুনাফাখোরদের উপর থেকে সমস্ত বাধা নিষেধ প্রত্যাহার করা। এর নাম হচ্ছে স্বাধীন বাজার বা 'ফ্রি মার্কেট' অর্থনীতি। জনতা সরকার স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশ, রাষ্ট্রীয় সংস্থার সম্প্রসারণ এবং ভূমি সংস্কারের পথ বর্জন করেছেন। কুটির শিল্প এবং পল্লী উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে পাইকারী ব্যবসায়ী, একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী এবং কায়েমী স্বার্থের উপর। এই অজুহাতেই জনতা সরকার ভারী শিল্প বা রাষ্ট্রীয় সংস্থার উপর আর কোন গুরুত্ব আরোপ করছেন না। বরং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গান্ধীবাদী অর্থনীতির নামে নেহরুর ভারী শিল্প ও রাষ্ট্রীয় সংস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করার নীতিকে সংকটের জন্য দায়ী করেছেন। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদকে এবং স্বয়ম্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রয়াসকেই প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদের স্বার্থে আক্রমণ করেছেন।

সামগ্রিকভাবে জনতা সরকারের অর্থনৈতিক নীতি হচ্ছে প্রাক্তন কংগ্রেস সরকারের নীতির নেতিবাচক ও ক্ষতিকারক অধ্যায়কে অনুসরণ করা এবং বিশ্ব-ব্যাংক ও আই. এম. এফ-এর নীতি অনুসারে ভারতের অর্থনীতিকে পরিচালিত করা। এর ফলে সংকট আরও তীব্র ও সামগ্রিক রূপ ধারণ করছে। মুদ্রাস্ফীতি, পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি কৃষিপণ্য ও শিল্পপণ্যের মধ্যে মূল্যের অস্বাভাবিক ব্যবধান, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি, উৎপাদন হ্রাস, উৎপাদন ক্ষমতা প্রয়োগের নিম্নগতি এবং সর্বোপরি [illegible]

তুলেছে। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে টাটা বিড়লা প্রমুখ ২০টি একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী নিজেদের মুনাফা ও সম্পদ শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। এমনইভাবে ২০টি একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী সর্বাধিক মুনাফা করেছে অথচ এরাই দেশে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠায় আর অর্থ বিনিয়োগ করছে না।

শ্রমিকশ্রেণীর উপর নির্মম নির্যাতন, গুলি চালানো এবং পাইকারীভাবে হত্যা করা, তাদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার কেড়ে নেওয়া, বেতন বৃদ্ধি রোধ করা ইত্যাদি এই ধনতান্ত্রিক সংকট থেকে উদ্ভূত। সংকট যখন চরম আকার ধারণ করে তখন পুঁজিপতিরা এবং তাদের সরকার শ্রমিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণ চালায়। প্রধানমন্ত্রী সহ জনতা পার্টির নেতারা ঘোষণা করেছেন যে শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘট করার অধিকার মৌলিক অধিকার নয়। এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে সংকটের বোঝা চাপানো হচ্ছে এবং কায়েমী স্বার্থকে সংহত করা হচ্ছে। শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করা হচ্ছে কেবল দেশী একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে নয়, বিদেশী পুঁজি ও বহুজাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সম্পদের নিরাপত্তার জন্য এবং অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের পথ প্রশস্ত করার জন্য। স্বভাবতই এর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠছে।

অর্থনৈতিক সংকট জনতা পার্টির অনুসৃত নীতির জন্য তীব্র আকার ধারণ করছে এবং জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভও বেড়েই চলেছে। এর ফলে জনতা পার্টির মধ্যে সংকট বাড়ছে। এই সংকট সমাধানের জন্য সাময়িকভাবে যতই জোড়াতালি দেওয়া হোক না কেন তা চক্রাকারে নিত্যনতুন রূপে আবির্ভূত হবে। এটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সংকটের অবশ্যই প্রতিফলন। স্বৈরতন্ত্র কোন একটা পার্টির বৈশিষ্ট্য নয়। ধনতন্ত্র হল স্বৈরতন্ত্রের জননী। অতএব বুর্জোয়া পার্টিতে স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। স্বৈরতন্ত্র হল ধনতন্ত্রের অবক্ষয়ের একটা রূপ। একদিকে যেমন বুর্জোয়া পার্টির মধ্যে স্বৈরতন্ত্র প্রকট হচ্ছে, তেমনই অর্থনৈতিক সংকটজনিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অস্থিতিশীলতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি নয়া-উপনিবেশবাদীদের জন্য পরম সুযোগ।

ভারতের পররাষ্ট্র নীতিতেও এর প্রতিফলন হচ্ছে। পররাষ্ট্র নীতিতে [illegible]

একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর সম্ভব নয়, এমন কি জাতীয় বুর্জোয়ার একাংশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা সত্ত্বেও। কোন বুর্জোয়া পার্টি আর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সংহত করতে পারে না, অগ্রগতি ও বিকাশের পথে পরিচালিত করতে পারে না কারণ ধনতান্ত্রিক পথে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশ সম্ভব নয়।

এই কারণে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিকাশের জন্য জাতীয় ক্ষেত্রে এক বিকল্প শক্তির প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। সেই বিকল্প শক্তি হচ্ছে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য। অর্থাৎ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা এবং প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের দাবির সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। এই সংঘাতই নতুন জাতীয় বিকল্পের ভিত্তি।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মৌলিক পরিবর্তন

বর্তমান জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মধ্যে সীমিত ছিল এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টে সমবেত বিভিন্ন শ্রেণীর লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন। জাতীয় মুক্তি অর্জনই ছিল প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু বর্তমান জাতীয় মুক্তি বিপ্লবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির প্রশ্ন প্রকট আকার ধারণ করেছে যার ফলে প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টের শক্তি-সমূহের মধ্যে ভারসাম্যের পরিবর্তন হয়েছে। এই একই কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধও তীব্রতর হয়ে উঠছে। জাতীয় মুক্তি বিপ্লবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাকে সমাধান করার জন্য যে সংগ্রাম চলেছে তার ফলে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব গুণগতভাবে নতুন স্তরে উন্নীত হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া প্রতিফলিত হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী, উদারনৈতিক পেটিবুর্জোয়া, বিপ্লবী গণতন্ত্র এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক পরিবর্তনের মধ্যে।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বর্তমান স্তরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির প্রশ্নগুলি সমাধান না করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আর অগ্রসর হতে পারে না। অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম হচ্ছে নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম। বহুজাতিক ব্যবসায়ী সংস্থা ও তার

উপনিবেশবাদের হাতিয়ার -তার বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এই সংগ্রাম হল বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা, নিজের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে বৈষম্য দূর করা, উন্নত ও অনুন্নত দেশের সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট ব্যবধান সংকুচিত করা এবং উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের উপর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগতবিদ্যার জন্য নির্ভরশীলতার পরিবর্তে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের সংগ্রাম করা। বিপ্লবের বর্তমান স্তরে সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদকে লঘু করে দেখলে তার পরিণাম হবে মারাত্মক। এখনও সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রধান শত্রু।

আর সামাজিক মুক্তির সংগ্রাম হল কৃষকের স্বার্থে সামন্ততন্ত্রের বিলোপ এবং ভূমি সংস্কারের সংগ্রাম যা কৃষকদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করবে।

বর্তমান বিপ্লবের প্রক্রিয়া একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে যেমন পরিচালিত হচ্ছে, তেমনই ধনতন্ত্রবিরোধী প্রবণতাও বাড়ছে। এই বিপ্লবে সমস্ত প্রকার শোষণের বিরুদ্ধে সমস্ত নিপীড়িত মানুষ অংশগ্রহণ করছে বলে এই বিপ্লব সমাজতন্ত্রমুখীন। এই কারণে বিপ্লবের সমাজতন্ত্রমুখীন চরিত্র ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিভাত হচ্ছে।

নতুন ঐতিহাসিক যুগে অর্থাৎ মানবসমাজের ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব মূলত ব্যাপ্তির দিক থেকে, পরিচালক শক্তি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যের দিক থেকে অতীতের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব হল নতুন ও আরও প্রগতিশীল ধরনের বিপ্লব—যে বিপ্লবের গন্তব্যস্থল হচ্ছে সমাজতন্ত্র। অতএব জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে যে গণতন্ত্রের উদ্বোধন হবে সেই গণতন্ত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নায়ক হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণী এবং সেই গণতন্ত্রের শ্রেণীভিত্তি মূলত বুর্জোয়া শ্রেণীই। আর জাতীয় গণতন্ত্রের বা বিপ্লবী গণতন্ত্রের নায়ক হল শোষিতশ্রেণী অর্থাৎ শ্রমিক-শ্রেণী, কৃষকসমাজ ও মধ্যবিত্ত। মূলত এই গণতন্ত্র হচ্ছে কৃষকসমাজের কারণ এরাই হচ্ছে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। কেবল তা নয়, এই গণতন্ত্র কৃষক-সমাজকে সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্তি দিয়ে সমাজে নতুন গণতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করবে। এক কথায় বলতে গেলে এই গণতন্ত্র

শোষণভিত্তিক গণতন্ত্র। এর ভিত্তি হচ্ছে ধনতন্ত্র যার নিয়মে একচেটিয়া পুঁজিবাদের উদ্ভব হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ছে এবং গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের পরিধির মধ্যে ধনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ ঘটছে। আর জাতীয় গণতন্ত্র বা বিপ্লবী গণতন্ত্র এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিপ্লব কেবল সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র এবং একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করবে না, এই বিপ্লবী প্রক্রিয়া বহুলাংশে ধনতন্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ডও প্রবর্তন করবে। এই প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে অ-ধনতান্ত্রিক পথ, এটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক পথের বিকল্প। এর প্রত্যেকটা স্তরেই শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। অ-ধনতান্ত্রিক পথ এই বৈচিত্র্যময় প্রক্রিয়াসমূহের সমষ্টি। এর শ্রেণীভিত্তি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের ঐক্য বা মেহনতী মানুষের ঐক্য।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী বুর্জোয়াদের এবং নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করা, জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করা, ক্রমেই বিদেশী পুঁজিকে বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে সম্প্রসারণ করা, একচেটিয়া পুঁজিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা, কৃষকের স্বার্থে ভূমি সংস্কার করা, বহু কাঠামো বিশিষ্ট অর্থনীতির মধ্যে উৎপাদনী শক্তির বিকাশ সাধন প্রভৃতি বিভিন্ন অন্তর্বর্তী স্তরের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে উপনীত হবার জন্য বস্তুগত ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। অতএব জাতীয় মুক্তি বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণ-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত হবে, তেমনই পরিচালিত হবে গঠনমূলক লক্ষ্য নিয়েও। উভয় কাজের সমন্বয় হচ্ছে এর বৈশিষ্ট্য। সামাজিক সম্পর্কের প্রত্যেকটা দিকের পরিবর্তন সাধন করাই এই বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূত। মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনের দিকে জাতীয় গণ-তান্ত্রিক বিপ্লব ধাবিত হচ্ছে। কেবল বুর্জোয়া উৎপাদন সম্পর্ক নয়, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চরম উদ্দেশ্য। এই পথ ধনতন্ত্র এবং সমস্ত শোষণব্যবস্থার ক্রমবিলুপ্তির পথ। এই বিলুপ্তির পথ হল সংগ্রামের পথ এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সমন্বয়ের পথ। এই পথে শ্রমিকশ্রেণী, মেহনতী কৃষক এবং বিপ্লবী গণতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের দৃঢ় ঐক্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে সমাজতন্ত্রের উপাদানকে ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী করার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যায়। এই প্রক্রিয়া

বিপ্লবের বিজয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের প্রারম্ভিক প্রস্তুতিপর্ব মাত্র। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের নতুন ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করবে। স্বভাবত এই প্রক্রিয়া থেকে যে সরকারের উদ্ভব হবে তা' হল জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার। অতএব রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের শ্রেণী সমাবেশ জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ হয় যে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও তারা আর বিপ্লবী শক্তি নয়, বিপ্লবের পরিচালক শক্তিও নয়। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে বুর্জোয়ারা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল বলেই তারা বিপ্লবী ছিল। কিন্তু ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করলে বিপ্লবী হওয়া যায় না। অতএব বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে যে অংশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আগ্রহী সেই অংশ তাদের দোদুল্যমানতা নিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকারে অংশীদার হবে কিন্তু একই সরকারে অবস্থানের জন্য তাদের ভূমিকা আর শ্রমিক কৃষকের ভূমিকা এক হতে পারে না। কারণ এই সরকার হচ্ছে আসলে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের সরকার।

অতএব কোন বুর্জোয়াশ্রেণীর পার্টির সঙ্গে ঐক্যের ভিত্তিতে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো অসম্ভব। একমাত্র বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য বুর্জোয়া শক্তির বিকল্প হিসেবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে পরিচালনা করতে পারে। এটা হচ্ছে সংগ্রামের হাতিয়ার, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিকল্প শক্তি। এই হল নতুন ধরনের গণতন্ত্রের বাহন। এই সংগ্রামী ঐক্যই জাতীয় গণতান্ত্রিক ঐক্যকে আরও গভীর করতে পারে। আর এর ভিত্তি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের ঐক্য।

কংগ্রেসের মধ্যে, এমনকি জনতা পার্টির মধ্যেও গণতান্ত্রিক শক্তি আছে। কিন্তু এসব বুর্জোয়া সংগঠনে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের চৌহদ্দির মধ্যে অর্থাৎ কংগ্রেসের মধ্যে যখনই কিছুটা পরিমাণ বামপন্থার উন্মেষ হয়েছে বা যখনই এরা নেতৃত্বের সমালোচনা করে বামপন্থার দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে তখনই নেতৃত্ব নানাভাবে

অঙ্কুরেই বিনাশ করেছে। এর ফলে কোনদিনই কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী শক্তি সংগঠিত হতে পারে নি। অথচ এসব শক্তি বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের শক্তি। তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম ও মতাদর্শগত সংগ্রাম ব্যতীত এদের বুর্জোয়া মতাদর্শ থেকে মুক্ত করা কঠিন। বুর্জোয়া পার্টির সংকট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক গণসংগ্রাম সংগঠিত করার মাধ্যমে এই শক্তি বুর্জোয়া সংগঠনের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হতে পারে। বিপ্লবী প্রক্রিয়ার শক্তির উপরই এদের পরিবর্তন নির্ভর করছে। সি পি আই এবং সি পি আই (এম)-এর ঐক্যই এই প্রক্রিয়া সৃষ্টির সহায়ক শক্তি।

সি, পি, আই এবং সি, পি, আই (এম)-এর ঐক্যের প্রশ্ন

কংগ্রেস ও জনতা পার্টির তৃতীয় বিকল্প বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য গঠনে সি পি আই এবং সি পি আই (এম)-এর ঐক্য হচ্ছে এক অপরিহার্য উপাদান। উভয় পার্টি তাদের পার্টি কংগ্রেসে কোন রকম শর্ত আরোপ না করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই দুই পার্টির ঐক্য সহজ নয়। দীর্ঘকাল যাবৎ এই দুই পার্টির মধ্যে বৈরীভাব এই ঐক্যের অন্তরায় হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে কোন বামপন্থী পার্টি বা কমিউনিস্ট পার্টি এককভাবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্যা সমাধান করতে পারে না। উপরন্তু কংগ্রেস হোক, আর জনতা পার্টি হোক—যে কোন বুর্জোয়া পার্টির সঙ্গে সর্বাত্মক ঐক্য বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের পক্ষে বাধা। কারণ বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মূল ভিত্তি শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐক্য নয়, মূলত এবং প্রধানত শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকশ্রেণীর ঐক্য। শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের ঐক্যকে বর্জন করে প্রকৃত বাম ঐক্য হয় না, বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যও সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে লেনিন বলেছেন—"There is no doubt that it is precisely in this sense, on general principles, that the liquidators repudiate the "Left Block" policy. And there is just as little doubt that their repudiation of the Left Block policy constitutes treason to the cause of democracy. Not a single bourgeois liberation

and instances of "Left Block" tactics, and wherever these movements triumphed, in all such cases, it was always as a result of these tactics, a result of the struggle being directed along these lines inspite of the vacillations and treachery of the liberals. It was the "Left Block" tactics—the alliance between the urban "plebs" (= the modern proletariat) and the democratic peasantry that lent sweep and force to the English revolution in the seventeenth century and the French revolution in the eighteenth century. Marx and Engels drew attention to this fact on many occasions, not only in 1848 but much later as well." (Lenin : Col. Works Vol 17, Page 458)

অর্থাৎ, "এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে সংক্ষেপে এই অর্থেই, অবলোপবাদীরা, সাধারণ আদর্শ হিসেবে, 'বাম মোর্চা'র নীতিকে নস্যাৎ করে। এবং এ ব্যাপারেও সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে বাম মোর্চার নীতিকে তাদের নস্যাৎ করার মানে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা। 'সমস্ত জুড়ে এমন একটাও বুর্জোয়া মুক্তি আন্দোলন নেই যেখানে 'বাম মোর্চা'র রণকৌশলের দৃষ্টান্ত নেই, এবং যেখানেই এই আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই, তা হয়েছে সর্বদাই এই রণকৌশলের জন্যই, উদারনৈতিকদের সর্বপ্রকার দোদুল্যমানতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও এই পন্থায় সংগ্রাম চালানোর ফলেই। একমাত্র 'বাম মোর্চা'র রণকৌশল—শহুরে জনতা (আধুনিক প্রলেতারিয়েত) এবং গণতন্ত্রী কৃষকের মৈত্রীই সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের বিপ্লব এবং অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিপ্লবকে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি ও সামর্থ জুগিয়েছিল। মার্কস ও এঙ্গেলস শুধুমাত্র ১৮৪৮ এই নয়, তার অনেক পরেও বারংবার এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। (লেনিন, রচনাবলী, ১৭শ খণ্ড, পৃঃ ৪১৮)।"

লেনিন আরও বলেছেন—"In heaping abuse upon Left block tactics, the liquidators try by their words to drown the inescapable fundamental issue of the principle that a "Left Block" policy is obligatory for every workers' party in every bourgeois

উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ পুঁজিবাদী সংকট এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি বা জাতীয় বিকল্পের অনুপস্থিতিতে এই সংগ্রামগুলি হয় স্বতঃস্ফূর্ত ও অসংগঠিত। শাসকশ্রেণী এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে প্রচণ্ড দমননীতি প্রয়োগ করে নিজেদের দলীয় সংকটকে সমাধান করতে বৃথা চেষ্টা করে। বৃথা হলেও এই প্রয়াস তাদের শ্রেণীধর্ম।

এই পরিস্থিতিতে মেহনতী মানুষ চায় একটা জাতীয় বিকল্প। এটা কেবল তত্ত্ব নয়—এ হল জীবনের অভিজ্ঞতা। এই সত্য অত্যন্ত নির্মম। অতএব সি পি আই এবং সি পি এম-এর ঐক্যের ভূমিকা দেশের ও জনগণের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন সংকটজনক পরিস্থিতিতেও সি পি এম নেতৃত্ব সংকীর্ণতাবাদী ও ঐক্যবিরোধী নীতি অনুসরণ করে চলেছেন এবং জনতা পার্টির সরকারকে সমর্থন করছেন এবং মেহনতী মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলি—যা প্রতিদিন অসংখ্য গণসংগ্রাম ও প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে—তা' অবহেলা করছেন। গণতন্ত্র রক্ষা এবং স্বৈরতন্ত্রের বিরোধিতা করার জন্য সি পি এম জনতা পার্টিকে সমর্থন করার যে নীতি অবলম্বন করেছেন তা' নিঃসন্দেহে ভুল। কারণ এই গণতন্ত্র হচ্ছে বুর্জোয়াগণতন্ত্র, যেখানে শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী মানুষের উপর নিপীড়ন করাই এর ধর্ম। এর থেকে গড়ে ওঠে স্বৈরতন্ত্র, শ্রমিকশ্রেণীকে বিভক্ত করার নীতি এবং কমিউনিস্ট বিদ্বেষ। অতএব সি পি এম যে যুক্তির দ্বারা জনতা পার্টিকে সমর্থন করছে সেই যুক্তি হল শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর ঐক্যের পক্ষে। এই যুক্তি রাজনীতিগতভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া শ্রেণীর লেজুড়ে পরিণত করে।

প্রকৃত বন্ধু নির্বাচনে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচ্যুতিই এর অন্যতম কারণ। শ্রমিকশ্রেণীর বোনাস কেটে বা শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা হরণ করে কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকার যেমন কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধু হতে পারে না, তেমনই পত্তনগর, বাইলাডিলা, আগ্রা ইত্যাদি স্থানে শ্রমিকদের গুলি করে হত্যা করলে জনতা পার্টিও সি পি এম-এর বন্ধু হতে পারে না। কারণ বুর্জোয়া পার্টি বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষেই কাজ করে, শাসনযন্ত্র পরিচালনা করে—বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপক্ষে এরা যায় না। এটা হল তাদের শ্রেণীধর্ম। বুর্জোয়া পার্টির নীতি ও পরিকল্পনা বুর্জোয়াদের শ্রেণীস্বার্থের দ্বারাই পরিচালিত হয়।

ভূমিকা নিঃশেষিত হয়েছে, বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কাজ তারা আর সমাধান করতে পারে না, তখন কী করে তারা কমিউনিস্ট পার্টি ও সি পি এম-এর প্রকৃত মিত্র হতে পারে? জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকার সঠিক মূল্যায়নে ব্যর্থতা সি পি আই এবং সি পি এম-এর মধ্যে ঐক্যের পথে অন্তরায় হয়েছে।

এর প্রতিফলন শ্রমিক, কৃষক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। যদিও গণআন্দোলনের ঐক্য বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের সহায়ক শক্তি, সি পি আই ও সি পি এম এর মধ্যে দূরত্ব হ্রাস করে কিন্তু এ সব গণ-সংগ্রামকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে সংযুক্ত না করলে এ সব সংগ্রাম প্রকৃত-পক্ষে অর্থনীতিবাদের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে না। আদর্শগত দিক থেকে এসব সংগ্রাম বুর্জোয়া মতাদর্শের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। গণসংগ্রামগুলিকে জাতীয় স্তরে উন্নীত করা এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এদের মুখ্য শক্তিতে পরিণত করাই এবং বুর্জোয়াদের শাসন ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করার জন্য চেতনা সৃষ্টির কাজ সি পি আই ও সি পি এম ছাড়া আর কে করতে পারে? শ্রমিক আন্দোলনে কৃষকের সমর্থন আদায় করা এবং কৃষক আন্দোলনে শ্রমিকদের মধ্যে আগ্রহ, উৎসাহ, উদ্দীপনা সৃষ্টি করা ও সমর্থন আদায় করা বা এক কথায় উভয় শ্রেণীকে পরস্পরের সহযোগী করে গড়ে তোলা সি পি আই ও সি পি এম-এর যৌথ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কীভাবে হতে পারে? এই দুটি পার্টির ঐক্য সারা ভারতে বামপন্থী শক্তি সমূহের মধ্যে আস্থা ও ভরসা সৃষ্টি করবে এবং এক সংগ্রামী প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে যাতে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি নিজেদের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে এই প্রবাহের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করবে। ধনতান্ত্রিক পথের তীব্র সংকট জাতীয় বিপ্লবের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ভূমিকা

বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ সোপান। বাম-গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট থেকে শুরু করে সমাজতন্ত্র নির্মাণ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করতে হবে। যেহেতু এই বিপ্লবী প্রবাহে বহু ধরনের মানুষ, শ্রেণী ও গ্রুপ এসে হাজির হবে, নানা মতবাদ ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণার সমাবেশ হবে এবং এই গোটা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ভারতের মত বহুকাঠামো বিশিষ্ট অর্থনীতিতে, প্রধানত কৃষক অধ্যুষিত দেশে বিভিন্ন পার্টি পরিচালিত কৃষক সংগঠনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করা বা কৃষক-সমাজভিত্তিক শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে রাজনৈতিক যুক্তমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করা এবং ক্রমশ দলগুলির দিকে সংগ্রামকে পরিচালিত করা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। [illegible] সম্ভব হতে পারে আম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমে।

[illegible]

বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম, সর্বপ্রকার বুর্জোয়া নীতিকে পরাস্ত করার লড়াই এবং সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে [illegible] শিবিরের সঙ্গে ঐক্যের সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টিকে সর্বদা [illegible] থাকতে হবে। একমাত্র এই পথে কমিউনিস্ট পার্টি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে।

ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র

পরিমলচন্দ্র ঘোষ

১৯৭৭ সালে ভারতের কেন্দ্র এবং রাজ্যের আইনসভার নির্বাচনে গণতন্ত্রই প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজও জনতা সরকারের সার্থকতা ও স্থায়িত্বের সমর্থনে ও দুই কংগ্রেসের সঙ্গে জনতা দলের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জনতা দলের সপক্ষে এটাই প্রধান যুক্তি যে সম্ভাব্য কংগ্রেসী অর্থাৎ ইন্দিরা কংগ্রেসী স্বৈরতন্ত্রকে রুখতে হলে জনতা সরকারকেই টিকিয়ে রাখতে হবে। মোরারজী দেশাই জনতা দল এবং জনতা সংসদীয় দলের মধ্যে মতভেদ এবং বর্তমান সংকটকে উপলক্ষ করে বলেছেন, জনতার "পাঁচটি দলের কোনটিই স্বৈরতন্ত্র ফিরে আসুক তা চান না। সুতরাং স্বৈরতন্ত্র রুখতে সকলে মিলে কাজ করতে হবে।"

বিগত নির্বাচনে এবং পরবর্তীকালে জনতা দল ও জনতা সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখার সমর্থনে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিরও এটাই প্রধান যুক্তি যে জনতা দল ও সরকার গণতন্ত্র সংরক্ষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এ সকল যুক্তির পিছনে সারবত্তা যাই থাক না কেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এঁরা সকলেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কথাই বলছেন। সেদিক থেকেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। ইন্দিরা গান্ধী কি ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে কোন এক ধরনের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, না এ দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রেরই নানা আইনগত ফাঁকের সুযোগ নিয়ে শাসনকার্যে স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। শাসনব্যবস্থা এবং শাসনপদ্ধতি, এই দুটো ধারণার পার্থক্যটা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। হয় গণতন্ত্র নয় স্বৈরতন্ত্র বা কোন একপ্রকার ফ্যাসিবাদ, এইভাবে চিন্তা করলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নমনীয়তা সম্বন্ধে ধারণা হয় না। বুর্জোয়া গণতন্ত্র যে তার ফর্ম বজায় রেখেই উনবিংশ শতাব্দীর বৃটেনের উদারনৈতিক শাসন থেকে সুরু করে ইন্দিরা গান্ধীর পদ্ধতিতে পরিচালিত শাসন পর্যন্ত হতে পারে, এটা জানা না

কিভাবে এ গণতন্ত্র পরিবর্তিত হয় সেটাও বোঝা যায় না। ইন্দিরার পর গণতন্ত্রের তথাকথিত ত্রাণকর্তা জনতা দলের আমলে হরিজন-শ্রমিক কৃষকের উপর দমনপীড়নের সম্ভাবনারও তত্ত্বগত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। আসল কথা, পাশ্চমী সংসদীয় গণতন্ত্র হল বুর্জোয়ার শ্রেণীস্বার্থে উদ্ভূত শাসনব্যবস্থা। বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রয়োজন অনুযায়ী তার শাসনপদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটে।

বিষয়গত অবস্থা অনুযায়ী সংসদীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতিতে তারতম্য দেখা যায়। পশ্চিমী পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে পরিচিত। বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি এ শাসনব্যবস্থায় বর্তমান। মমাজতন্ত্রী এ গণতন্ত্রের প্রতি নেতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে না। প্রথমত, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই দীর্ঘকালীন সংগ্রামে অর্জিত শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের অধিকার কমবেশী মাত্রায় থেকে যায়। এ অধিকারের উপর আক্রমণ এলে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য প্রগতিশীল দলগুলি তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে শ্রমজীবী মানুষের গণতন্ত্রে রূপান্তরিত করতে হলে, কি ধরনের সংস্কারের মধ্য দিয়ে সে-পথে অগ্রসর হতে হবে সেটা বুঝতে হলে বর্তমান সংসদীয় শাসনব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করা দরকার। এটা ধরে নেওয়া যায় যে, সমাজতন্ত্রের পথে রাজনীতিক বিপ্লব যেভাবেই আসুক বুর্জোয়া সংসদীয় শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে নয়া জমানার উপযোগী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে নেবার সুযোগ বা প্রয়োজন হবে না এটাই সম্ভব। এ-সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিতে জনগণতন্ত্রের উদ্ভবের ইতিহাসে ঐসব দেশে পূর্বেকার সংসদীয় শাসনব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেওয়া হয় নি। অপরদিকে ইওরো-কমিউনিজমের তত্ত্বে, কিংবা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে গণতন্ত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্যও সাধারণভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের মৌল প্রকৃতি এবং প্রতিটি বিশেষ দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের বিশেষ রূপ উদ্ঘাটন করা দরকার। পুঁজিবাদী সমাজের সঙ্গে কোন এক ধরনের সংসদীয় গণতন্ত্রের সম্মিলন একটা স্থানীয় ব্যাপার কিংবা ক্ষণস্থায়ী ঘটনা নয়। পুঁজিবাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলেই এ দুইয়ের সম্মিলন একটা নিয়ম হিসাবেই সমাজে দেখা দিয়েছে। এখানে বলে রাখা

আমরা যুক্তরাজ্য গণতন্ত্রের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে একটা ঐক্যের সন্ধান পাই। ফ্রান্সের সংসদীয় শাসন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি শাসনের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সঙ্গে তুলনায় এ দুই ধরনের শাসনব্যবস্থারই প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যুক্তরাষ্ট্র ছোট বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাসন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এক প্রকার দুই দলীয় শাসন হয়ে থাকে।

শিল্পগত অর্থনীতির সঙ্গে শাসনব্যবস্থার যে সম্পর্কের বিষয় মার্ক্সীয় তত্ত্বে উল্লেখ আছে তার ভিত্তিতে আমরা পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের সঙ্গে পৃথিবীর প্রাচীনতম সংসদীয় গণতন্ত্র বৃটেনের তুলনা করতে পারি। যদিও বৃটেনের সংসদীয় গণতন্ত্রের অনুকরণে ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের যে মূল এবং তার ঐতিহাসিক অনিবার্যতা এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে গণতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা তার অনুরূপ নয়। ইংল্যান্ড ও ফরাসী দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল বুর্জোয়াদের অভ্যুত্থানের মূলে। ঐ সকল দেশের পুঁজিবাদী বাষ্পশক্তির উৎকর্ষ ও তার প্রয়োজনই সংসদীয় প্রজাতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছে। এই শাসনব্যবস্থার মূলে অর্থনীতিক সম্পর্ক অর্থাৎ পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে রাজনীতিক দলসমূহ সংসদীয় গণতন্ত্রে স্বীকৃত নীতিমালার মধ্যে এবং সাধারণতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক উদারনীতির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থেকে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্য বুর্জোয়া শ্রেণীর নিকট দুই দলীয় শাসনের মতন। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ্য। আমাদের পরবর্তী কালের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদলের ভারতের সমাজের শ্রেণীচরিত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত সেখানকার রাজনীতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণের ভ্রান্তির মূলে। এই ভ্রান্ত মতের জন্যই তাঁরা ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারেন নি।

তাদের অভিমত। কিন্তু লর্ড ব্যালফুর সঠিকভাবেই ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসকে ভিত্তি করে দেখিয়েছেন যে বিরোধী দল হবে একটা নিরাপদ বিকল্প দল। "এই বিরোধী দল শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না থাকলেও রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের আনুগত্য আছে এবং দেশের রাজনীতিক ঐতিহ্যের উপর আঘাত না করে তারা সরকার গঠন করতে প্রস্তুত।" সমাজতান্ত্রিক দেশে বিরোধী দলের অনস্তিত্ব আলোচনায় অবশ্য তাঁরা "নিরাপদ বিকল্পের" ধারণাটা মনে রাখেন না। বলাবাহুল্য, নিরাপদ বিকল্পের কথা সংবিধানে লিখিত থাকে না, সেটা ব্যবহারিক রাজনীতিতে ধরা পড়ে।

যাই হোক, সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থার স্বাভাবিক রূপ সেখানেই সম্ভব যেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে দেশের সমৃদ্ধি ঘটেছে এবং জনসাধারণ নিজেদের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রদর্শন না করলেও সমাজবিপ্লবের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে নি। ইওরোপে ফ্যাসিবাদের ইতিহাস দেখিয়েছে যে, বৈপ্লবিক সম্ভাবনার মুখে বুর্জোয়া শ্রেণী গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক উদারতা বিসর্জন দিতে দ্বিধা করে না।

যে-বিষয়গত অবস্থায় পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সংসদীয় গণতন্ত্র উৎকর্ষ লাভ করেছিল ভারতের বর্তমান অবস্থা তার অনুরূপ নয়। সাম্রাজ্যবাদ কবলিত ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে নি। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের যুগে, যখন একটা পশ্চাৎপদ দেশের পক্ষে পুঁজিবাদের পথে অগ্রগতি সম্ভব নয়। স্বাধীনতার ত্রিশ বৎসরের মধ্যে পুঁজিবাদের পথ ভারতবর্ষকে এক আর্থনীতিক সংকটের আবর্তে নিয়ে ফেলেছে। জাতীয় অর্থনীতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে এদেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা যাচ্ছে না। অপর-দিকে বিশ্বের শক্তিবিন্যাস বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক জগতের অস্তিত্ব এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে সমাজতান্ত্রিক বিকল্পকে তুলে ধরেছে। স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্নেই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য জন-চেতনায় জাগ্রত হয়েছে।

বর্তমানের আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় অবস্থাই ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একথা বলা যায় না যে, এদেশের সকল মানুষ বিদ্যমান সমাজ সম্বন্ধে অভিন্ন মত পোষণ করেন। ইংল্যাণ্ডের অনুরূপ এমন একটা দ্বই দলীয় পদ্ধতি এখানে প্রবর্তন করা সম্ভব হয়

বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করতে হতে পারে। কংগ্রেসের একচেটিয়া শাসন এদেশের এবং বিদেশের বুর্জোয়া তাত্ত্বিকের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করে নি, কারণ কংগ্রেসের কোন "নিরাপদ বিকল্প" ছিল না। বিরোধী দল এদেশে বরাবরই আছে; বহু রাজনীতিক দল আছে যারা আইনসভায় এবং তার বাইরে শাসকদলের বিরোধিতা করে এসেছে, কিন্তু তাদের কোন দল বা দলের সমষ্টি বিকল্প সরকার গঠনের বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি করে নি। আজ পর্যন্ত কংগ্রেস ও জনতা দলের প্রকৃত বিরোধিতার সম্ভাবনা এসেছে বামপন্থী দল-গুলির কাছ থেকে; কংগ্রেস বা জনতার মূলনীতিগুলির প্রকৃত বিকল্প হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক নীতি। তাই ভারতবর্ষে যে এখন পর্যন্ত বৃটেনের মত দুই দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নি তাই নয়, হবার কোন সম্ভাবনাও নেই। দুই দলীয় ব্যবস্থার পক্ষে বুর্জোয়া রাজনীতিক ও তাত্ত্বিকেরা যত ওকালতি করুক ভারতবর্ষের মত একটা অস্থিতিশীল বৈপ্লবিক সম্ভাবনাময় সমাজে সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য দুই দলীয় শাসনপদ্ধতি চালু হতে পারে না। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে যেটা চালু আছে সেটা বৃটিশ মডেলের সংসদীয় গণতন্ত্র নয়, ভারতীয় মডেলের পার্লামেন্টীয় শাসন। দ্বিতীয় ব্যবস্থার অস্তিত্বই ভারতীয় মডেলের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। নিবর্তনমূলক আটক আইন বা তার পরবর্তী সংস্করণ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংরক্ষণ আইনও ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় গণতন্ত্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে সরকারী নীতি পরিবর্তনের চেষ্টা। সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী সরকার নির্বাচিত হলে শাসকদলকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিজ নীতি বাস্তবায়নের সুযোগ দিতে হবে। এ শর্ত এদেশের জনগণ কোনদিনই মেনে নেয় নি। এ দেশে সরকার যেমন গণতন্ত্রের রীতি-বিরুদ্ধ উপায়ে বিরোধিতার মোকাবেলা করেন তেমনি শ্রমিক, কৃষক জন-সাধারণও অনেক ক্ষেত্রেই সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিবিরুদ্ধ উপায়েই সরকারী নীতি পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্রের তথাকথিত উদারতা ভারতের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। শ্রেণী-সংগ্রাম বৃটেনের সংসদীয় গণতন্ত্রের বাস্তব রাজনীতিতে প্রকট হয়ে উঠতে পারে না, কিন্তু ভারতে কোন দিনই সেটা গণতান্ত্রিকতার আবরণে ঢাকা পড়ে নি।

মোট কথা, ভারতের বিষয়গত অবস্থা এদেশে সমাজবিপ্লবকে প্রত্যক্ষ এবং

শ্রেণীর দুই দল, কংগ্রেস এবং জনতা নয়, যদিও সাময়িকভাবে এবং বিশেষ করে বামপন্থী দলগুলির অনৈক্যের দরুণ সেটাই প্রতীয়মান হতে পারে। এদেশের বিষয়গত অবস্থায় জনগণের মধ্যে অনিবার্যভাবেই সমাজবিপ্লবের চেতনা দেখা দিয়েছে। অপরদিকে কায়েমী স্বার্থ, পুঁজিপতি ও জমিদার শ্রেণী বিদ্যমান সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চাইছে। অর্থাৎ এদেশের ব্যবহারিক রাজনীতিতে একদিকে কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহক, অপরদিকে বিপ্লবী শ্রেণীসমূহের সংগঠিত শক্তি। এই দুই শক্তিকে কেন্দ্র করে যে রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রতিফলিত হবে সেখানে গণতন্ত্রের দ্বিদলীয় ব্যবস্থা কিংবা গণতান্ত্রিক উদারতা এর কোনটাই দেখা দেবে না।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বাস্তবতার পরিচয় দিয়েই তৃতীয় বিকল্প হিসাবে সংযুক্ত বামপন্থী মোর্চা গঠনে উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু বৈপ্লবিক শক্তিগুলি একটা সংগঠিত রূপ নিয়ে রাজনীতিক বিপ্লবের সম্ভাবনা সৃষ্টি করার প্রক্রিয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিবদমান দল ও গোষ্ঠীগুলিও ঐক্যবদ্ধ হবে এবং কমিউনিস্ট মোর্চা বুর্জোয়া শাসনেরই সম্ভাব্য বিকল্প হয়ে উঠবে। এখানে বিকল্পটা ইংল্যাণ্ডের অনুরূপ নয়। ওদেশে রক্ষণশীল এবং উদারনৈতিক দল কিংবা রক্ষণশীল এবং শ্রমিক দলের মধ্যে মতপার্থক্য সমাজের আর্থনীতিক ভিত্তি নিয়ে নয়। শ্রমিক দলের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী নেই বলেই শ্রমিক দল কর্তৃক সরকার গঠনকে রক্ষণশীল দল গণতান্ত্রিক উদারতার সঙ্গে মেনে নিতে পারে; শ্রমিক দলের সরকার ওদেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থকে মৌলিকভাবে বিপন্ন করে তোলে না।

ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী নিয়েই কংগ্রেস-জনতা বা বুর্জোয়া রাজনীতিক দলের বিকল্প দেখা দেবে। এ অবস্থায় অর্থাৎ বুর্জোয়া এবং বিপ্লবী রাজনীতিক দলগুলির মধ্যে রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, লর্ড ব্যালফুর যে-শর্তের কথা বলেছিলেন, সে শর্ত থাকবে অনুপস্থিত। বুর্জোয়া রাজনীতিক দল বিপ্লবী দলগুলির ক্ষমতালাভের সম্ভাবনাকে গণতান্ত্রিক উদারতার সঙ্গে মেনে নেবে না। অপরদিকে কমিউনিস্ট এবং সহযোগী বিপ্লবী দলগুলির মোর্চা ক্ষমতালাভের জন্য শুধুমাত্র সংসদীয় গণতন্ত্রে স্বীকৃত

প্রতিষ্ঠার পথে বুর্জোয়া দলগুলি সম্বন্ধে গণতন্ত্রসম্মত উদারতার নীতি বজায় রাখতেও পারবে না।

আপাতত বিপ্লবী দলগুলি তেমন কোন বিপদের আশঙ্কা সৃষ্টি করে নি বলে সংসদীয় গণতন্ত্রের ফর্ম বজায় আছে। কিন্তু আর্থনীতিক সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে; রাজনীতিক ক্ষেত্রে তার প্রকাশ শাসন-পদ্ধতির অধিকতর স্বৈরতান্ত্রিকতায়। মোরারজী দেশাই এবং চরণ সিংকে নিয়ে শাসকদলের মধ্যে যে কোন্দল দেখা দিয়েছে তাও বলা যায় সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে নজীরবিহীন।

আপাতত সংসদীয় গণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার সহযোগী দলগুলি গণতন্ত্রের সম্প্রসারণের জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করবে। এ সংগ্রামের লক্ষ্য হবে পুঁজির, বিশেষ করে একচেটিয়া পুঁজির ভিৎ দুর্বল হয় এমন ব্যবস্থা গ্রহণ, যার রাজনীতিক দিক হবে জনগণ বিশেষ করে শ্রমিক কৃষকের অধিকার ও ক্ষমতার সম্প্রসারণ। বাস্তবক্ষেত্রে এ সংগ্রাম রূপ নেবে বিশেষ ধরনের কোন সাংবিধানিক সংশোধনে, প্রশাসনিক বা রীতিগত পরিবর্তনে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে, পঞ্চায়েতী স্বায়ত্তশাসনে, আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচে, ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত বিধির প্রগতিশীল পরিবর্তন বা সংস্কারের মধ্য দিয়ে। এভাবেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ফর্মের মধ্যেই আপাতত তার চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটবে। জনতা সরকার ও দলকে গণতন্ত্রের ধ্বজাবাহীর স্বীকৃতি দিয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শ্রেণীচরিত্র সম্বন্ধে তার ফর্ম ও মর্মবস্তুর মধ্যে পার্থক্যকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। অথচ এ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকলে গণতন্ত্রের সংগ্রামকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের অনুকূল পরিপূরক হিসাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কোন বুর্জোয়া দলের সঙ্গে সহযোগিতায় এ ধরনের সংগ্রাম পরিচালনা করা যায় না, পরন্তু নির্ভর করতে হয় শ্রমজীবী জনগণের বৈপ্লবিক উদ্যোগের উপর। সেটা কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিসম্মত আচরণ নয়।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক অবস্থান ও বামপন্থী ঐক্য গড়ার সমস্যা

ভানুদেব দত্ত

ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির তিনটি দাবী। জনতা সরকারের অব্যাহত শাসন নয়। কংগ্রেস শাসনেরও পুনরাবির্ভাব নয়। যা দরকার তা হল, বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির জাতীয় বিকল্পের সরকার। পরিস্থিতির এই দাবী সমস্ত বামপন্থী দল ত বটেই এমনকি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দলের কোন কোন নেতার মুখ থেকেও শোনা যাচ্ছে।

বিকল্প সরকার গঠনের জন্য যে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সমাবেশ প্রয়োজন, তাতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে—পরিস্থিতির এই দাবীর প্রতি স্বীকৃতি, খুবই আনন্দের কথা, এ দুটি দলের পার্টি কংগ্রেসের দলিলে স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় বিকল্পের এক ভাবমূর্তি জনসমক্ষে উপস্থাপিত করা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরই প্রথম পদক্ষেপ সি-পি-আই ও সি-পি-এমের বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে যুক্ত-আন্দোলন করার ঘোষণা। উভয় দল কর্তৃক স্বাক্ষরিত এপ্রিল মাসের যৌথ বিবৃতিতে এটি স্বীকৃত হয়েছে।

এই প্রবণতা অতীতে এক সুস্পষ্ট গতিমুখ পাচ্ছিল না। বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলির গোঁড়ামি, পারস্পরিক অবিশ্বাস—এর পথে ছিল অন্তরায়। ঐক্যের ভিত্তি অনুসন্ধান করার পরিবর্তে পার্থক্যকে অবিরত জনসমক্ষে হাজির করার জন্য মরীয়া মনোভাব পরিস্থিতির দাবী পূরণে কখনই সহায়ক হচ্ছিল না। এই পটভূমিকায় উক্ত বিবৃতিতে ঐক্যের ভিত্তি অনুসন্ধানের উপর উভয় পার্টি যে গুরুত্ব আরোপ করেছে সেটি আশার কথা।(১)

ঐক্য রচনার ক্ষেত্রে সাধারণ ভিত্তি

পরিস্থিতির এই দাবীকে বিবেচনা করেই, এ দুটি বামপন্থী দলের কাছে দুটি লক্ষ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রথমটি হল সরকার গঠনের প্রশ্ন, যা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় লক্ষ্যটি হল, কমিউনিস্ট আন্দোলনে ঐক্যের প্রশ্ন।

প্রসঙ্গত, সি-পি-আই জাতীয় ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আন্দোলনে ঐক্যের প্রশ্ন তুলেছে এবং এর জন্য সি-পি-আই ও সি-পি-এমের মধ্যে যুক্ত আন্দোলনের উপর জোর দিয়েছে। সি-পি-আই, সি-পি-এমের কাছে আবেদন করেছে—"বৈরী মনোভাবসম্পন্ন ও ভেদপন্থী আক্রমণের অবসান করুন। ঐক্যের জন্য কোনও পূর্বশর্ত আরোপ না করে, ব্যাপকতম ক্ষেত্রে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলতে সাহায্য করুন। এই ধরনের সংগ্রামী ঐক্যই শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশে, নীতিনিষ্ঠ ভিত্তিতে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুনর্মিলনের পথ প্রশস্ত করতে পারে। সি-পি-আই সেই পুনর্মিলনের সপক্ষে।"(২)

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে বিরোধের ক্ষেত্র রয়েছে তাকে সি-পি-আই সামনে আনে নি।

অপরদিকে, সি-পি-এম জাতীয় ক্ষেত্রে সি-পি-আইয়ের সঙ্গে ঐক্যের প্রশ্নটিকে একেবারে এড়িয়ে গেছে। সি-পি-আইয়ের সঙ্গে যুক্ত আন্দোলন অথচ ঐক্য নয়, এই মনোভাবের কারণ হল—জনতা দলের সাহচর্যে তাঁদের যে সংসদীয় লাভ হয়েছে, তাকে তাঁরা এই মুহূর্তে ক্ষুণ্ণ করতে নারাজ। সি-পি-আইয়ের সঙ্গে যুক্ত আন্দোলন অথচ জনতা দলের সাহচর্য একই সঙ্গে এই দুই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হল যাতে শ্রেণীগত লাভ ও সংসদীয় লাভ উভয়ই তাঁরা অর্জন করতে পারেন। এই কারণের জন্য জাতীয় ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্যের প্রশ্ন উত্থাপনে তাঁরা বিরত থেকেছেন।

পক্ষান্তরে তাঁরা জোর দিয়েছেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপর। সি-পি-এম বলেছে, "...আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে নীতিসম্মত ঐক্যের জন্য সংগ্রাম—যে ঐক্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অবিসম্বাদ নীতিভিত্তিক—মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি অনুগত প্রত্যেকেরই তা করা অবশ্য কর্তব্য।"(৩)

এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সি-পি-এম বস্তুত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের

---

২ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাব—পৃ. ২৭

বিরোধ মীমাংসার কথাই উত্থাপন করেছে। সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে চীনের অবস্থান যেখানে এসে পৌঁচেছে এবং এগুলিকেই কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে এই দুই দেশের বিরোধ এমন পর্যায়ে রয়েছে যে, এর মীমাংসার প্রশ্নটি আকাশ-কুসুম কল্পনামাত্র। এই অবস্থায় এর উপর জোর দেওয়ার অর্থই হল জাতীয় ঐক্য-প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটানোর ক্ষেত্রে এই ধরনের সংঘত আপত্তি প্রকাশ করা।

এ সত্ত্বেও বামপন্থী দলের শরীক হিসাবে সি পি-আই ও সি পি-এমের মধ্যে বিষয়গত (অবজেকটিভ) দিক থেকে এক সাধারণ ভিত্তি রয়েছে। এখানে বিষয়গত বৈশিষ্ট্য অর্থে তাদের সামাজিক ভিত্তির শ্রেণী চরিত্রকেই ধরা হচ্ছে, কোন বিষয়ীগত (সাবজেকটিভ) বৈশিষ্ট্যকে নয়। এটা স্বীকার করতে হবে যে, সামাজিক উৎসের শ্রেণীগত বিচারে সি-পি-এম বিপ্লবী প্রক্রিয়ার খুব কাছাকাছি। সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্মরণে রাখা দরকার যে, পেটিবুর্জোয়া প্রাধান্যবিশিষ্ট পার্টি হিসাবে তাঁদের বিষয়ীগত বৈশিষ্ট্য বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে বড় বাধা। সি-পি-এম নেতৃত্বের বিষয়ীগত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ হিসাবে নেতিবাচক ও সুবিধাবাদী নীতিগুলিকে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম-ক্ষেত্রের বিষয় হিসাবে গণ্য করা উচিত। আর বিষয়গত বৈশিষ্ট্য হিসাবে তাঁদের ইতিবাচক শ্রেণী অবস্থানকে যুক্ত আন্দোলনের মঞ্চে আনার প্রচেষ্টা চালানো উচিত। এই সাধারণ ভিত্তি আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না।

আরেকটি সাধারণ ভিত্তি রয়েছে। বাম ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর মধ্যে সি-পি-আই ও সি-পি-এমের মধ্যে বহু জায়গায় মিল রয়েছে—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় দিক থেকেই। তবে জাতীয় কর্মসূচী যুক্তভাবে পালন করার বিষয়ে বহুক্ষেত্রে জনতা পার্টি সম্পর্কে সি-পি-এমের দৃষ্টিভঙ্গী একটা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তবে সেই বাধা আন্তর্জাতিক কর্মসূচীতে অনুপস্থিত। সি-পি-এমের মতে, "বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার একটি সঙ্গতিপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নীতির পক্ষে। তারা নয়াউপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির লড়াই সমর্থন করে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে

বিশ্ব সংগ্রামের সমর্থক। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তিকে শক্তিশালী করার পক্ষে তারা।"(৪)

সি পি এমের এই বক্তব্যের সঙ্গে সি পি আইয়ের নিম্নলিখিত বক্তব্যের কি কোন তফাৎ রয়েছে?—"দৃঢ় ও নীতিনিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি রচনা করতে হবে, যার মূল ভিত্তি থাকবে শান্তি, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুতা ও সহযোগিতা; জোট-নিরপেক্ষ নীতির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মূলনীতিকে আরও জোরদার করা; সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার ভিত্তিতে সমগ্র জোটনিরপেক্ষ পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের ঐক্য ও সৌহার্দকে আরও জোরালো করা।"(৫)

সি-পি-আই ও সি-পি এমের মধ্যে সাধারণ ভিত্তির এই দুটি দিককে যুক্ত আন্দোলন করার ক্ষেত্রে খেয়ালের মধ্যে রাখা উচিত।

সি পি-এমের বর্তমান অবস্থান

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রশ্নে এই দুই পার্টির মধ্যে পার্টি-বিভাজন কালে যে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল, সি-পি-এমের দৃষ্টিভঙ্গী ও অবস্থানের যৎসামান্য পরিবর্তন হওয়ার ফলে সেই পার্থক্য নিরসনের ভিত্তি রচিত হয়েছে। এটাকে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির বিকল্প গঠনে কতটা কাজে লাগানো যায় তা দেখাটাই যুক্তিসঙ্গত ও সময়োপযোগী। এই পটভূমিকায় তাদের বর্তমান অবস্থান অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে।

নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ে সি-পি-এমের বর্তমান অবস্থান কি, তা দেখা যাক।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ব্যাখ্যায় বা প্রয়োগে অন্য কারুর সঙ্গে সি-পি-এমের পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু এর প্রতি তার আনুগত্যকে লঘু ক'রে দেখা ক্ষতিকর ও অসমীচীন। বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সমাবেশ ঘটবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে কেন্দ্র করে—এ ব্যাপারে সি-পি-এমের সঙ্গে সি পি-আই এর ঐকমত্য রয়েছে। অন্যদিকে, কংগ্রেসের যে অংশ বাম ও গণতান্ত্রিক সমাবেশের কথা বলে, তাঁদের কিন্তু এই মৈত্রী গঠন সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট।

৪ ঐ পৃঃ ৪৮

বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ভিত্তি হিসাবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে মেনে নেওয়া এবং তার কর্মসূচীর কিছু কিছু অংশ মেনে নেওয়ার মধ্যে আমাদের পার্থক্য টানতেই হবে।

কেবল তাই নয়, আজকের পৃথিবীতে মার্কসবাদকে ভিতর ও বাহির উভয় দিক থেকেই আক্রমণ করা হচ্ছে। এমন ঝোঁকও রয়েছে যা মার্কস ও লেনিনকে পৃথক করে দেখাবার চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য—মার্কসই আসল, লেনিন কিছু নয় ইত্যাদি। বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্প গঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা খুবই আশার কথা যে, এগুলির কোনটির সঙ্গে সি-পি-এম কোন ঐকমত্য পোষণ করে নি। সি-পি-এমের সাধারণ সম্পাদক নাম্বুদিরিপাদ তাঁদের দশম পার্টি কংগ্রেসে বক্তৃতায় বলেছেন, "আমরা প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ, প্রলেতারীয় একনায়কত্ববাদের নীতিগুলি ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা মেনে চলি। আমরা মেনে চলি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলনীতিগুলি।"(৬)

সাম্প্রতিক একটি ঝোঁকের কথাই ধরা যাক—ইওরোকমিউনিজম। এটি মার্কসবাদবিরোধী একটি ঝোঁক। দশম পার্টি কংগ্রেস থেকে নাম্বুদিরিপাদ এর বিরোধিতা করেন এবং এর মার্কসবাদবিরোধী দিকের উল্লেখ করেন। এর বিপদের দিক উদ্ঘাটন করে তিনি বলেন এই ঝোঁক প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ববাদের নীতিগুলিকে বাতিল করে দেয়। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, "আমরা ভারতীয় কমিউনিজম গ্রহণ করতে যাচ্ছি না।"(৭)

সন্দেহ নেই, এটি একটি সদর্থক মনোভাব।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইন প্রসঙ্গে

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকল্প দলিল যা চীনের '২৫ পয়েন্ট' দলিল নামে খ্যাত, তাকে সি-পি-এম বর্তমানে সরাসরি অস্বীকার না করলেও, সে যে তা থেকে অনেকখানি সরে এসেছে, এটা ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। এটিও এক ইতিবাচক প্রক্রিয়া।

আবার আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সর্বশেষ দলিল যা ৭৫ পার্টির দলিল নামে খ্যাত এবং যাকে সে সংশোধনবাদের হের-ফের বলে মনে করত—এই অবস্থানও সে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পারছে না। এটিও লক্ষ্য করার বিষয়।

'২৫ পয়েন্টের' মূল কথা হল—বিশ্বের মূল বিরোধ সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতন্ত্র নয়, সাম্রাজ্যবাদ বনাম জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম। এতে জোট-নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর কোন উল্লেখ নেই। ৮১ পার্টি দলিলের দুই মহৎ অবদান জাতীয় গণতন্ত্র ও অ-পুঁজিবাদী পথকে '২৫ পয়েন্ট' দলিল নাকচ করে দিয়েছে এবং তৎপরিবর্তে জনগণতন্ত্র ও দ্রুত সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কথা বলা হয়েছে।

১৯৬৭ সালে যখন সি-পি-এম থেকে একটা অংশ নকশালপন্থী হয়ে বেরিয়ে গেল, সে সময় থেকেই বস্তুত-তাঁরা ভারতের বিপ্লবের স্তরের প্রশ্নে '২৫ পয়েন্ট' দলিল থেকে সরে এসেছেন। নকশালপন্থীরা ভারতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরকে গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে সি-পি-এম গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরকে যেমন উপেক্ষা করে নি, তেমনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের কথাও ঘোষণা করে নি। সি-পি-এম তাদের জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টে জাতীয় বুর্জোয়ার একাংশের যোগদানের কথা তত্ত্বগতভাবে স্বীকার করে। যদিও কার্যক্ষেত্রে এতদিন তারা তা স্বীকার করত না। ইদানিংকালে তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছে। তবে, বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, পরিবর্তন মাত্রাতিরিক্ত ঘটেছে। সি-পি-এমের তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যত অবস্থানের মধ্যে কোন সমন্বয় নেই।

বুর্জোয়াশ্রেণীর একাংশের যোগদান প্রসঙ্গে সি-পি-এম বলছে, "জনতা পার্টির ভিতরের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।"(৮) তারা আরও উল্লেখ করেছে যে, "……কংগ্রেসের মধ্যে এমন সব ব্যক্তি ও গোষ্ঠী রয়েছে, যারা শুধু ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধেই নয় অনেকগুলি সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রশ্নে একটা প্রগতিমুখী মনোভাব নিচ্ছে। বাম ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর পক্ষে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে এদের উৎসাহ দিতে হবে।"(৯)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিপ্লবের স্তর বিচারের প্রশ্নে সি-পি-এমের

ধারণা ভ্রান্ত হলেও, অন্ততপক্ষে অতিবামপন্থী দলের মত সমাজতান্ত্রিক স্তরের কথা সে বলছে না। বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সমাবেশে জাতীয় বিকল্প গঠনের ক্ষেত্রে তারা এক অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য অবস্থানে রয়েছে।

২৫ পয়েন্টের মূল কথাগুলির দ্বিতীয় দিক হল এ যুগের প্রধান বিরোধ সম্পর্কিত। মার্কসবাদে বিশ্বাসী দল বা ব্যক্তির কাছে যুগনির্ণয় ও সেই যুগের প্রধান বিরোধ নির্ণয়, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সি-পি-এম এই যুগকে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ বলে মনে করে। একথা তারা নির্দ্বিধায় তাদের দশম পার্টি কংগ্রেসেও স্বীকার করেছে।(১০) এটি ৮১ পার্টি দলিলেরও মর্মকথা। যুগের এই চরিত্র অনুসারে সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে দ্বন্দ্বই হল প্রধান বিরোধ।

যুগের সংজ্ঞা ও তার প্রধান বিরোধ নির্ণয়ে সি-পি-এমের মধ্যে বহুদিন ধরে এক স্ববিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। প্রধান বিরোধের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান এতদিন '২৫ পয়েন্ট' দলিলের অনুগামী ছিল। সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে বিরোধকেই তারা প্রধান বিরোধ বলে মনে করত। কিন্তু তাঁরা তাঁদের এই অবস্থান পরিবর্তন করে ১৯৬৯ সালে—লেনিন শতবার্ষিকী স্মরণে কেন্দ্রীয় কমিটির থিসিস মারফৎ। তাদের এই পরিবর্তিত অবস্থান ৮১ পার্টি দলিলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই থিসিসে তাঁরা বলেছেন—"লেনিন শ্রমিকশ্রেণীকে বলেছিলেন যে, দুই ব্যবস্থার মধ্যে বিরোধই হল একালের মৌলিক বিরোধ।"(১১) এই থিসিসে ভারত প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, "লেনিনের নির্দেশমত আমাদের পার্টি মনে করে যে, বর্তমান যুগের এই মূল বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনসাধারণের সংগ্রামকে কার্যকরীভাবে পরিচালনা করতে হবে।...পৃথিবীর কোন অংশে এই মৌলিক বাস্তবতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাতীয় বা সামাজিক সমস্যাবলী উপলব্ধি করা বা সমাধান করা যায় না।"(১২)

সি-পি-এমের এই অবস্থানের অর্থ হল '২৫ পয়েন্ট' অনুসারে এ যুগের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে কৃষক সম্প্রদায় তাকে অস্বীকার করে ৮১ পার্টি দলিলের যে মর্মার্থ—এ যুগের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে শ্রমিকশ্রেণী—তাকে স্বীকার করা।

---

(১০) ঐ পৃঃ ১

(১১) People's Democracy—In Commemoration of Lenin Centenary.

বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি সমাবেশের ভিত্তি রচনার ক্ষেত্রে এ এক বিরাট অগ্রগতি, এতে কোন সন্দেহ নেই।

এ সত্ত্বেও একথা বলা চলে যে, প্রধান বিরোধকে এভাবে স্বীকার করেও তার গুরুত্বকে পূর্ণাঙ্গ অনুধাবনের অসঙ্গতি তাদের মধ্যে রয়েছে। ১৯৭২ সালে তাদের নবম পার্টি কংগ্রেসে প্রতিটি বিরোধের দৃষ্টান্তমূলক ব্যাখ্যা সঠিকভাবে উপস্থিত করা হলেও, এদের মধ্যে পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করার কোন চেষ্টা সেখানে করা হয় নি। মনে হওয়াটা স্বাভাবিক, যেন প্রতিটি প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে তার নিজস্ব গতিতে এবং নিজস্ব নিয়মে, প্রতিটি বিরোধ যেন অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন।

পরিবর্তনের ছাপ পড়ে তাদের দশম পার্টি কংগ্রেসে। এতে বলা হয়, "সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অস্তিত্ব ও তার ক্ষমতাবৃদ্ধি এই সমস্ত দেশগুলিকে··· ·সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থান নিতে সাহস জুগিয়েছে।"(১৩)

'২৫ পয়েন্টের' তৃতীয় দিক হল জোটনিরপেক্ষ নীতি সম্পর্কিত। এ সম্পর্কে সি-পি-এমের ধারণা প্রথম থেকেই বলা যেতে পারে ৮১ পার্টি দলিলের অনুসারী। এ বছরের দশম পার্টি কংগ্রেসে এই নীতির যে গুরুত্ব ও সাফল্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা বস্তুত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি-গুলিকেই উৎসাহ দেবে। গুরুত্ব প্রসঙ্গে তারা বলছে, "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামে জোটনিরপেক্ষ নীতির অনুসরণ স্বাধীনতা, শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বের ভিত্তিতে বৈদেশিক নীতি দেশের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ(১৪)।" এই গুরুত্ব যে ক্রমেই বেশী বেশী করে অনেক দেশ উপলব্ধি করছে, এটারও স্বীকৃতি রয়েছে তাদের প্রস্তাবে। তাঁরা বলছে, "সাম্রাজ্যবাদ ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র হওয়ায় গোষ্ঠীনিরপেক্ষ আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে।···রাষ্ট্রসংঘেও জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলি একটা বড় শক্তি।"(১৫)

ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতিকে সি-পি-এম শুরু থেকেই এক ইতিবাচক ঘটনা বলে মনে করেছে। এই নীতি গ্রহণ করার পিছনে কারণ প্রসঙ্গে তারা

(১৩) সি-পি-এমের দশম কংগ্রেস (১৯৭৮) গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাব—পৃঃ ৩

(১৪) ঐ পৃঃ ২৯

বলেছে, "ভারত সরকার দেশের নবলব্ধ স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য এবং নিজের শ্রেণী-স্বার্থকে এগিয়ে নেবার জন্য নিরপেক্ষতা ও জোট নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করে(১৬)।" এই নীতি ভারতকে যে প্রভূত আন্তর্জাতিক মর্যাদা এনে দিল, সে প্রসঙ্গে তাদের কর্মসূচী উল্লেখ করছে, "গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার নীতিতে···যে নতুন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অন্তর্বস্তু সঞ্চার করা হল, তা আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহে একটি ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে। এই অন্তর্বস্তু ভারতকে আরো দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ ও পারমাণবিক কূটনীতির কর্মনীতির বিপক্ষে আন্তর্জাতিক বিরোধসমূহের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সপক্ষে সামিল করে নিল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ভারতের নিজের সম্পর্ক আরো নিবিড় ও আরো আন্তরিক হল এবং তার আন্তর্জাতিক মর্যাদাও বেড়ে গেল, বিশেষ করে, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে।"(১৭)

ভারতের গোষ্ঠীনিরপেক্ষ নীতির দোদুল্যমানতা সম্পর্কে সি-পি-এম হুঁসিয়ারি দিয়েছে, "দুই শিবিরের মধ্যে খেলার যে নীতি ভারত সরকার অনুসরণ করে আসছে, তা দোদুল্যমানতা ও আপসের পথে নিয়ে যায় এবং ব্যাহত করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ভিত্তিতে নিরবচ্ছিন্ন গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা নীতির অনুসরণকে।"(১৮)

এর সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটি দিকের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—দাঁতাত, যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন। এগুলি সম্পর্কে সি-পি-এমের দৃষ্টিভঙ্গী বস্তুত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীরই ইঙ্গিতবহ। সি-পি-এমের মতে শান্তির শক্তি বাড়ছে, দাঁতাতের প্রক্রিয়া জোরদার হচ্ছে, যুদ্ধের শক্তি পিছু হটছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সে বলেছে, "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখন পশ্চাদপসরণ করছে এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার শক্তি, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এবং শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য আন্দোলন যখন প্রসারিত হচ্ছে, তখন সাম্রাজ্যবাদ তার শক্তি পুনর্গঠিত করতে এবং প্রগতি, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ করতে চেষ্টা করছে।

(১৬) সি-পি-এমের সপ্তম কংগ্রেসে (১৯৬৮) গৃহীত কর্মসূচী—পৃঃ ২৩

(১৭) ঐ পৃঃ ২৮

.....“বিগত পাঁচ বছরের ঘটনাবলী দেখিয়ে দিচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার মিত্ররা যত চেষ্টাই করুক না কেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে তারা যে উদ্যোগ হারিয়ে ফেলেছে, তা আর পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়।”(১৯)

এই পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদীদের ঘাঁতাত সম্পর্কিত প্রস্তাব গ্রহণকে এবং হেলসিংকি সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ এবং সম্মেলনের চূড়ান্ত বিধান হিসাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মৌলিক নীতিগুলি গ্রহণ করাকে সি-পি এম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে দাবী করেছে।

জাতীয় গণতন্ত্র ও অ-পুঁজিবাদী পথ এ দুটি ধারণাকে চীনের ‘২৩ পয়েন্ট’ যেমন নাকচ করে দিয়েছে, তেমনি সি-পি-এমও তাই করেছে। সি-পি-আইয়ের সঙ্গে সি-পি-এমের এই তত্ত্বগত পার্থক্য রয়েছে, এ ব্যাপারে মতাদর্শগত সংগ্রাম চলতে থাকবে।

সি-পি-এম আরও স্বীকার করে—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এটি একটি লেনিনীয় ধারণা। এ ব্যাপারে তাঁদের ধারণার মধ্যে একটা ভ্রান্তি গোড়া থেকে থাকলেও, দশম পার্টি কংগ্রেসে তাদের এই অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। এর কার্যকারিতা সম্পর্কে তারা দুটি দিকের উল্লেখ করেছে। প্রথমত, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি অনুন্নত দেশগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে পারছে। দ্বিতীয়ত, এই সাহায্য মূলধনী সামগ্রী ও প্রযুক্তিবিদ্যা সরবরাহে সাম্রাজ্যবাদের একচেটিয়া প্রভুত্বের অবসান ঘটাতে পারছে। সি-পি-এম মনে করে শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার এই ঘটনা দুই দুনিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্বের তীব্রতাকে আরও বৃদ্ধি করেছে(২০)। প্রসঙ্গত, এই ধারণা সম্বলিত অংশটি দশম পার্টি কংগ্রেস উপলক্ষে প্রচারিত খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবে উল্লেখিত ছিল না। কংগ্রেসে সংশোধনী মারফৎ এটি মূল দলিলে স্থান পেয়েছে। সি পি-এমের তরফ থেকে এটা এক অগ্রগতি। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইনের বিভিন্ন দিক—যুগের প্রধান বিরোধ, গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা, যুদ্ধ ও শান্তি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও শান্তিপূর্ণ অর্থ-

---

(১৯) ঐ পৃঃ ১০-১১।

নৈতিক প্রতিযোগিতা, দাঁতাত ইত্যাদি বিষয়ে সি পি আই ও সি-পি-এমের অবস্থানে ক্রমশ এক সান্নিধ্য ঘটছে।

সোভিয়েত সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী

প্রথমে, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর কথাই ধরা যাক। এই ব্যাপারে সি-পি-এমের দৃষ্টিভঙ্গীর তিনটি পর্যায় লক্ষণীয়। প্রথম পর্যায়ে আমরা দেখি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি তাদের তীব্র বিরোধিতা এবং চীনের প্রতি একাগ্র আনুগত্য। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন থেকে সমদূরত্বের নীতি গ্রহণ যদিও এই নীতির "ঝোঁক" চীনের দিকে। তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে, ঐ একই সমদূরত্বের নীতি যদিও তার "ঝোঁক" চীনের বিপরীত দিকে। যাতে কোন বিভ্রান্তি না ঘটে তার জন্য বলে রাখা ভাল যে, এখানে "ঝোঁক" কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, পরিবর্তন নয়।

আগে যেমন সি-পি-এম বহু বিষয়ে চীনের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করত, এখন বহুক্ষেত্রে তা আর করছে না। আবার, আগে যেমন তারা বহু বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করত না, খুবই আনন্দের কথা যে এখন বহু ক্ষেত্রে ঐকমত্য ঘটছে। এই বাস্তবকে উপেক্ষা করলে, বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমাবেশের প্রচেষ্টা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে যদি আমরা সোভিয়েত-বিরোধিতা ও সোভিয়েত-সমালোচনা—এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য না টানি। এ কথা স্মরণে রাখা দরকার যে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, যাকে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রাথমিক স্তর বলা যেতে পারে, তাতে সোভিয়েত বিরোধীদের নিশ্চিতই কোন স্থান নেই কিন্তু সোভিয়েতের প্রতি মিশ্র ধারণাবিশিষ্ট বা অস্পষ্ট ধারণাবিশিষ্ট শক্তি থাকতে পারে। এই ব্যাপারে গোঁড়ামীর মনোভাব শেষ পর্যন্ত ঐ শক্তিগুলিকে সোভিয়েত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এতে বাম গণতান্ত্রিক ঐক্যেরই ক্ষতি হয়।

একথা সত্য, সি-পি-এমের তরফ থেকে দশম পার্টি কংগ্রেস উপলক্ষে রাজনৈতিক প্রস্তাবের যে খসড়া প্রচারিত হয়েছিল, তাতে চীনের তিন দুনিয়ার তত্ত্ব, সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বলা ও তাকে

ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলিকে আগ্রাসী জোট জ্ঞান করা, ভারত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতিকে সমর্থন করার ঘটনাগুলিকে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল(২১)। কিন্তু মূল দলিল, যা কংগ্রেস থেকে গ্রহণ করা হয়, তাতে এই কথাগুলিকে বর্জন করে সি পি-আইয়ের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা হয়। আবার এর পাশাপাশি এটাও সত্য যে শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার কথা খসড়াতে ছিল না, এটি কংগ্রেস থেকে গ্রহণ করা(২২) হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে সংশোধনবাদী মনে করেও(২৩) ইথিওপিয়ার সমর্থনে সোভিয়েতের ভূমিকার কথা সি-পি-এম অস্বীকার করতে পারে নি(২৪)। সোভিয়েত ইউনিয়নের মানবিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে যে সোরগোল সাম্রাজ্যবাদীরা তুলছে, সি-পি-এম মনে করে এই ঘটনা বস্তুত হেলসিংকি চুক্তি কার্যকর না করার অজুহাত।(২৫) সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাদাতের সোভিয়েতবিরোধী ব্যবস্থা পরবর্তীকালে তাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির জালে জড়িয়ে ফেলে।(২৬)

ভারত-সোভিয়েত চুক্তির ব্যাপারে প্রথম প্রথম তাদের বিরূপ মনোভাব ছিল। পরবর্তীকালে, তারা এর মর্মার্থ উপলব্ধি করে। তাদের নবম পার্টি কংগ্রেসে এর স্বীকৃতি রয়েছে। বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি ভারত-সোভিয়েত চুক্তির পক্ষে কাজ করবে—একথা তারা দশম পার্টি কংগ্রেসেও উল্লেখ করেছে।

ইওরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বার্লিন সম্মেলনকে সমর্থন দান,(২৭) ফরাসী ও ইতালী কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান শক্তির উল্লেখ,(২৮) পর্তুগাল কমিউনিস্ট পার্টিকে সাম্রাজ্যবাদীদের তরফ থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াসের

---

(২১) সি-পি-এমের দশম কংগ্রেস (১৯৭৮) উপলক্ষে খসড়া প্রস্তাব, পৃঃ ১২
(২২) সি-পি-এমের দশম কংগ্রেস (১৯৭৮) রাজনৈতিক প্রস্তাব, পৃঃ ৮
(২৩) ঐ পৃঃ ৪২
(২৪) ঐ পৃঃ ৫
(২৫) ঐ পৃঃ ৮
(২৬) ঐ পৃঃ ৬
(২৭) ঐ পৃঃ ৪২

কথা উল্লেখ(২৯), আফগান বিপ্লবের সাফল্যের উপর লেখা ইত্যাদি ঘটনা আশাব্যঞ্জক। নবম WFTU কংগ্রেসে সি-পি-এমের যোগদান শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আরো দেখা গেছে যে, গত ১৭ই মে থেকে তাঁরা তাঁদের পিপলস ডেমোক্রেসীতে (গণশক্তি নয়) সি-পি-আইয়ের নামের আগে এতদিনকার অভ্যাস 'দক্ষিণপন্থী' কথাটির ব্যবহার বর্জন করতে শুরু করেছে যা সি-পি-আই-সি-পি-এমের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক অবসানের পথে একটা বড় দিক। উল্লিখিত সমস্ত ঘটনা তাদের পূর্বেকার অবস্থানের সঙ্গে তুলনা করলে নিশ্চিতই ইতিবাচক বলে গণ্য করতে হবে।

চীনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী

চীনের '৩৫ পয়েন্ট' দলিল আমাদের দেশের বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। একথা সত্য যে সি-পি-এমের বর্তমান অবস্থান বিষয়গতভাবে এই অবস্থান থেকে সরে এসেছে। ১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেস সম্পর্কে সি-পি এমের পলিটব্যুরোর বিবৃতির মধ্যে দিয়ে এর শুরু বলা চলে। চীন সম্পর্কে এবারের খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবে যে অংশটি ছিল এবং যেটি বস্তুত চীনের সঠিক অবস্থানকেই চিত্রিত করেছিল, মূল দলিল থেকে তার বর্জন দুঃখের। কিন্তু এটা আশ্বাপ্রদ যে, ঐ সঠিক চিন্তার একটা প্রক্রিয়া তাদের পার্টির অভ্যন্তরে রয়েছে। আর রয়েছে বলেই সি-পি-এমকে এবারের প্রস্তাবেও সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে চীনের বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলতে হয়, "সোভিয়েত ইউনিয়ন সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিত্ব করে—একথা আমরা মানি না(৩০)।" সম্প্রতি ভিয়েতনাম-কাম্পুচিয়ার মধ্যে বিরোধে, সি পি-এমের পলিটব্যুরোর বিবৃতিতে কি সেই সঠিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটে নি? ভিয়েতনামের বাস্তবসম্মত প্রস্তাবকে চীন অর্থহীন বলে উড়িয়ে দেওয়ায় পলিটব্যুরো যে বিবৃতি দেন, তাঁকেই অনুসরণ করে বি. টি. রণদিভে বলেছেন, এটা এক ধরনের 'অশ্রমিকজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গী(৩১)।' তিনি আরও

(২৯) ঐ পৃঃ ১।
(৩০) ঐ পৃ. ৫২।

বলেছেন—It is a matter of regret that the Chinese response to talks and discussion is negative and goes against norms of international behaviour among socialist nations. The People's Republic of China has flatly refused talks and negotiations under the plea that the Vietnamese want to use them for propaganda purposes and is not sincere about settling issue. This only exacerbates the situation, leading to rousing of chauvinistic feelings.(৩১)

অবশ্য, আমাদের মতে সি-পি-এমের মতাদর্শগত অবস্থানে ক্রমে উন্নতি লক্ষ্য করা গেলেও কয়েকটি মূল তত্ত্বগত বিষয়ে সে এখনও আগের ভুল আঁকড়ে রয়েছে। "জাতীয় গণতন্ত্র" ও "অ-পুঁজিবাদী পথের" ধারণাকে চীন যেমন বাতিল করে দিয়েছে। সি-পি-এমও তেমনি এগুলিকে ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে রায় দিয়েছে। অথচ তৃতীয় দুনিয়ার অনেকগুলি দেশই 'জাতীয় গণতন্ত্র' ও 'অ-ধনতান্ত্রিক পথ' বেছে নিয়ে সাফল্য অর্জন করেছে। কাজেই এ-ব্যাপারে গোঁড়ামি ছেড়ে সি-পি-এমকে নতুন করে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

এই সব ব্যাপারে সি-পি-আই ও সি-পি-এমের মধ্যে মতপার্থক্য অবশ্যই আছে। কিন্তু এই মতপার্থক্য আদর্শগত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সমাধান করা সম্ভব।

এই বিশ্লেষণের উপর দাঁড়িয়ে এবং ভারতের পরিস্থিতির দাবীতে একথা বলা যায় যে, সি-পি-আই ও সি-পি-এম পরস্পর পরস্পরের প্রতি মতান্ধ বা একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা কোনমতেই বাস্তবানুগ বা বিজ্ঞজনোচিত নয়। স্মরণে রাখা উচিত যে, পারস্পরিক মতভেদ কেবলমাত্র নীতিগত বিতর্ক চালিয়েই সমাধান করা যায় না, রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ক্রিয়াশীলতার মধ্যে দিয়েও তা করতে হয়। এই কারণে ঐক্যের যে সাধারণ ভিত্তি রয়েছে, তারই উপর প্রথম দাঁড়াতে হবে এবং তাকেই কেন্দ্র করে এগোতে হবে যাতে পার্থক্যের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়।

বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির বিকল্প গঠনে বামপন্থী দুই প্রধান দল—সি-পি-আই ও সি-পি-এমকে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে পুঁজিতন্ত্র কোন পথে ?

শংকর রায়

স্বাধীনোত্তর ভারতে একচেটিয়া ও বৃহত্তর পুঁজির বিকাশ এবং আর্থ-ক্ষমতা কেন্দ্রীভবন সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে বিপুল অনুসন্ধিৎসার বিষয়স্থল। এক জটিল অথচ পূর্বনির্ধারিত কর্মনীতির ভিত্তিতেই শতাধিক একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে, যা পৃথিবীর অন্য যে-কোন দেশের পুঁজিতন্ত্র বিকাশ পথ থেকে অগতর। যদিও বিষমতাই পুঁজিতন্ত্রের বিকাশগত চরিত্রবৈশিষ্ট্য এবং স্বতঃস্ফূর্ততাই তার মৌলিক প্রবণতা, তবু ভারতের পুঁজিতন্ত্র এমন একটা পথ অনুসরণ করেছে যা বিশ্লেষণগতভাবে অপরিজ্ঞাত, গবেষণাগত দিক থেকে অননুশীলিত তো বটেই। এক দেশের পুঁজিতন্ত্র অন্য দেশের পুঁজিতন্ত্র থেকে পৃথক হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু ভারতের পুঁজিতান্ত্রিক পথের বিশিষ্টতাগুলি যেন আরও জটিল। আর সেটাই পুঁজিপতিদের মহাস্ত্র। কারণ সেই জটিলতার রহস্য উন্মোচিত না হলে পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদকল্পে সংগ্রামের রূপরেখা নির্ণীত হতে পারে না। এই সব কারণে ভারতের পুঁজিতন্ত্র বিষয়ে নিবিড় নিরীক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন—সামাজিক দিক থেকে তো নিশ্চয়ই। তাছাড়া যারাই আমাদের গ্রহ থেকে পুঁজিতন্ত্রকে চিরনির্বাসন দিতে চান, তাদের কাছেও ভারতীয় পুঁজিতন্ত্র সমীক্ষণীয়। তদুপরি ভারতের পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ তৃতীয় দুনিয়ায় সর্বোত্তম, (আধা-উন্নত পুঁজিতন্ত্র তো নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে ভারতের পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামোকে) এবং তৃতীয় দুনিয়ায় এত ধূর্ত বুর্জোয়াশ্রেণীও আর কোন দেশে নেই।

ভারতের পুঁজিতন্ত্র-বিকাশ নিয়ে অজস্র গবেষণাপত্র, প্রবন্ধ ও পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলি অবমূল্যায়ন করার প্রশ্নই নেই। কিন্তু এগুলিতে অতি প্রয়োগবাদ-প্রবণতা ও বিশ্লেষণ-পরিপ্রেক্ষিতহীনতা এত সুস্পষ্ট যে, পরিণামে এ সমীক্ষাগুলি উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়েছে এ ধরনের সমীক্ষা না

পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের অনুশীলন বিষয়মুখী হয়ে উঠতে পারে না। কারণ প্রয়োগবাদসর্বস্বতা বা অ্যাকাডেমিক স্বার্থসেবিতার মাধ্যমে বুর্জোয়াশ্রেণীর আর্থ-রণনীতি ও আর্থ-রণকৌশলের মূল সূত্রগুলি অনুসন্ধান সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যে রাজনীতি-নিরপেক্ষ নয়, এই সহজ অথচ গভীর সত্য স্মরণে না রাখলেই এরকম বিষয়মুখিতা-বিচ্যুত হওয়া সম্ভব। লেনিন বলেছিলেন যে, রাজনীতি অর্থনীতির সঘন অভিব্যক্তি। যে বৈজ্ঞানিকতার উপর সমগ্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দাঁড়িয়ে আছে, তার নিরিখেই লেনিন একথা বলেছিলেন। অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করা আবশ্যক। ভারতের একচেটিয়া পুঁজি ও বৃহৎ পুঁজি নিয়ে সমীক্ষা/নিবন্ধগুলির প্রধান ত্রুটি ও বৈশিষ্ট্য অবৈজ্ঞানিকতা, যার জন্যেই সেগুলিতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রবণতার মধ্যে অন্বয় অনুসন্ধানের প্রয়াস অনুপস্থিত। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রবণতার অন্বয় সম্পর্কে সচেতনতার অভাবই ঐ সমীক্ষাগুলিকে উদ্দেশ্যময়তা দিতে পারে নি; অথচ এই অভাব থাকার অর্থ মানবেতিহাসের আধুনিকতম পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের/সামাজিক দায়িত্ব পালনের অক্ষমতাকে পোষণ করে রাখা।

ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ বিষয়ে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার বাস্তবিকই অসাধিত রয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ রকম সমীক্ষা জরুরী। সামাজিক দায়ভাগ বহন করার কথা মনে রেখে এরকম বহু সমীক্ষার আশু প্রয়োজন, যার এক একটি থেকে পুঁজিতন্ত্রের এক একটি প্রবণতা অগোপনভাবে আমাদের সামনে ফুটে উঠবে। ভারতে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের নিবিড় বীক্ষণ প্রয়োজনীয়তা হিসেবে অনুভূত হবার কারণ একালে তৃতীয় দুনিয়ার যে-কোন দেশেই পুঁজিতন্ত্র হল নয়া উপনিবেশবাদের সুড়ঙ্গ পথ। অনেক গবেষক মনে করেন যে, তৃতীয় দুনিয়ায় পুঁজিতান্ত্রিক পথ এক পরাধীন পথ। অনেক সোভিয়েত গবেষক তো মনে করেনই।(১) একটু ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় যে, তৃতীয় দুনিয়ায় পুঁজিতান্ত্রিক পথে স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের কথা চিন্তা করা দিবাস্বপ্নে বিভোর হওয়ারই নামান্তর। কাজেই ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনে ভারতে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্য তো দূর হতে দূরতর হচ্ছেই, উপরন্তু পরাধীন পথের অবধারিত পশ্চাৎগতির দৌলতে জাতীয় স্বাধীনতাও বিপন্ন হতে বাধ্য। কিন্তু সাধারণভাবে এই বিপজ্জনক

পুঁজিতন্ত্রকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে একচেটিয়া ও বৃহৎ পুঁজির অতিকায়তা আর এই প্রক্রিয়া ভারতকে নয়া উপনিবেশবাদের আগ্রাসনের মুখে ক্রমদুর্বল করে তুলছে। আমাদের সে তুলনায় প্রস্তুতি কোথায় যে তাকে অবরোধ করি? আর এ অবরোধেই প্রশাসনিক কর্তব্য এই প্রক্রিয়াকে সম্যকভাবে জানা অর্থাৎ এ সম্পর্কে বিষয়গত সমীক্ষা, যা আমাদের কাছে দুঃখজনক-রূপে দুর্লভ, হয়ত আদৌ সভ্য নয়।

ভারতীয় পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের প্রধান প্রধান উপসর্গগত ধারা তিনটি এবং এ তিনের মধ্যে মৌলিক বিচারে মৈত্রীর চেয়ে সংঘাতের ভাবই বেশী। একদিকে একচেটিয়া পুঁজির প্রসার, অন্যদিকে বিদেশী পুঁজি লগ্নীর দ্রুত বৃদ্ধি এবং শেষত, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের অগ্রগতি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এ তিনটি ধারা পরস্পরবিরোধী। কারণ একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ স্বাধীন পুঁজিতন্ত্রের অভিব্যক্তি, বিদেশী পুঁজির প্রসার নয়া উপনিবেশবাদের সহায়ক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বিকাশ পুঁজিতন্ত্র-বিরোধী। এ রকম আপাতদৃষ্টি-ভিত্তিক সমীক্ষায় ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ প্রবণতার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি অনির্ণেয়ই থেকে যাবে। যে কোনো অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বিচারে তার রাজনৈতিক দিকটিও বিচার করতে হবে। এ তিনটি ধারাই প্রবাহিত রয়েছে পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে অর্থাৎ কেবল যে পুঁজিতান্ত্রিক পথ চলেছে তা নয়, পুঁজিতান্ত্রিক নিয়মও চলেছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র মৌলিক দিক থেকে পুঁজিতন্ত্রবিরোধী (কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ভিত্তি রাষ্ট্রীয় পুঁজি, ব্যক্তিগত পুঁজি নয়), কিন্তু ক্ষমতায় যে শ্রেণী, তার দর্শন ব্যক্তিগত পুঁজির দ্রুত প্রসার ও প্রতিপত্তি। কাজেই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র এখানে পুঁজিতন্ত্র-সেবায় নিয়োজিত। উপরোক্ত তিনটি ধারা ভারতের কক্ষপথে পরস্পরবিরোধী প্রবণতা হিসেবে দেখা দিয়েছে, এ ধারণা ভ্রমাত্মক। এই ভ্রম ভারতীয় পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ বিশ্লেষণে বাধা। যদি আমরা মনে রাখি যে, সমস্ত কিছুই ঘটছে পুঁজিতান্ত্রিক পথের মধ্যে (যা বিভিন্ন কাঠামোর মধ্যে একমাত্র বিকাশমান কাঠামো), তাহলে কষ্টকল্পিত অবাস্তবতার অনুশীলন থেকে মুক্ত হতে পারি যে, ভারতে পুঁজিতান্ত্রিক পথের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের অ-শোষক চরিত্রও বিকাশলাভ করছে।

ভারতের পুঁজিতন্ত্র-বিকাশ পথ পর্যালোচনা করলে এ পথের পার্থক্য

ভারত। সাবেকী পুঁজিতন্ত্র অবশ্য এ যুগে সম্ভব নয়। সম্ভব ছিল পুঁজিবাদের উত্থান যুগে এবং সাম্রাজ্যবাদ তথা প্রলেতারিয় বিপ্লবের যুগ উদ্বোধিত হবার আগে। বিংশ শতকে, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে পুঁজিতান্ত্রিক পথ সব জায়গায় একরকম রূপ পরিগ্রহ করে নি। সাধারণভাবে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি হল, বিদেশী পুঁজি তথা নয়া উপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে গড়ে ওঠা পুঁজিবাদ, যা কার্যত সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে নয়া উপনিবেশে পরিণত করে। দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড, চিলি, কেনিয়া, ব্রেজিল প্রভৃতি এই ধরনের রাষ্ট্র। ভারতের পুঁজিতন্ত্র নিয়েছে অন্য পথ, যা আপেক্ষিকভাবে বিদেশী পুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। নয়া উপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় এখানে পুঁজিতন্ত্র বিকাশলাভ করে নি। এ পথ আপেক্ষিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীন পথ। কিন্তু এ যুগে নয়া উপনিবেশ-বাদকে পাশ কাটিয়ে পুঁজিতন্ত্র গড়ে উঠতে পারে না তৃতীয় দুনিয়ায়। এজন্যই "আপেক্ষিক" কথাটা ব্যবহার করছি। তথাচ পুঁজিতান্ত্রিক পথ কোন উন্নয়নশীল দেশেই স্বয়ম্ভরতা রচনার পথ নয়, এ পথ বরং তার বিপরীতমুখী। অধ্যাপক লেডকোভস্কি বলেছেন যে, তৃতীয় দুনিয়ার যে সব দেশগুলি পুঁজিতন্ত্র বেছে নিয়েছে, সেসব দেশগুলি শেষপর্যন্ত নয়া উপনিবেশে পরিণতি লাভ করবে (২)। পৃথিবীতে নবীন পুঁজিতন্ত্র তথা তৃতীয় দুনিয়ার পুঁজিতন্ত্র স্বয়ম্ভরতার পথ নয়। ইওরোপে যেসব দেশে পুঁজিতন্ত্র পূর্ণ বিকশিত হয়েছে, সেই পুঁজিতন্ত্র উন্মেষিত হয়েছিল প্রাক-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র তথা প্রাক-সাম্রাজ্যবাদী যুগে। সে যুগটাও ছিল পুঁজিতন্ত্রের অবিশ্ব বিকাশের যুগ। এ যুগে পুঁজিতন্ত্র নতুন করে পূর্ণ বিকাশের পথ নিতে আর সক্ষম নয়। কাজেই লেডকোভস্কির কথা মেনে নিলে ভারতও শেষ পর্যন্ত নয়া উপনিবেশবাদের প্রভাব-কবলিত হতে বাধ্য, যদি পুঁজিতান্ত্রিক পথ অব্যাহত থাকে।

ভারতে পুঁজিতন্ত্রের পত্তন হয়েছিল উনিশ শতকে। জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও পুঁজিবাদের পত্তন এদেশে সমসাময়িক এবং পরস্পর অন্বিত প্রক্রিয়া। ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রকে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধতা করেই জাগরিত হতে হয়েছিল। কারণ পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক ও ঔপনিবেশিক উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে বিরোধই প্রধান (যদিও ঔপনিবেশিক উৎপাদন-সম্পর্ক শব্দমালা প্রয়োগ হয়ত অসমীচীন)। উপরন্তু সদ্যোজাত পুঁজিতন্ত্রকে

মধ্যস্বত্বভোগী ও মহাজনদের পুঁজিতে পুষ্ট হয়েছিল। স্বভাবতই পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ এক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আশ্রয়ে লালিত হয়েছিল। লেভকোভস্কি লিখেছেন: "ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রের অভ্যুদয়ের মধ্যে স্ফুট ভারতের স্বাধীন বিকাশ প্রয়াস এক শক্তিশালী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল যা দেশজ পুঁজিতন্ত্রকে টিঁকে থাকতে ও আরো শক্তিশালী হতে সহায়তা করেছিল(৩)।" তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের অবিসংবাদী (absolute) বিকাশ হলেও ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রের পরিমাণগত বিকাশ ছিল দ্রুততর এবং এজন্য এ দুয়ের মধ্যে সংঘাত দানা বাঁধে। মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা নিশ্চয়ই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে নি, কারণ জাতীয় বুর্জোয়াদের মত এরা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করে নি। জাতীয় বুর্জোয়াদের উৎপত্তি ঔপনিবেশিক বা পরাধীন দেশের পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ থেকে। এদের মূলনীতি স্বাধীন পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন তথা জাতীয় পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন, যা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের চরিত্রবিরোধী।(৪) অবশ্য উৎপাদনের মালিকানার সঙ্গে যুক্ত নয় অথচ ব্যবসায়িক সূত্রে জাতীয় উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত বুর্জোয়াদেরও জাতীয় বুর্জোয়া বলা চলে। যাই হোক, ভারতে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছে জাতীয় বুর্জোয়ারা, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা নয়। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের ভিত্তি ভারতে দুর্বল হতে থাকে। বিষয়গতভাবে তো বটেই, কারণ একই সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়া ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের দ্রুত বিকাশ একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় চলতে পারে না। বরং দেখা যায় যে, অনেক মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াই জাতীয় বুর্জোয়াতে রূপান্তরিত হয়েছে। টাটা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা জামশেদজী টাটা প্রাথমিকভাবে আফিং ব্যবসায়ে পুঁজি সঞ্চয় করেন। গুজরাটে যারা সুতাকলগুলি গড়ে তুলেছিল, তারা প্রথমে ছিল মুৎসুদ্দি। ভারতে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ স্বভাবতই জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে অন্বিত হয়ে পড়েছিল। জাতীয় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ও ঔপনিবেশিক শোষণের মধ্যে সংঘাত স্বাভাবিক, কারণ বিকাশগতভাবে একে অন্যের বিপরীত। ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় বুর্জোয়াদের মুখ্য ভূমিকার অর্থনৈতিক পটভূমি এটাই। যারা বলে যে ভারতে জাতীয় বুর্জোয়ারা দুর্বল ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা সবল, তারা হয়

আধিপত্যে শতাধিক একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী কখনও গড়ে উঠতে পারে ?

পরাধীন ভারতে জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় এই অর্থনৈতিক বিকাশ পশ্চাৎপটে। বলা বাহুল্য, শোষিত জনগণের সাম্রাজ্যবিরোধিতা ও জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা এক নয়, উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে এবং ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে তার পরিচয় পাওয়া গেছে। যখনই শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে, প্রায় সব সময়েই জাতীয় বুর্জোয়ারা ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের সহায়তায় সেই সব শ্রমিক সংগ্রামকে দমন করতে চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ শ্রেণীস্বার্থে আঘাত লেগেছে যখন, তখন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়ারা ঐক্যের ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছে। জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার এই দিকটি লক্ষ্য করার মত। এ সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা পুঁজিতান্ত্রিক চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত ও তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরাধীন দেশের জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার অভিব্যক্তি কেবলমাত্র সেই সব ক্ষেত্রেই যেখানে সাম্রাজ্যবাদ তাদের পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াদের ক্ষেত্রেও এই দ্বৈত চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে। লেনিন পরাধীন দেশের জাতীয় বুর্জোয়াদের যে দোলাচল-চিত্ততার কথা বলেছিলেন তা এদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা প্রসঙ্গে। এই দ্বৈত ভূমিকা পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এ ধারণা আদ্যন্ত সংশোধনবাদী। এই দোলাচলের মধ্যেই ভারতের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী তার বিকাশপ্রবাহকে অব্যাহত রাখতে পেরেছে। পরাধীন ভারতেই অন্তত দুটি একচেটিয়া পরিবারের আবির্ভাব ঘটেছে—টাটা ও বিড়লা, তৃতীয় দুনিয়ায় এটা ব্যতিক্রম। ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর ধূর্ততা এখানেই। আর এরমধ্যেই ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রের গতিপ্রকৃতি এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের চরিত্র অনুসন্ধান অনিবার্যতা লাভ করেছে।

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ প্রকৃতপক্ষে শ্রমের উপর পুঁজির আধিপত্য ও শোষণের ক্রমবৃদ্ধি, পুঁজি ও শ্রমের সংঘাত তীব্রতর হওয়া। পুঁজিতন্ত্র যত বিকশিত হয়েছে, তত তাদের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঐক্যের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী রূপায়ণে অনীহ হয়েছে। ১৮৪৮-৪৯ সালে ইওরোপে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ব্যর্থতার পরে মার্কস বিশ্লেষণ

ঐতিহ্য থেকে সরে আসছে। 'ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম' গ্রন্থে তিনি এ বিশ্লেষণ করেছিলেন, বিশেষত ফরাসী ও জর্মন বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা থেকে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। জুন ১৮৪৮-এ ফরাসী বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবী ভূমিকাকে বৈজ্ঞানিক বিচার মানদণ্ডে নিরিখ করে মার্কস বলেছিলেন যে, বৈপ্লবিক আন্দোলন ও ইতিহাসগত প্রগতির মূলশক্তি শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য হল অ-সর্বহারা শ্রমজীবী জনশক্তির সংহতি অর্জন। ফরাসী প্রলেতারিয়েত সম্পর্কে সমালোচনাত্মক মন্তব্যে মার্কস বলেছিলেন যে, পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের যথেষ্ট বিকাশ না হবার জন্য ফরাসী প্রলেতারিয়েত ছিল অপরিণত, যে জন্য তার বিপ্লবের প্রথম পর্বে তাদের শ্রেণীগত কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত ছিল না এবং বুর্জোয়া বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন ছিল, ভেবেছিল যে ফেব্রুয়ারী ১৮৪৮-এর বিজয় এমন এক সাধারণতন্ত্রের জন্ম দেবে যা একই সঙ্গে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয় জনগণের স্বার্থ সেবা করবে। তিনি বলেছিলেন, "১৮৪৮ সালের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান ফল জনগণ যা জয় করেছে তা নয়, তারা যা হারিয়েছে সেই বিভ্রান্তি(৫)। মার্কস এই কোড়ো দিনগুলির মধ্যে দিয়ে যে অভিজ্ঞতা পেলেন, তার ভিত্তিতেই বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকা ক্রমনিঃশেষিত হচ্ছে এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনের সম্ভাবনা হারিয়েছে। যদিও ইওরোপীয় বুর্জোয়া সম্পর্কে এ সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত, তবু নতুন ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা কোনও দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীরই ছিল না। তার কারণ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চেহারাও ততদিনে পাল্টে গেছে। যে নতুন ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল, তার নেতৃত্ব দিতে পারে না আর বুর্জোয়া শ্রেণী। ঠিক তেমনি পুঁজিতন্ত্রের যত প্রগতি হবে, তত তার বৈপ্লবিক ভূমিকাও ম্লান হয়ে আসবে। তৃতীয় দুনিয়ার বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষেও তা প্রযোজ্য। মার্কসবাদকে যারা যান্ত্রিকভাবে নেবেন না, বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিশীলতার নিরিখে গ্রহণ করবেন, তাদের কাছে এ অভিমত গ্রাহ্য।

ভারতে কি জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকা ক্রমশ ম্লান হয়ে এসেছে? তথ্য পরিসংখ্যান নিরীক্ষা করে এই অভিমতের সত্যতা-অসত্যতা নিরূপণ করা দরকার। যত দিন গেছে, তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা খর্ব

অধিবেশনে দাবী করলেন : "...all British investments in India be repatriated."(৬) ইনিই ১৪ বছর পরে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের বার্ষিক সভায় বললেন : "...We can build up India quickly only through the help of foreign capital, and since we are an independent nation, I do not see why we should be afraid of it. I feel, therefore, that not only should we allow foreign investment without any restriction but we should welcome it."(৭) স্বাধীনতোর ভারতে বিদেশী পুঁজির দাপট কম উল্লেখযোগ্যভাবে পড়ে নি। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে বিদেশী পুঁজি লগ্নী ২৬৯.৬ কোটি টাকা থেকে ১৫৪২.৮ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। পরাধীন ভারতেও বিশ বছরের সময়সীমায় বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ হার এত বেশী কখনও হয় নি।(৮) পরবর্তীকালেও বিদেশী পুঁজির বিস্তৃতি বৃদ্ধি অব্যাহত থেকেছে। ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে এদের বিক্রয় বেড়েছে ৩০৮৩.৩ কোটি টাকা থেকে ৩৫৮৪.৪ কোটি টাকা (১৬ শতাংশ বৃদ্ধি)। ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৭৪-৭৫এর মধ্যে তাদের মুনাফা ১০১ কোটি টাকা থেকে ৩২০.৮ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে—২০০ শতাংশেরও বৃদ্ধি। বিদেশী পুঁজির শোষণ ক্ষেত্রের বিস্তৃতির আর একটি ক্ষেত্রও রয়েছে, তাহল দেশী পুঁজির সঙ্গে মেলবন্ধন। ১৯৪৫ সালে টাটা ও বিড়লার নেতৃত্বে একটি বাণিজ্য প্রতিনিধি দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যায়। সে বছরই দেখা গেল যে, বিড়লা-ন্যাশনাল, বিড়লা-স্টুডিবেকার প্রভৃতি দেশী-বিদেশী যৌথ প্রয়াসের সূত্রপাত হয়। চল্লিশ দশকেই এই দেশী-বিদেশী পুঁজির মেলবন্ধন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যেমন ১৯৩৯ সালে ১০টি বড় কয়লা কোম্পানীতে ৩৪ জনই ইওরোপীয় ডাইরেক্টর ছিল। ১৯৪১ সালে দেখা গেল ১৭ জন ভারতীয় ও ২৮ জন ইওরোপীয় ডাইরেক্টর। ১৩টি চটকলে ৪১ জনই ইওরোপীয় ডাইরেক্টর ছিল ১৯৩৯এ। ১৯৩৯ এ হল ১১জন ভারতীয় ও ৪৪ জন ইওরোপীয় ডাইরেক্টর।(৯) ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আপসমুখিনতা যে ক্রমশ তীব্র হয় উঠছিল, তার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে অনেক আগেই।

শেষত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের কথা। আগেই বলেছি যে, ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বিকাশ এক উল্লেযোগ্য প্রক্রিয়া। সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ব্যবসায়িক সাফল্যকে ছোট করে দেখার কোন যৌক্তিকতা নেই। প্রথম

ছিল ২৯ কোটি টাকা। ১৯৭৪-৭৫এ ১২১টি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৭২৬১ কোটি টাকায়। তাছাড়া ১৯৭২-৭৩ থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র ক্রমাগত লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে যাচ্ছে। ১৯৭০-৭১ সালে ১১৭টি নির্বাচিত রাষ্ট্রীয় সংস্থার কর প্রদানোত্তর নীট লোকসান ছিল ৩ কোটি টাকা, ১৯৭১-৭২এ লোকসান আর রইল না, ১৯ কোটি টাকা লাভ হল। তারপর থেকে ক্রমাগত লাভ হতে হতে ১৯৭৬-৭৭ এ নীট লাভ ২৪০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেল।(১০) কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র কি পুঁজিতন্ত্রকে এড়িয়ে চলতে পারে? এ ধরনের চিন্তা সংস্কারবাদের নামান্তর। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রধানত ভারী ও মূলধনী শিল্পে প্রাধান্য। ভারী ও মূলধনী শিল্পের উৎপন্ন সামগ্রী মাঝারি শিল্পে উৎপাদনী উপকরণ, যা সম্পূর্ণ বেসরকারী ক্ষেত্র তথা বৃহৎ ও একচেটিয়া পুঁজি কবলিত। কাজেই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করে বেসরকারী পুঁজি। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র পুঁজিতন্ত্রের নিগড়ে বাঁধা। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের উপর জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারতের পুঁজিপতিরাই। আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক শিল্প-অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য শিল্প ও আর্থকরী এলাকায় রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র গড়ে তোলা প্রয়োজন, স্বাধীনতার পূর্বাহ্নে এরা তা বুঝেছিল। ১৯৪৪ সালে 'বম্বে প্ল্যান' দলিলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল: "State control appears to be more important than ownership or management··· Well-directed and effective state control should be fully adequate." রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী যে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, তার সবচেয়ে বড় নিদর্শন হল ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি প্রস্তাবকে অকেজো করে রাখা। তা না হলে ঐ সময়ের পর থেকে একচেটিয়াপতিদের প্রভাব প্রতিপত্তি এরকম বাড়ালো কি করে? এ সম্পর্কে মনোপলি ইনকোয়ারি কমিশন (১৯৬৫) বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছে। তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী বিশ্বব্যাংকের সভাপতি ইউজিন ব্ল্যাককে ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি প্রস্তাব সম্পর্কে লেখেন: "It has given perhaps single fillip to Indian private industry."(১১) মনোপলি কমিশনের রিপোর্ট তা প্রমাণিত করেছে। ভারতের পুঁজিতন্ত্র বিকাশ পথ যে বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক পূর্ব-নির্ধারিত।

অবরোধ করে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র শোষণের বিরুদ্ধে ব্যারিকেড। ১৯৭৫ সালে রেল ধর্মঘটের সময়ে ধর্মঘটী রেল শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর বর্বর নিপীড়ন কি এ ধারণা নস্যাৎ করে না? বরং সেই মৌলিক মার্কসবাদী ধারণার প্রতিই দৃঢ়তর আস্থা জাগায় যে, প্রধান বিবেচ্য হল কোন শ্রেণী ক্ষমতাসীন। অতি সম্প্রতি কুয়ামেত-এ রাষ্ট্রায়ত্ত ই পি আই-এর শ্রমিক শোষণ থেকেও শিক্ষা নেওয়ার আছে। একজন অদক্ষ ভারতীয় শ্রমিক যেখানে পায় প্রতিদিন গড়ে ৪৫ টাকা, একজন অ-ভারতীয় শ্রমিক পায় ১৮০ থেকে ২৪০ টাকা।(১২) সুতরাং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র সম্পর্কে মোহাবিষ্ট হবার কোন কারণ নেই। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র এখনও বেসরকারী (বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প) ক্ষেত্রের পেছনে পড়ে আছে। ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭৪-৭৫এ ১৬৫০টি বৃহৎ ও মাঝারি সংস্থার মোট লাভ (বিক্রয়ের শতাংশ) ১০·৭ থেকে ১১·৪এ দাঁড়িয়েছে। ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭৬-৭৭এ এই শতাংশ ১১৭টি রাষ্ট্রীয় সংস্থায় ৪·৯১ থেকে ৭·২৫এ বেড়েছে।(১৩) অধিকন্তু, এটা মনে রাখতে হবে যে কালো টাকার স্বর্গরাজ্য ভারতে হিসাবের কারচুপি বেসরকারী ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য। তারা কাগজে-কলমে যে মুনাফা দেখায়, আসল মুনাফা তার চেয়ে অনেক বেশী।

সুতরাং পুঁজিতন্ত্রীরা তথা জাতীয় বুর্জোয়ারাই ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ামক। তার বিশ্বস্ত বাহন হিসেবে কাজ করেছে তাদের রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস।(১৩) তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই। ১৯৫৪ সালে ভারতের সংসদ "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ" প্রস্তাব পাশ করল। তারপর আবাদী কংগ্রেসে আরও জোরদার স্লোগান তোলা হল। ১৯৬২ সালে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নেহরু ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের অধিবেশনে বললেন: "Private enterprise is a good thing in India. The suppression of private enterprise was bad." আর সে-বছরই ধনিক-বণিক সংঘে "ফিক্কি"র অধিবেশনে অর্থনৈতিক প্রস্তাবে বলা হল: "The business community is in complete agreement with the socialist objective of the government and there are no two opinions on that score. **There is no fundamental or ideological difference between the business community and the Government.**" (বড় হরফ, সংযোজিত)।(১৪)

ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াদের এই ধূর্ততা যতদিন না আমরা ধরতে পারব

১. "Capitalism in the Third World could develop only as a dependent and subordinate component of the world eonomy which it still is in many respects. The structure of the capitalist sector in the countries of the Third World, the directions. forms and prospects of its evolu.ion are more and more determined not by national conditions but by relations with the world capitalist economy." (Rachik Avakov, Kiva Maidanik & Tatyana Pokatayeva : Possibilities and Limits of Capitalism in the Third World—Social Sciences, No. 4, 1974, p 161. সোভিয়েত ঐতিহাসিক ব্রুতেন্তস্ বলছেন 'dependent capitalism'-এর কথা। তিনি আরও বলেছেন যে, এ ছাড়াও যে দেশগুলি স্বাধীন পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ প্রয়াসী, সেগুলিও বিশ্বব্যাংকের সাহায্য পাচ্ছে, অর্থাৎ পরাধীন পুঁজিতান্ত্রিক পথের আশেপাশে রয়েছে।
(Cf. K. Brutents : Imperialism and the Liberated Countries, Socialism, Theory and Practice, May 1978)

২. Oriental Countries Today (ed : A. Levkovsky and others): Vol I. Introduction by A. Levkovsky, (ISI-USSR Academy of Sciences, 1975).

৩. A Levkovsky : Capitalism in India—Basic Trends in its development. PPH, 1966, p. 328.

৪. "A bourgeoisie that represents commodity and money relations under conditions where labour has not only become a commodity on a wide scale and where commodity and money relations in a colonial or dependent country are utilised by a foreign power (the metropolis) for the exploitation of an enslavad people may be termed as **comrador bourgeoisie.**" (A. Levkovsky : Capitalism in India

৫. Cf. Karl Marx : A biography, Progress Publishers, Moscow, 1973, p 194.

৬. Cf. Asim Chaudhuri : Private Economic Power in India, PPH, 1975, p 194.

৭. Capital, 25.4. 1947.

৮, Cf. Asim Chaudhuri : Private Economic Power in India, opcit. p 52.

৯. Capital, 22.12.1949.

১০. P. Chattopadhyay : Performance of Public Enterprises, Business Standard 18.4.1978.

১১. Cf. Asim Chaudhuri : Private Economic Power in India, Opcit. p 152.

১২. কালান্তর ৫.৮.৫৮

১৩, Cf. P. Chattopadhyay : Performance of Public Enterprises, Opcit ; M. Sinha Roy, Some Aspect of the Corporate Sector in India, Merchants' Chamber of Commerce, Platinum Jubilee Souvenir.

১৪. Cf. Asim Chaudhuri : Prtvate Economic Power in India, pp. 155-157.

বাংলায় চটকল শ্রমিকদের আন্দোলন ঃ আদি পর্ব

দীপিকা বসু

ব্রিটিশ শিল্প-পুঁজির সংস্পর্শে এসে উপনিবেশ ভারতের অর্থনৈতিক জীবন হল বিপর্যস্ত। একদা শিল্পোন্নত ভারতের কুটিরশিল্পগুলির শ্বাসরোধ করে ভারতের বাজার ব্রিটেনের শিল্পজাত পণ্যে ভরিয়ে দেওয়া হল। ব্রিটেনের কারখানাগুলির প্রয়োজনে ভারতকে পরিণত করা হল কাঁচামাল সরবরাহ-কারী দেশে। ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থেই এবং আরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে শোষণ করার তাগিদে কিছু কিছু উন্নততর সমাজবিকাশের উপকরণ ভারতে আমদানী করতে হল—বিশেষ করে রেলপথ ও টেলিগ্রাফের প্রবর্তন ভারতে আধুনিক শিল্পের কথঞ্চিৎ বিকাশে সাহায্য করল।

কিন্তু যেহেতু ব্রিটিশ শিল্পপতিরা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে এদেশে আধুনিক শিল্পের বিকাশের সূচনা করল তাই সেই বিকাশের প্রকৃতি হল বিকৃত, তার গতি ছিল অতি মন্থর। পরিকল্পিত শিল্পবিকাশের মধ্য দিয়ে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তাদের লক্ষ্য ছিল না। লক্ষ্য ছিল আরও পরিকল্পিত-ভাবে, আরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে শোষণ।

এই ঔপনিবেশিক কাঠামোয় সীমিতভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যে শিল্পবিকাশের সূচনা হল বাঙলাদেশের চটশিল্প তার মধ্যে অন্যতম প্রধান। বাঙলাদেশে যে প্রভূত পরিমাণে পাট উৎপন্ন হত তা ব্রিটিশ শিল্পপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমদানী রপ্তানী ব্যবসায়ে পাটের তৈরী চটের ছিল বিশেষ চাহিদা। ব্রিটেনে শ্রমিকদের মজুরীর তুলনায় এদেশের অবিশ্বাস্য সস্তা মজুরীও তাদের উৎসাহিত করল। তাই, ইওরোপীয় পুঁজি ও ইউরোপীয় মালিকানায় হুগলী নদীর ধারে ধারে গড়ে উঠল চটকল। ১৮৫৫ সালে রিষড়ায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল ওয়েলিংটন জুট মিল। এরপর ১৮৬৬

ক্লাইভ জুট মিল, ১৮৭৫ সালে শ্যামনগর জুট মিল, ১৮৭৭ সালে বজবজ ও কামারহাটি মিল। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়াতে ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ফোর্ট গ্লস্টার জুট মিল, ১৮৭৫ সালে শিবপুরে গ্যাঙ্গেস মিল আর ১৮৭৯ সালে হাওড়া ও শিবপুর মিল। ১৮৮১ সালে বাঙলাদেশে প্রায় ১৮টি চটকল চালু হয়। ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী ছিল এই চটশিল্পের কেন্দ্র। ১৮৯৪ সালে এই তিন জেলায় চটকলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৩। এ ছাড়াও ছিল অনেকগুলি জুট প্রেস। চটকলগুলির মালিকানা ও পরিচালনা ছিল সম্পূর্ণভাবে ইওরোপীয়দের হাতে। ম্যানেজিং এজেন্টদের মারফৎ চটকলগুলি পরিচালিত হত। ম্যানেজিং এজেন্ট সংস্থাগুলির মধ্যে প্রধান ছিল অ্যান্ড্রু ইউল অ্যাণ্ড কোম্পানী, বার্ড কোম্পানী, হিলগার্স অ্যাণ্ড কোম্পানী, টমাস ডাফ কোম্পানী, ডারডিন স্কিনার অ্যাণ্ড কোম্পানী, অ্যাণ্ডারসন রাইট অ্যাণ্ড কোম্পানী, কেটেল ওয়েল বুলেন অ্যাণ্ড কোম্পানী ইত্যাদি। নিজেদের স্বার্থকে আরও সুরক্ষিত করে তোলার জন্য চটশিল্পের ইওরোপীয় মালিকরা ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠা করল তাদের সংগঠন—ইণ্ডিয়া জুট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অথবা সংক্ষেপে আই. জে. এম. এ।

এইভাবে ইওরোপীয় পুঁজি ও ইওরোপীয় মালিকানায় যে চটশিল্প গড়ে উঠল তার প্রধান লক্ষ্য ছিল মুনাফা অর্জন আর তাদের এই লক্ষ্যের শিকার হল চটকলের অগণিত শ্রমিক যারা পিতৃপুরুষের জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়ে, গ্রাম থেকে উৎখাত হয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের কল্যাণে দলে দলে এসে ভীড় করল এইসব কলে কারখানায় জীবিকার সন্ধানে। শোষণ ছিল নানাবিধ। কাজের ঘণ্টার কোন সীমা ছিল না। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত তাদের অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত—বিদ্যুতের ব্যবস্থা চালু হবার পর কাজের ঘণ্টা হল আরও বর্ধিত। না ছিল তাদের কোন নির্দিষ্ট ছুটির দিন—এমন কি আহারের জন্য যেটুকু সময় নির্দিষ্ট ছিল তা থেকেও তারা প্রায়ই হ'ত বঞ্চিত। বিনিময়ে মজুরী ছিল একেবারে নগণ্য। প্রয়োজনীয় জিনিসের দামের ঊর্ধগতি সত্ত্বেও তাদের মজুরী ছিল অপরিবর্তিত। এই নগণ্য মজুরীও তারা সম্পূর্ণ হাতে পেত না—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রায় ১৫ দিনের মজুরী হাতে রাখা হত আর নানা কারণে-অকারণে দিতে হত জরিমানা। এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছিল সর্দারের শোষণ। শুধু তাই

ইওরোপীয় মালিক ও তার এজেন্টরা কথায় কথায় পশুর মত শ্রমিকদের ওপর চালাত দৈহিক নির্যাতন।

একদিকে সরকারী সাহায্যপুষ্ট সংগঠিত ইওরোপীয় মালিকগোষ্ঠী, দেশের আইন কানুন আদালত পুলিশ সবই তাদের অনুকূলে আর অন্যদিকে চটশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসলই মালিকদের ঘরে মুনাফা হয়ে জমা হচ্ছিল— না ছিল তাদের সংগঠন, না ছিল কোন আনুকূল্য, না ছিল জীবিকা অর্জনের বিকল্প কোন উপায়। তথাপি, এই প্রতিকূল অবস্থাতেও শ্রমিকরা প্রতিবাদ জানিয়েছে। পশুর মত মুখ বুজে এই অন্যায়কে তারা মেনে নিতে পারে নি।

শিল্পসভ্যতার অগ্রদূত ইংলণ্ডে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের বিকাশ সে দেশের শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে যে অভিশাপ বহন করে এনেছিল, যে অবর্ণনীয় দুর্দশার সৃষ্টি করেছিল এবং তার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত যে প্রতিবাদ তার এক মর্মস্পর্শী চিত্র তুলে ধরেছেন এঙ্গেলস তার গ্রন্থ 'Condition of the working class in England'এ। তিনি দেখিয়েছেন যে শোষণ-ভিত্তিক এই ব্যবস্থায় মালিক আর শ্রমিকের বিরোধ ছিল অনিবার্য। বুর্জোয়া মালিকদের লক্ষ্য ছিল শুধু মুনাফা অর্জন। শ্রমিকদের তারা ব্যবহার করত নিজের সম্পত্তির মত মানুষের মত বাচার কোন অধিকার তাদের ছিল না। কাজেই, আর কিছু নয়, শুধু মানুষের মত বাচতে হলে শ্রমিকদের এই বুর্জোয়া মালিকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না।

এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে শিল্পসভ্যতার সূচনায় এই শোষণব্যবস্থার প্রকৃত চরিত্রটি সম্পর্কে চেতনার অভাবে শ্রমিকদের এই প্রতিবাদ অনেকটাই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, অচেতন। তিনি ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর এই প্রতিবাদ আন্দোলনের কয়েকটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। প্রারম্ভিক পর্বে তাদের এই প্রতিবাদে তাদের আদিম বৃত্তি ও চেতনার প্রকাশ তিনি লক্ষ্য করেছেন। তাদের এই প্রতিবাদের আদি প্রকাশ ঘটেছে অপরাধ প্রবণতায় —চৌর্যবৃত্তিতে। কঠোর অমানুষিক পরিশ্রম করেও তাদের অবর্ণনীয় দুর্দশা আর তারই পাশে পরশ্রমজীবী বুর্জোয়াদের প্রাচুর্যের কারণ তারা গভীর

তারা চুরি করতে শুরু করেছে। এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, কিভাবে যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের সংখ্যাও বর্ধিত হয়েছে।

যখন শ্রমিকরা উপলব্ধি করেছে যে, অপরাধের মধ্য দিয়ে তাদের এককে প্রতিবাদ সমগ্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সফল হতে পারে না কারণ সমগ্র সমাজ অপরাধীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে—তখন তারা সমষ্টিগতভাবে যন্ত্র ভাঙ্গার আন্দোলন করেছে—কারণ তাদের মনে হয়েছে যে কারখানার যন্ত্রই তাদের দুর্গতির মূল কারণ—তারা সংগঠিত করেছে লুডাইট আন্দোলন। কিন্তু এই আন্দোলনও ছিল বিচ্ছিন্ন, কয়েকটি মাত্র কারখানায় সীমাবদ্ধ। সমাজের সমগ্র শক্তি তাদের এই প্রচেষ্টাকে চূর্ণ করেছে—কারখানায় যন্ত্রের ব্যবহারকে তারা রুখতে পারে নি।

কাজেই প্রতিবাদের নতুন পথের সন্ধান তাদের করতে হয়েছে। প্রথমে তারা গড়ে তুলেছে গোপন সমিতি। এই সমিতিগুলি কিছু কিছু আন্দোলনও সংগঠিত করেছে কিন্তু বড় কিছু অর্জন করতে পারে নি—তাদের গোপনতাই তাদের সম্প্রসারণের পথকে করেছে রুদ্ধ।

শ্রমিক আন্দোলনের পরবর্তী স্তর হল বুর্জোয়াদের অত্যাচার ও অবহেলার বিরুদ্ধে প্রতিটি শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্য নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। ন্যায্য মজুরী প্রভৃতির দাবী নিয়ে এই ট্রেড ইউনিয়নগুলি যে আন্দোলন গড়ে তুলল রাষ্ট্রশক্তির আনুকূল্যপুষ্ট বুর্জোয়া মালিকদের শক্তির কাছে প্রথমদিকে তা বারেবারেই পরাজিত হয়েছে। তবে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের চেতনা আরও অগ্রসর হয়েছে এবং বুর্জোয়াদের সম্পর্কে তাদের ঘৃণা হয়েছে আরও তীব্র। অনেক ক্ষেত্রে তারা বুর্জোয়া মালিকদের হত্যা করার, কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটাবার প্রচেষ্টা করেছে। এই ট্রেড ইউনিয়নগুলি সারা ইংলণ্ড জুড়ে মালিকদের বিরুদ্ধে ধর্মঘট আন্দোলন সংগঠিত করেছে। শ্রমিকরা আরও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছে।

অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ শ্রমিকরা ক্রমশঃই অনুভব করেছে যে বুর্জোয়াদের শক্তি চূর্ণ করতে হলে শুধু নিজেদের দাবী আদায় নয়, রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করতে হবে—তাই রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের দাবীতে তারা গড়ে তুলেছে চার্টিস্ট আন্দোলন—বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক প্রাধান্যকে তারা আঘাত করতে অগ্রসর হয়েছে। চার্টিস্ট আন্দোলনের লক্ষ্য হল সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা

শ্রমিকরা সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে এবং শুধু নিজের দেশে নয় দুনিয়াজোড়া বুর্জোয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে তারা সামিল হয়েছে।

এঙ্গেলসের এই বিশ্লেষণ আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিবাদ আন্দোলনের ধারাটিকে অনুসরণ করতে বিশেষ সাহায্য করে। অবশ্য আমাদের দেশে গোড়ার যুগে শ্রমিকদের এই প্রতিবাদ প্রতিরোধের অনেক তথ্যই আজ হারিয়ে গেছে। তথ্যের স্বল্পতা হেতু কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র আজ আমাদের কাছে নেই তবু এখানে ওখানে বিচ্ছিন্নভাবে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, মালিকদের এই নানাবিধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা প্রতিবাদ জানিয়েছে নানাভাবে, নানা ভাষায়। এদেশেও দেখি, গোড়ার যুগে তাদের চেতনার স্তর উন্নত না হওয়ার জন্য তাদের প্রতিবাদ আন্দোলনে আদিম বৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে। অবশ্য স্থান, কালের তারতম্য হেতু তার অভিব্যক্তির মধ্যে রয়েছে অনেক পার্থক্য। অভাব অনটনের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে শোষণের প্রতিভূ যাকে তারা সামনে পেয়েছে, মিলের এজেন্ট বা হেড ক্লার্ক—তাকেই তারা আঘাত করেছে। কখনও তাদের সঞ্চিত অসন্তোষ নির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়াই ফেটে পড়েছে আবার কখনও বা তা সাম্প্রদায়িকতার রূপ নিয়েছে। আবার কখনও বিশেষ কোন সংগঠন ছাড়াই শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার ধর্মঘটে তারা সামিল হয়েছে।

আমার এই প্রবন্ধে চটশিল্পে গোড়ার যুগে, ১৮৯৫-১৬ সাল পর্যন্ত তাদের প্রতিবাদ আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করব।

চটকল মালিকদের শোষণ ছিল নানাবিধ আর তার বিরুদ্ধেই শ্রমিকরা বারেবারে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে। বিরামহীন সুদীর্ঘ কাজের সময় চটকল শ্রমিকদের অসন্তোষের এক বড় কারণ ছিল। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত দিনের আলোকের প্রতিটি মুহূর্ত তাদের কাটত কারখানার শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশে—না ছিল কোন অবসর, না ছিল কোন নির্দিষ্ট ছুটি। বিদ্যুতের ব্যবহার চালু হবার পর কাজের ঘণ্টা আরও বর্ধিত হল—ভোর ৪-৩০ মিঃ থেকে রাত্রি ৮-৩০ মিঃ পর্যন্ত। চটকলে প্রচলিত শিফট প্রথা ছিল শ্রমিক প্রতারণার এক সুন্দর কৌশল। সরকারী রিপোর্টে জানা যায় যে, ১৮৯২/৯৩ সালে যখন

করা হয় তখন শ্রমিকরা তা বাধা দিতে ধর্মঘটের ডাক দেয় এবং শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষকে সেই পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়।

বরাহনগর জুট মিলের ১১ জন মুসলমান তাঁতীকে সেয়ালদার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দাঙ্গা ও অবৈধ সমাবেশের অভিযোগে ঐ মিলের কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত করে ১৮২৯ সালের ২৬শে মার্চ। আদালতে কর্মীদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, মুসলমানদের পবিত্র পরব রমজানের সময় প্রার্থনার জন্য দিনের মধ্যে অল্প সময় ছুটি দিতে কর্তৃপক্ষের অসম্মতি ও দৈহিক পীড়নই হল শ্রমিকদের অসন্তোষ ও ধর্মঘটের মূল কারণ। ঐ চটকলের এক তাঁতী জগু তার সাক্ষ্যে বলে যে, সোমবার রমজানের তৃতীয় দিনে যখন জগু ও অপর একজন তাঁতী তাদের প্রার্থনা করছিল তখন "তাঁতী সাহেব" এসে জগু শিকদার গালে চড় মারে এবং তারপর আলি মহম্মদ ও রাহিম বক্সের কাছে গিয়ে তাদের প্রার্থনা থেকে তুলে কাজ করতে বাধ্য করে। পরের দিন যখন তারা বড় সাহেবের কাছে অভিযোগ জানাতে যায় তখন "তাঁতী সাহেবের" পরামর্শমত বড় সাহেব কারখানার চত্বরে প্রার্থনা করা চলবে না এবং সেইজন্য ছুটি দেওয়া হবে না বলে তাদের সবাইকে বিদায় করে দেন। পরের সোমবার যখন তারা বেতন নিতে যায় তখন তারা তাদেরই সহকর্মী নসরথকে পুলিশ বেষ্টনীতে দেখে। তারপর সকলের বেতন পাওয়া হয়ে গেলে বড় সাহেব সকলকে থানায় নিয়ে যাবার জন্য পুলিশকে বলেন। প্রায় ১০০ জন শ্রমিক থানায় গিয়ে পুলিশ, বাবু সিং ও ও জমাদার প্রত্যেককে ১টি করে টাকা দিয়ে তবে ছাড়া পায়, ২ জন শ্রমিক তখনও আটক থাকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কর্তৃপক্ষের এই অন্যায়ের প্রতিবাদেই ১৩ই মার্চ বরাহনগর জুট মিলের প্রায় ৩০০ মুসলমান শ্রমিক ধর্মঘট করে এবং পুলিশের সহায়তায় কর্তৃপক্ষের জুলুমই শ্রমিকদের উত্তেজনার কারণ। কিন্তু আইনের চোখে মালিকদের কোন অপরাধই অপরাধ বলে গণ্য হত না। তাই আদালতের বিচারে দুজন অভিযুক্তকে ১ মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড ও সেই সঙ্গে জরিমানা দেবার আদেশ দেওয়া হয়। অন্যরা মুক্তি পায়। পরে অবশ্য আপীলে ঐ ২ জনের দণ্ড মকুব করা হয়।

কারখানার অস্বাভাবিক পরিশ্রমকে কেন্দ্র করেই ১৮২৩ সালের অক্টোবর মাসে শিবপুর জুট মিলে শুরুতর দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ধর্মঘট সংগঠিত হয়। মিলের

মঙ্গলবার ২২শে অক্টোবর ঐ মিলের ২৫০ জন শ্রমিক তাঁর দেহে ও মাথায় মুগুর, বাঁশ ও মাকু নিয়ে গুরুতরভাবে আঘাত করে। পুলিশ কয়েকজন দাঙ্গাকারীকে গ্রেপ্তার করে। ফলে বাকী ২০০ শ্রমিক কাজ বন্ধ করে এবং তাদের ধর্মঘটের জন্য সাময়িকভাবে কারখানা বন্ধ রাখতে হয়। মিঃ ক্রেক ও অন্যান্য ইওরোপীয় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত শ্রমিকদের পাল্টা অভিযোগে শ্রমিকদের অসন্তোষ ও উত্তেজনার প্রকৃত কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। শ্রমিকরা তাদের অন্যায়ভাবে আটক রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত করে জানায় যে, ঐ কারখানার শ্রমিকদের প্রত্যহ ভোর ৫ ৫০ মিঃ থেকে রাত্রি ১টা পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য করা হয়। এই দুঃসহ পরিশ্রমে অপারগ হয়ে তারা সোমবার রাত্রি ৮টার সময় কাজ বন্ধ করলে পরের দিন মিঃ ক্রেক শাস্তিস্বরূপ তাদের দুপুরের আহারের জন্য ১ঘণ্টা ছুটি বন্ধ করার চেষ্টা করেন এবং তার প্রতিবাদেই শ্রমিকরা ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়। কাজ বন্ধ করে যখন তারা সদলে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসতে চায় তখন মিঃ ক্রেক ও অন্য কয়েকজন কর্মী যাঁরা পথে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা আহত হন। ধর্মঘটের ফলে কারখানা কয়েকদিন বন্ধ থাকলেও মালিকরা ক্ষমতার জোরে নতুন শ্রমিক নিয়োগ করে কারখানা চালু করে। আর বিচারে অভিযুক্ত শ্রমিকদের ৬ মাস থেকে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড, জরিমানা আর শান্তি রক্ষার গ্যারান্টি হিসাবে ১০০ টাকা করে জামিন রাখতে হয়।

অবিশ্বাস্য রকমের স্বল্প মজুরী, প্রয়োজনীয় জিনিসের ঊর্ধ্বগতি সত্ত্বেও মজুরী অপরিবর্তিত থাকা এবং তার উপর কারণে-অকারণে জরিমানা আদায়ের বিরুদ্ধেও শ্রমিকরা প্রতিবাদ জানিয়েছে বারেবারে। হুগলী জুট মিলের প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ দেশীয় শ্রমিক চালের প্রচণ্ড দর বৃদ্ধির জন্য মজুরী বৃদ্ধির দাবী জানায় কিন্তু তাদের এই দাবী প্রত্যাখ্যাত হলে তারা ১৮৯২ সালের ১১ই নভেম্বর একযোগে কাজ বন্ধ করে এবং কারখানার বাইরে জড় হয়ে অন্য শ্রমিকদেরও কাজে যেতে বাধা দেয়। ম্যানেজারের অনুরোধে পুলিশ ডেপুটি কমিশনার মিঃ বার্নার্ড ও সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ মিলার্ড পুলিশ-বাহিনী নিয়ে কারখানায় উপস্থিত থেকে শান্তি রক্ষা করেন।

ছোট আকারের চট বোনার শর্তে বড় আকারের চট বোনার আদেশের প্রতিবাদে হাওড়া জুট মিলের প্রায় ৬০০ তাঁতী ১৮৯৩ সালের নভেম্বর মাসে

যোগ দিলেও মুসলমান শ্রমিকরা ধর্মঘট চালিয়ে যায় এবং তাদের গতিবিধি যথেষ্ট আশংকার সৃষ্টি করে। কিন্তু বড় রকমের কোন ঘটনা ঘটবার আগেই স্থানীয় পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কাজে অবহেলা করায় ৬ জন শ্রমিককে জরিমানা করার প্রতিবাদে উল্টোডাঙ্গা জুট মিলের শ্রমিকরা ১৮২৫ সালের জানুয়ারী মাসে ধর্মঘট করে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের ধর্মঘটে যোগ দিতে প্ররোচিত করে, ফলে তাঁত বিভাগের কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। উক্ত ৬ জন শ্রমিককে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়।

বকরিদের দিন অনুপস্থিতির জন্য কিছু মুসলমান শ্রমিকের বেতন বন্ধ করা হলে ১৮২৫ সালের এপ্রিল মাসে ঐ মিলের মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। হিন্দু শ্রমিকদেরও তারা কাজে যেতে বাধা দেয়। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পুলিশ হাঙ্গামার নায়কদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করলে সমস্ত মুসলমান শ্রমিক একযোগে কাজ বন্ধ করে এবং ইট, বাঁশ নিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করে। ফলে একজন পুলিশ গুরুতর আহত হয়। উত্তেজিত শ্রমিকদের হাত থেকে তার জীবন রক্ষা করতে শেষ পর্যন্ত বন্দুক ছুঁড়তে হয়।

মজুরী হ্রাস করার প্রতিবাদে ১৮৯৫ সালের জুন মাসে কাঁকিনাড়া জুট মিলের সুতাকাটা বিভাগের শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে এবং অন্যান্য বিভাগের শ্রমিকদেরও কাজে যেতে বাধা দেয়। ১৭-১৮ই জুন সুতাকাটা বিভাগের সাহেব শ্রমিকদের তিন সপ্তাহের বকেয়া বেতন দিতে অস্বীকার করেন এবং প্রত্যেক শ্রমিকের মজুরী থেকে চার আনা করে কেটে নেওয়া হলে শ্রমিকরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কটু-ভাষার সঙ্গে কিছু হাতাহাতিও হয়। সাহেব উপর তলা থেকে পিস্তল ও তলোয়ার দেখিয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেন। তখন প্রায় ২০০০ শ্রমিক একত্র হয়ে সাহেবকে মারতে উদ্যত হয়। নৈহাটি থানার পুলিশ অবস্থা আয়ত্তে আনতে ব্যর্থ হলে ব্যারাকপুর থেকে সশস্ত্র পুলিশ আনা হয়। জেলা সুপারিন্টেনডেন্ট ও ম্যাজিস্ট্রেটও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। পাঁচজন হাঙ্গামাকারী—নাসের আলি খান, সালাবৎ খান, ছোট জুম্মান, বড় জুম্মান ও অপর একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে প্রায় ৩০০০ শ্রমিক তাদের মুক্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় এবং

সালের অক্টোবর মাসে গার্ডেনরীচে ক্লাইভ জুট মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে এবং পুলিশের সহায়তায় কর্তৃপক্ষ কারখানায় শান্তি বজায় রাখেন।

বরাহনগর জুট মিলের শ্রমিকরা ১৮৯৬ সালের ৩০শে মার্চ তাদের মজুরী না বাড়ানো পর্যন্ত কাজ করতে অস্বীকার করে ধর্মঘটে সামিল হয়। ম্যানেজার মিঃ ম্যাকফারসন যখন একজন মিলবাবুকে নিয়ে তাদের অভিযোগের তদন্ত করতে আসেন তখন তারা মিলবাবুকে প্রচণ্ড প্রহার করে এবং কারখানার দিকে ইঁট, পাথর ছুঁড়তে থাকে। পুলিশ দাঙ্গাকারী বিশ্ব শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে। পরের দিন বরাহনগর নর্থ ফ্যাক্টরীর শ্রমিকরাও ধর্মঘট করে। ৪ঠা এপ্রিল নর্থ ও সাউথ মিলের সমস্ত ধর্মঘটী শ্রমিক কারখানার দরজায় জড় হয়ে বকেয়া বেতন দাবী করে। পুলিশের হস্তক্ষেপে বড় কোন ঘটনা ঘটে না। দুটি কারখানার ৫০০ শ্রমিকের মধ্যে ১২০ জন বাদে বাকী সকলে ধর্মঘট চালিয়ে যায় প্রায় এপ্রিল মাসের শেষ পর্যন্ত। বজবজ জুট মিলের সূতাকাটা বিভাগের কয়েক শত শ্রমিক একই দাবীতে ৮ই জুন, ১৮৯৬ সাল থেকে প্রায় সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘট করে। প্রথমে তারা কারখানার ম্যানেজারের কাছে মজুরী বৃদ্ধির আবেদন করে। তাদের আবেদন প্রত্যাখাত হলে তারা ধর্মঘট করে। অবিলম্বে কাজে যোগ না দিলে তাদের সমস্ত বকেয়া বেতন বাজেয়াপ্ত হবে, ম্যানেজারের এই ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও তারা দৃঢ়তার সঙ্গে ধর্মঘট চালিয়ে যায়।

শ্রমিকদের জীবনের আর এক বিভীষিকা হল সর্দার আর সর্দারের শোষণ। বিদেশী মালিকরা তাদের অনুগ্রহপুষ্ট সর্দারদের মারফৎই দেশীয় শ্রমিকদের সংগ্রহ করত এবং তাদের উপরই ছিল শ্রমিক পরিচালনার ভার। সর্দাররা তাদের এই বিশেষ অবস্থাটির সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করত এবং নানাভাবে নানা অজুহাতে শ্রমিকদের কাছ থেকে দস্তুরী আদায় করে শ্রমিকদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলত। এই অত্যাচারী সর্দারদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ছিল গভীর অসন্তোষ আর তাই বারেবারে তারা কর্তৃপক্ষের কাছে সর্দারদের অপসারণের দাবী জানিয়েছে এবং ব্যর্থ হয়ে সামিল হয়েছে ধর্মঘটে।

শ্যামনগর জুট মিলের তাঁতীরা তাদের প্রধান সর্দার ও সময় রক্ষকের অপসারণের দাবীতে ১৮৮১ সালের ১২শে ডিসেম্বর কাজ বন্ধ করে এবং

কাজে যোগ দেবে না। ঐ দিন ভোরে প্রায় ৫০০ শ্রমিক কারখানার দরজায় মিলিত হয়ে অত্যাচারের প্রতীক ঐ সর্দার ও সময় রক্ষককে আক্রমণ করে।

এক বাবু সুপারভাইজার ও দ্বাররক্ষী দারোয়ান অন্যায়ভাবে জোর করে শ্রমিকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করার ফলে ঘুসুড়ীর সেন্ট্রাল জুট মিলের শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ১৮২০ সালের জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ধর্মঘটের মধ্যে পরিণতি লাভ করে। শ্রমিকরা ঐ দুজনের অপসারণের দাবী জানায় এবং দাবী পূরণ না হলে ধর্মঘটের হুমকী দেয়। ম্যানেজার মিঃ ফলকনার (Falconer) তাদের অভিযোগগুলির প্রতিকার করার প্রতিশ্রুতি দিলেও শ্রমিকরা তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে একযোগে কারখানা ত্যাগ করে। ম্যানেজার আবার শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশের শরণ নেন। গোল-যোগের সংবাদ পেয়ে কারখানার ম্যানেজিং এজেন্ট মেসার্স অ্যান্ড্রু ইউল অ্যাণ্ড কোম্পানীর মিঃ ডি ইউল কারখানা পরিদর্শনে আসেন। ধর্মঘটী শ্রমিকরা তাঁর গাড়ী ঘিরে ফেলে তাদের অভিযোগ পেশ করে। ম্যানেজার মিঃ ফলকনার যখন মিঃ ইউলের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে আসেন তখন শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে মার! মার! বলে চেঁচিয়ে ওঠে এবং তাঁর দিকে কিছু ইটকও বর্ষিত হয়। মিঃ ফলকনার ভীত হয়ে দরোয়ানদের ঘরে আশ্রয় নিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। পুলিশ ধর্মঘটী শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে। ১৪ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। আদালতে ৯ জনকে ১৫ টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। উপরন্তু ৬ মাস কারখানার শান্তি ভঙ্গ না করার প্রতিশ্রুতিতে প্রত্যেককে ৫০ টাকার জামিন রাখতে হয়। ঔপনিবেশিক কাঠামোয় আদালত, বিচার সবই ছিল প্রহসন— হতভাগ্য শ্রমিকদের অভিযোগের ন্যায্য বিচার পাবার কোন পথই খোলা ছিল না। কুলি সর্দারের অত্যাচার ও শোষণের প্রতিবাদে ও তার অপসারণের দাবীতে ১৮২৫ সালের মে-জুন মাসে বজবজ চটকলের প্রায় ৭০০০ শ্রমিক বিক্ষোভ ও ধর্মঘট সংগঠিত করে যার ফলে প্রায় ৬ সপ্তাহ কারখানা বন্ধ রাখতে হয় এবং মালিকদের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৮০,০০০ টাকা।

কেবলমাত্র অভাব অনটন ও অর্থনৈতিক দাবী আদায়ের জন্যই নয়,

ঐক্য ও সংহতির শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ চেতনা না থাকলেও, কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এই অপমানজনক ব্যবহারের, মনুষ্যত্বের এই লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়িয়েছে। বরাহনগরের কামারহাটি জুট মিলের এক দেশীয় কর্মীকে মিঃ রীড নামে এক ইওরোপীয় কর্মী আঘাত করায় ঐ মিলের প্রায় ৩০০০ দেশীয় কর্মী ১৮৯১ সালের ১২শে মে প্রচণ্ড উত্তেজনায় ফেটে পড়ে এবং কাজ বন্ধ করে সকলে একত্র হয়ে মিঃ রীডকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। শঙ্কিত মিঃ রীড ম্যানেজারের শরণাপন্ন হন। ম্যানেজারের আহ্বানে পুলিশ অবস্থা আয়ত্তে আনে। কিন্তু শ্রমিকরা সুযোগমত প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়। তাদের মনোভাব উপলব্ধি করে ম্যানেজার মিঃ লরেন্স ভবিষ্যতে তাদের উপর কেউ উৎপীড়ন করলে কঠোর ব্যবস্থা নেবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে শ্রমিকরা কাজে যোগ দেয়।

১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাসে গার্ডেনরীচে হুগলী জুট মিলের প্রায় ৪০০ তাঁতীর ধর্মঘট শ্রমজীবী মানুষের সংহতিবোধের বিকাশের ইঙ্গিত বহন করে। ধর্মঘটী শ্রমিকদের দাবী হল দুজন বরখাস্ত শ্রমিককে কাজে পুনর্বহাল করা এবং এই দাবী পূরণ না হলে তারা কাজে যোগ দেবে না বলে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয়। এই সংহতিবোধের স্ফুরণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কারণ কালপর্যায়ে এই সংহতিই শ্রমিকশ্রেণীকে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের যোগ্যতা দান করেছে।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, কারখানা শিল্প গড়ে ওঠার প্রারম্ভিক পর্বে শ্রমিকদের এই বিক্ষোভ প্রতিবাদ অনেকটাই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত—চেতনার অভাবে, সংগঠনের অভাবে এই আন্দোলনে তাদের আদিম চেতনার প্রকাশ ঘটেছে বারেবারে। নৈনন্দিন জীবনের শোষণ লাঞ্ছনা, বঞ্চনা তাদের সমগ্র মানসিকতাকে তিক্ত করে তুলেছিল। তাই তাদের অসন্তোষ কখন কখনও যেমন দৈহিক পীড়নের পথ নিয়েছে তেমনি কখনও আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ফেটে পড়েছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এদেশে কারখানা শিল্প গড়ে ওঠার সূচনা থেকেই শোষণভিত্তিক এই ব্যবস্থায় শ্রমিক মালিকের অনিবার্য বিরোধটি আত্মপ্রকাশ করেছে নানাভাবে। ইওরোপীয় মালিক পরিচালিত চটকলগুলির পরিবেশ ছিল 'আদর্শ' এবং শ্রমিকরা ছিল সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট—এই ধারণা যে ভিত্তিহীন

শ্রমিকরা তখনও দুর্বল। দেশের শাসন, বিচার, আইন, আদালত, এক কথায় সমগ্র ব্যবস্থাটিই ছিল মালিকদের স্বপক্ষে। তাই বারেবারেই মালিকরা পুলিশের সাহায্য নিয়ে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী আদায়ের আন্দোলনকে দমন করতে অগ্রসর হয়েছে। তবু কিন্তু শ্রমিকরা তাদের মনোবল হারায় নি। শুধু তাই নয়, শ্রমিকদের গোড়ার যুগের এই আন্দোলনগুলি একেবারে ব্যর্থ হয় নি। এই আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছে। তারা উপলব্ধি করেছে যে কেবলমাত্র কয়েকজন শিল্পপতির বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম নয় তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী এই ব্যবস্থাটিকেই পরিবর্তন করতে হবে—শ্রমিকদের রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করতে হবে। আর এই উপলব্ধির মধ্য দিয়েই শ্রমিকদের সংগ্রাম আজ উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়েছে।

অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ বুদ্ধিজীবী

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

জনমানসে বুদ্ধিজীবীর সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকা একটা আপাত-প্রহেলিকায় আচ্ছন্ন। ঐতিহাসিকভাবে এর কারণ এই যে এদের নিজস্ব শ্রেণী-চরিত্র নেই। যে স্তর থেকে এরা উদ্ভূত মূলতঃ সেই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেও, এরা আলোকপ্রাপ্তির সুযোগে ও বাষ্টি-চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে প্রায়শঃই শ্রেণী অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে দোদুল-চিত্ততার পরিচয় দেয়। এই দোদুল-চিত্ততা পরিস্ফুটতর হয় শ্রেণীসংগ্রাম যখন উত্তুঙ্গ এবং সমাজবিপ্লব আসন্ন বা বিপ্লবের ভূমিকম্পে সমাজের পায়ের তলায় মাটি ফাটছে, বহুধা-দীর্ণ হচ্ছে, সেই সময়।

সমাজ-চিন্তার অগ্রপথিক বলে এরা নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে; বিশেষ করে সৃজন কর্মে যারা যুক্ত বুদ্ধিজীবীদের সেই অংশ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম বলে শ্রেণী ধ্যানধারণা, নিজস্ব চেতনা এবং সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী সুবিধাজনক পক্ষাবলম্বন করে। ইতিহাসে দেখা গেছে যে, ঠিক এইসব কারণেই আবার আসন্ন সমাজবিপ্লবে এদের কেউ কেউ বা অংশবিশেষ নবোদ্ভোষিত শ্রেণীর মতাদর্শ গ্রহণ করে থাকে। যেমনটা ঘটেছিল সামন্ততন্ত্রের অবসানের যুগে, অভিজাত শ্রেণী উদ্ভূত বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশই আসন্ন বিপ্লবের চালিকা শক্তি হিসেবে বুর্জোয়াদের চিনে নিয়েছিল এবং বুর্জোয়া বিপ্লবের তত্ত্ব-রূপকার রূপে দেখা দিয়েছিল।

ঠিক একইভাবে, বুর্জোয়া শ্রেণী উদ্ভূত বুদ্ধিজীবীরাই শ্রেণী-নির্বিশেষী সমানাধিকার বা সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব বা মতাদর্শ সৃষ্টি ও প্রচার করেছিল। কিন্তু হয় অবৈজ্ঞানিকতা, অথবা চালিকা-শক্তিকে চিনে নেওয়ার ভুল, পথ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা, ইতিহাসের ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা ব্যক্তিগত অভিমান, তত্ত্বের প্রয়োজন সম্পর্কে অজ্ঞানতা ও অন্ধতা অনেককেই শেষ পর্যন্ত

The Great October Revolution and the Intelligentsia of [illegible]

নিয়ে আসতে পারে নি। এবং সেটা পেরেছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। তাঁরা একদিকে প্রলেতারিয় বিপ্লবের তত্ত্বের রূপকার আবার অন্যদিকে বিপ্লবের পথ প্রস্তুতকারকও তাঁরাই। অগ্রগামীবাহিনী হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির স্রষ্টাও তাঁরা। তাঁদের নির্ভুল তত্ত্ব ও সঠিক ব্যবহারিক পথনির্দেশের ফলেই কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বিশ্ববিজয়ী বাহিনী।

একই সঙ্গে তাদের সবলতা ও দৌর্বল্য বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে নানা ভ্রান্ত ধারণার ও তত্ত্বেরও সৃষ্টি করছে। বিপ্লবের শক্তিগুলিকে বিভ্রান্ত করার জন্য এইসব ধারণা বিপ্লবের শত্রুদের বহুল ব্যবহৃত ও প্রয়োজনীয় অস্ত্র। অতএব বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে যেমন দেশের সামাজিক অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ দরকার, বিভিন্ন স্তরের শ্রেণীবিন্যাস ও সম্ভাব্য শ্রেণী-অবস্থান পর্যালোচনা করা অতীব প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পূর্ববর্তী বিপ্লবের ইতিহাস থেকে অভিজ্ঞতা আহরণ। আর এই শেষের ক্ষেত্রটিতে অক্টোবর মহাবিপ্লবের থেকে শিক্ষাগ্রহণ ছাড়া শ্রেষ্ঠতর পথ কী থাকতে পারে!

২

প্রাসঙ্গিকভাবেই মনে পড়ে যায় আলেক্সি তলস্তয়ের কালজয়ী 'ত্রয়ী' উপন্যাস 'অরডিয়াল', এর কথা। বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের সময়কার ইতিবৃত্তকে লেখক ধরে রেখেছেন বুদ্ধিজীবীর চোখ ও জীবন দিয়ে দেখা ও উপলব্ধ সত্যের চেহারায়। এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে ওঠে নি। বিপ্লবই এখানে নায়ক, প্রধানতম চরিত্র। বিপ্লবকে কেন্দ্র করে চরিত্রগুলি ঘুরেছে ফিরেছে, পক্ষাবলম্বন করেছে, দীর্ণ হয়েছে, ফেটে পড়েছে। রিক্ত আর হতাশ্বাস জীবনে আবার নববসন্তের মুকুল ধরেছে।

ইতিহাস যেখানে প্রমত্ত, মুহূর্ত যখন সহস্র বৎসরকে বিধৃত করে, সেই প্রচণ্ড গতির বন্যায় দিশেহারা যারা তাদের পাশাপাশি যারা সুস্থিতচিত্ত, ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করতে পারে এমন চরিত্রের বিকাশের মধ্য দিয়ে এই মহাকাব্যিক উপন্যাস সমগ্রকে বেঁধেছে।

রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরে বিপুল বুদ্ধিজীবী জনতার বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিপ্লব ও বিপ্লবের শক্তিকে বিচার করেছিল এবং

অবস্থান নিয়েছিল। দৃষ্টিকোণের সুবিপুল পার্থক্য ও অবস্থানের মেরু-দূরত্ব সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার কয়েকটি সামান্য লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়।

যেমন অরভিয়ালের কেন্দ্র চরিত্র তেলেগিন ও রশ্চিন। বিপ্লবের আগে থেকেই কারখানার মজুরদের প্রতি সহমর্মীতা তেলেগিনকে স্বাভাবিক-ভাবেই বিপ্লবের পক্ষাবলম্বী করেছে। আবার আরেক মুখ্য চরিত্র রশ্চিন তার শ্রেণী-অবস্থান, পারিবারিক ও সামাজিক পরিচয় ও শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পক্ষাবলম্বন করেছে বিপ্লবের শত্রুবাহিনীর। অথচ তার ব্যক্তি-সত্তা বহুধা-দীর্ণ। কেননা একসময় তার মনে এই প্রশ্ন এসেছে তার মাটি মা-কে কি সে এই পথেই রক্ষা করতে পারবে, হারিয়ে যাওয়া প্রিয়াকে সে ফিরিয়ে আনতে পারবে জীবনে?

কিন্তু এর বাইরেও একটা প্রবণতা ছিল, যে ধারার অনুগামী ছিল এক বিশালসংখ্যক বুদ্ধিজীবী জনতা, বিশেষ করে যারা পেটিবুর্জোয়া শ্রেণী থেকে উদ্ভূত। এরা যেমন বিপ্লবের পক্ষাবলম্বন করে নি, তেমনি এর বিরুদ্ধেও যায় নি। এদের অবস্থানটা ছিল অনেকটা এইরকম যে যেহেতু এই বিপ্লব জনগণের বিপ্লব, শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লব, অতএব বিপ্লবের পরে দেশ গঠনের কাজে তারা জনগণ-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করতে পারে না, পরন্তু শ্রমিক-কৃষকের বিপুল প্রাধান্যের প্রতি তারা অসংশয় হয়ে এগিয়ে এসে বিপ্লবোত্তর পুনর্গঠনে অংশ নিতেও পারে না।

এই সব প্রবণতার উৎপত্তির উৎস খুঁজতে হবে আরও পিছনে, বিশেষ করে ১৯০৫-০৭ সালের রুশ বিপ্লবের মধ্যে। ১৯০৫-০৭ সালের রুশ বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের শ্রেষ্ঠতম অংশের প্রতিনিধিদের অনেকেই এই বিপ্লবের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন নতুন শক্তি প্রলেতারিয়েতের অভ্যুদয়। তারা এই শক্তিকে অভিনন্দন জানিয়েই কাজ শেষ করেন নি। পরন্তু প্রলেতারিয় বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করছিলেন বিপুল আত্মত্যাগ, নির্মম নিপীড়ন ও অপরিমেয় স্থৈর্যের মধ্য দিয়ে।

১৯১২-১৯১৪ সময়কালে সমগ্র রুশ দেশে এক বিপুল প্রেরণা জেগেছিল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য। এর কারণ নিহিত ছিল লেনিন ও তাঁর নির্দেশিত কমিউনিস্ট পার্টির (রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক

তিনি বলশেভিক পার্টিকে তৈরী করেছিলেন ইস্পাত-দৃঢ় করে। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবাধ ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও তীক্ষ্ণধী বিশ্লেষণ, তাৎক্ষণিক ও ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর অনুপম সিদ্ধান্তসমূহ তাঁকে বুদ্ধিজীবীদের চোখে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিল। সেই সময় যেমন বলশেভিক পার্টিতে তেমনি অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিতে পরিবর্তনকামী বুদ্ধিজীবীরা বিরাট সংখ্যায় আসতে শুরু করেছিল। ১৯১২ সালে সাইবেরিয়ায় লেনা নদীর ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর বর্বর গুলিচালনা ও ১৯১৩ সালে বিপ্লবী বাল্টিক নাবিকদের নির্মম অবদমন দেশজুড়ে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদকে সংহত করেছিল। এই সব সাধারণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবী অভ্যুত্থান চাপা পড়ে গিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণদামামায়।

বিশ্বযুদ্ধ দেশজুড়ে যে জয়লিপ্সা ও জাতাভিমান জাগিয়ে ছিল, ভূস্বামী ও পুঁজিমালিক বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত ও পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরাও তার শিকার হয়েছিল। যুদ্ধ যখন গড়িয়ে চলল বছরের পর বছর, অভাব যখন তার করাল দশন বের করেছে বিকট মুখবিকারে, শ্রমজীবী প্রতি মুহূর্ত প্রাণ দিচ্ছে সহস্রে তখন স্বৈরাচার চরমে উঠেছে। লেনিনের পরিচালনায় দেশব্যাপী হাহাকারকে কমিউনিস্টরা রূপ দিয়েছে স্বৈরাচারতন্ত্রের উচ্ছেদের ডাকে, যুদ্ধে জারের পরাজয়ের অবশ্যম্ভাবীতার ঘোষণায়। তখন আবার এসেছে জোয়ার। বুদ্ধিজীবী, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত স্তরের যারা, তাদের মধ্যে আবার বামপন্থার দিকে ঝোঁক দেখা গেছে।

তাহলেও এই শ্রেণীর ও বিশেষ করে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল যে গণতৎপরতা যদি পুরোপুরি বামপন্থার হাতে যায় তবে সেখান থেকে ফেরবার রাস্তা থাকবে কী? অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের বামপন্থা তখও পর্যন্ত সাধারণ গণতান্ত্রিক কাজকর্মের বাইরে যাবার সাহস খুঁজে পায় নি। অবশ্যই যাঁরা প্রথমাবধিই প্রলেতারিয়েতের পক্ষ নিয়েছিলেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। বিশেষ করে এঁদের কর্মকাণ্ডই বুদ্ধিজীবীদের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধিদের জমায়েত করতে সাহায্য করেছে কমিউনিস্ট পার্টির পাশে, প্রলেতারিয়েতের সুস্থিতচিত্ত মিত্ররূপে।

গঠিত হোল তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। কেরেনস্কির সরকারে যারা অংশ নিল তাদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা (ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক, লেখক) এক প্রধান স্থান নিয়েছিল। কিন্তু সদ্যলব্ধ গণতন্ত্রকে নিষ্পেষিত করতে বুদ্ধিজীবীদের এই প্রতিনিধিদের হাত কাঁপে নি, চিন্তা বিবেক-তাড়িত হয় নি ক্ষণতরেও, শ্রমিকদের উপর গুলি চালাতে দিনের পর দিন।

১৯১৭র ফেব্রুয়ারী থেকে অক্টোবর মধ্যবর্তী সময় প্রমাণ করেছিল যে, সামগ্রিকভাবে বুদ্ধিজীবী জনতা প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার লক্ষ্য পর্যন্ত যেতে রাজী ছিল, কিন্তু আসন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এরা ছিল অস্থির-চিত্ত মিত্র। রুশ বুদ্ধিজীবীদের যে তিনটি প্রবণতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে এই ছিল তার কারণ। আর এই বহুলাংশে অস্থির ও অবাবস্থিত-চিত্ত মিত্রদের প্রলেতারীয় বিপ্লব রক্ষার্থে কাজে লাগানোর গৌরব লেনিনের ও তাঁর নির্দেশে কমিউনিস্ট পার্টির।

৩

"বিপ্লব জগৎটাকে লাল দাগ দিয়ে একটা 'পুরণো' আর একটা 'নতুন' এই দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়েছে।...**জানলাটা খুলে দাও:** নির্মল বাতাস আসুক। জীবন আসুক। জীবনকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। জীবনের হাত ধরে পাশাপাশি হাঁটতে হবে আমাদের।" তাঁর ছাত্রদের কাছে বলেছিলেন প্রখ্যাত নাট্যনির্দেশক মেয়ভগেনী ভাখতানগভ। তিনি বিপ্লবকে নতুন জীবনের বার্তাবহনকারী বলে আহ্বান করেছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন। প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই তাঁর মত বিপ্লবকে জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, নতুন যুগের শুরু বলে বর্ণনা করেছেন, গ্রহণ করেছেন, বিপ্লবের রক্ষার জন্য বলশেভিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, যেমন কবি আলেক-জান্ডার ব্লক, সামরিক বাহিনীর জেনারেল ব্রুসিলভ, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিশেষজ্ঞ মিচুরিন, কুরাকো, অধ্যাপক প্রটোডিয়াকোনোভ আরখানজেলস্কি এবং বিভিন্ন পেশার আরও অনেকে।

আবার ব্যথিত হয়েছেন, রাশিয়ার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবছে ভেবে

বৈজ্ঞানিক মনোবিদ্যার জনক পাভলভ ছিলেন এমনি একজন। তিনি বিশ্বাস করতেন দেশটা ধ্বংস হয়ে গেছে, যেমন করতেন বিজ্ঞান আকাদমীর স্থায়ী সচিব ও. ফ্রেন্দর্গ। "রুশ জনগণ ইতিহাসের এই পরীক্ষার সম্মুখে বা বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের মুখোমুখী দাঁড়াতে পারে নি"। এঁদের ও আরও বহু বুদ্ধিজীবীর অভিজ্ঞতাই ছিল নৈরাশ্যের। এঁদের নিকট প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব, শ্রমিক-কৃষকের রাজ প্রতিষ্ঠার অর্থই হল গণতন্ত্রের উচ্ছেদ, অজ্ঞান, অশিক্ষিতদের দ্বারা যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার ধ্বংস। গণতন্ত্রের ধারণা বলতে এঁদের ছিল পশ্চিম ইওরোপীয় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধারণা। অবশ্যই মহাবিজ্ঞানী পাভলভ পরে বুঝতে পেরেছিলেন যে এটিই প্রকৃত গণতন্ত্র। সমাজতন্ত্র যে বিশাল সম্ভাবনার জগৎকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেখানে তিনি জনগণ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে পাশাপাশিই হেঁটেছেন আমৃত্যু।

যাঁরা প্রথম থেকেই বিপ্লবকে গ্রহণ করেছিলেন জীবনের অপ্রতিরোধ্য ঘটনা হিসেবে বা যাঁরা 'যাই হোক না কেন, এ দেশ আমার, এ দেশের সত্য আমার সত্য' বলে বিপ্লব পরবর্তী জীবনকে মেনে নিয়েছেন, সমাজতন্ত্রের নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছেন; তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যাটি জটিল ছিল না মোটেই। বা যাঁরা এক অদ্ভুত নৈরাশ্যে ভুগে জনজীবন থেকে নিজেদের নির্বাসিত রাখতে গিয়ে ক্রমে ক্রমে সেই জীবনের দৃঢ় অঙ্গীকারকে নিজের বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, প্রাথমিক বিপর্যয়ের পরে তাঁরাও ছিলেন বিপুল উৎসাহী কর্মী। কিন্তু এর বাইরে আরেকদল ছিলেন যারা সর্বকর্মে সোভিয়েতের গঠনকে বাধা দিয়ে চলেছেন সর্বদা। কোথাও কোথাও এই বাধাদান পর্যবসিত হয়েছে কাজেকর্মে বিরত থাকা বা অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করায়, কোথাও বা সরাসরি আক্রমণে। এর পেছনে বহুবিধ কারণ কাজ করেছে। বহু বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন ভূস্বামী বা বুর্জোয়ার সন্তান, তাদের ধ্যানধারণা পুরোপুরি ছিল শ্রমিক-কৃষকের ক্ষমতা দখলের বিরোধী। এরা বহুক্ষেত্রেই সরাসরি বিদ্রোহ করেছিল, 'শ্বেতবাহিনী' বা বিদেশী আক্রমণকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল।

ধ্বংসাত্মক কাজে বা অসহযোগিতায় যারা এগিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে এক বড় অংশ নিয়েছিল শিক্ষক ও চিকিৎসকরা। এরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে

দিতে রাজী হয় নি। এদেরই মত ইঞ্জিনীয়ার, কলাকুশলী বা কারিগরী বিশেষজ্ঞরাও তাদের জ্ঞান ও কর্ম যাতে বলশেভিকদের স্বার্থে নিয়োজিত না হয় তার নির্দেশ দিয়েছিল সংগঠনের মাধ্যমে। এর একটা বড় কারণ ছিল প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীচক্রগুলিই ছিল মূলতঃ এই সব পেশার সংগঠনের নেতৃত্বে।

বুদ্ধিজীবীদের বৃহত্তর অংশ যার মধ্যে উপরে বলা পেশার লোক ছাড়াও লেখক ও শিল্পী, সামাজিক ও সংস্কৃতি কর্মী, আইন ব্যবসায়ী, সামরিক বাহিনীর অফিসার সকলেই সমবেত হয়েছিল একটাই কারণ ও একই উদ্দেশ্য নিয়ে—বলশেভিকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও তাদের উৎসাদনের জন্য। আসলে বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সকলেই কোন না কোন বুর্জোয়া পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে। এ ছাড়াও আরও একটি বড় কারণ বহু প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীকেও বলশেভিক ও বিপ্লববিরোধী অবস্থান গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিল। নৈরাজ্যবাদী চিন্তায় আচ্ছন্ন একশ্রেণীর বিপ্লববাদীর 'প্রলেটকাল্ট'এর আহ্বান বুদ্ধিজীবিদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করেছিল। পুরনো 'প্রলেটকাল্ট' এর প্রবক্তাদের বক্তব্য ছিল যে, যা কিছু পুরনো শিক্ষাদীক্ষা, চিন্তা, পুরনো শিল্পকর্ম, পুরনো ধ্যানধারণা সবকিছুকে উৎসাদন করতে হবে। বুর্জোয়া সংস্কৃতির সুযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা এর মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন সামগ্রিকভাবে শিল্প-সংস্কৃতিরই ধ্বংসের আহ্বান এবং সঠিক ভাবেই। তারাও এর প্রতিরোধ করেছিলেন নিজ নিজ চিন্তানুযায়ী।

৪

দেশজুড়ে মুষ্টিমেয় অসামান্য ব্যক্তিত্ব ছাড়া বুদ্ধিজীবীদের বৃহত্তম সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশই বহুলাংশে মিলিতভাবে এবং কোথাও কোথাও একক বা গোষ্ঠী-গতভাবে বিপ্লব ও বিপ্লব পরবর্তী নির্মাণকে বাধা দিচ্ছিল প্রবল উৎসাহে। আর এই বিশাল সমুদ্রোপম বুদ্ধিজীবী জনতাকে সমাজতন্ত্র নির্মাণের সংগ্রামে নিয়োজিত করার জন্য সঠিক চিন্তার ও তার নির্ভুল রূপায়ণের সংগ্রাম চালিয়েছিলেন লেনিন ও বলশেভিক পার্টি।

সবচেয়ে বড় বাধা ছিল বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রভাবের ক্ষেত্র থেকে বুদ্ধিজীবী-দের বাইরে আনা। কেননা, প্রাথমিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা চালিত হয়ে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যে অসহযোগ [illegible]

থেকে মুক্ত না করতে পারলে কোন অবস্থাতেই বৃহত্তর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে জনগণ ও সরকারের যোগাযোগই গড়ে তোলা যেত না। তাই বিপ্লবের অল্প কিছু পরেই সোভিয়েত সরকারের নির্দেশে ১৯১৭ সালের ১৩ই নভেম্বর শিক্ষামন্ত্রী লুনাচারস্কি এক বক্তৃতায় বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান জানালেন শ্রমজীবী জনগণের পাশে দাঁড়াতে, বললেন "এর সাহায্যে এগিয়ে আসুন। শক্তিতে ভরপুর এরা, কিন্তু দুর্দশাগ্রস্ত। এই অগ্নিপরীক্ষায় যাঁরা জনগণের পাশে গৌরব তাঁদেরই।...যারা পাশ কাটিয়ে গ্যালো ধিক তারা! শ্রমজীবী জনগণের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের এই দাঙ্গাবাজী, এই বিদ্রোহ যদি চলতেই থাকে, জেনে রাখুন, দুর্গম পথকে কেবল কণ্টকময় করেই তুলবে—পরন্তু ঘূর্ণায়মান রথচক্রকে থামান যাবে না। জনগণ আপনাদের ডাকছে হাত মিলিয়ে কাজ করার জন্য।...পেছনে ফেরার রাস্তা নেই।"

অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম মূলতঃ কেন্দ্রীভূত ছিল শহরে বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ করে সরকারী কর্মচারী, চিকিৎসক, শিক্ষক এদের মধ্যে। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই এদের ইউনিয়নগুলির দ্বারা সংগঠিত ষ্ট্রাইকের বিরোধী ছিল, সভ্যপদও বর্জন করেছিল অনেকে। এদের সাহায্যে এবং অন্তর্ঘাতমূলক কাজের বিরুদ্ধে সরকারী শাস্তি দানের ব্যবস্থা করা হল। অন্যদিকে চলতে লাগল বলশেভিক চিন্তাধারা অনুযায়ী বুর্জোয়া চিন্তানুগামী অথচ নিষ্ঠাবান কিন্তু ভুল পথে চালিত বুদ্ধিজীবীদের দেশ ও জাতিগঠনের কাজকর্মে লিপ্ত করতে।

এটা কোন যুদ্ধজয়ের চেয়ে সহজ কাজ ছিল না। কেননা, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদ্গাতারা এই বিশেষ বিষয়টি নিয়ে কোন বিশিষ্ট নির্দেশ রেখে যান নি। অতএব বলশেভিক পার্টির কাছে ব্যাপারটা ছিল পুরোপুরি নতুন এবং দুরূহ। অথচ বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যক্ষ সহায়তা ব্যতীত শ্রমজীবী জনগণের থেকে নতুন বুদ্ধিজীবী গড়ে তোলারও কোন সুযোগ ছিল না, অর্থাৎ এদের সহযোগিতা অর্জন করা ছিল বিপ্লবকে সফল করার এক অপরিহার্য অস্ত্র। কিন্তু সংশয়ও ছিল, কেননা, যে কোন মূল্যে এই সহযোগিতা ক্রয়ের অর্থ ছিল আবার বিপ্লবকে ভেতর থেকে দুর্বল করা।

এক নতুন ধরনের শ্রেণীসংগ্রাম উন্মোচিত হল। এ ছিল একেবারে আলাদা ও অপরিচিত এক শ্রেণীসংগ্রাম, যার সঙ্গে বিপ্লবের প্রথম পর্বে-

একেবারেই। অতএব দুরূহ। লেনিন বললেন পুরনো ভাবধারার বুদ্ধিজীবী-দের সহযোগিতা পাবার অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে এদের সর্বকর্মে শ্রমিকশ্রেণী ও পার্টির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। যাদের ধারনা ছিল যে শ্রমিকশ্রেণীর কিছুই শেখবার নেই পুরনো চিন্তার লোকদের থেকে. পার্টির মধ্যেই এমন অনেক ব্যক্তি ছিল তাদের তীব্র আক্রমণ করলেন লেনিন "আমাদের কাজ হচ্ছে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞদের আকর্ষণ করা, এবং শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে তাদের জায়গায় এক নতুন অফিসার বাহিনী, একদল নতুন বিশেষজ্ঞ তৈরী করা যাদের আয়ত্ত করতে হবে প্রশাসনের মত একটা দুরূহতম, নতুন ও জটিল বিষয়।"

'প্রলেটকাল্ট'এর নৈরাজ্যবাদী প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে নির্মম সমালোচনা করে তিনি বললেন যে প্রলেতারীয় সংস্কৃতি "একটা বায়বীয় ব্যাপার নয়, নয় তা এটা তাদের এক আবিষ্কার যারা নিজেদের মনে করেন প্রলেতারীয় সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ। এ সবই অর্থহীন। প্রলেতারীয় সংস্কৃতিহচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক, ভূস্বামী ও আমলাতান্ত্রিক সমাজে মানবজাতির সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের যুক্তিগ্রাহ্য বিকাশ।"

উপরোক্ত চিন্তার বশবর্তী হয়ে বিশ্বের প্রথম শ্রমজীবী জনগণের সরকার যেমন আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীল ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের প্ররোচনাদানকারী বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে, তেমনি যারা নিরপেক্ষতার আচ্ছাদনে আবরিত করেছিল নিজেদের তাদের নিরপেক্ষতাকে বিষয়মুখিনতার দিক থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় এই স্বীকৃতিও দিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি সেখানেই থামে নি, এই নিরপেক্ষদের বুঝিয়েছিল যে, এই নিরপেক্ষতা অর্থহীন এবং পরিত্যাজ্য। কেননা সোভিয়েত রাষ্ট্রে বাস করে এর স্বার্থ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিজের বলে মনে না করা পরস্পরবিরোধী।

সরকার ও রাষ্ট্রের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের নিরপেক্ষতা বিষয়মুখিনতার দিক থেকে কিছুদূর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য ছিল কেননা, বিশেষ করে উপরের স্তরের, বুদ্ধিজীবীরা ছিল মোটামুটিভাবে শ্রমিকশ্রেণীর থেকে অনেক বেশী পরিমাণে বুর্জোয়া মতাদর্শেরই দিকে ঝোঁকা। সেক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষতার অর্থ হল বুর্জোয়া মতাদর্শ থেকে যতটুকু হোক না কেন দূরে অবস্থান।

বিরোধিতা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিশেষজ্ঞ, প্রশাসনিক কর্মচারী, সামরিক বাহিনীর অফিসার—এই ধরনের বুদ্ধিজীবীদের শ্রমজীবী জনগণের দিকে আকর্ষণ করতে সচেষ্ট ছিল পূর্বাপর। অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত নতুন কর্মসূচীতে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে অধ্যায়টিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হল যে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বুর্জোয়া মতাদর্শকে সর্বপ্রকারে উৎপাটিত করতে হবে এবং ধ্বংসাত্মক ও বিদ্রোহমূলক কাজকে অবদান করতে হবে নির্মমভাবে। পক্ষান্তরে যে সব লোক-দেখানো চরমপন্থীরা মনে করে যে, বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে কিছুই শেখার নেই শ্রমিকদের, শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে কিছু না শিখেই পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটাতে পারবে, তাদের বিরুদ্ধেও নির্মম সংগ্রাম চালাতে হবে।

একদিকে ভিতরে বাইরে এই ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক সংগ্রাম ও অপরদিকে বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের রাষ্ট্রের কাজে লাগানোর জন্য সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা-দানের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিজীবীদের কাজে লাগানোর প্রয়াস চলতে থাকল। একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞরা কমিউনিস্ট পার্টির এই প্রচেষ্টাকে সরাসরি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বহু বিশেষজ্ঞ বিশেষ করে সামরিক বাহিনী, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিশেষজ্ঞরা সোভিয়েত সরকারের দেশের পুনর্গঠনের জন্য আন্তরিক প্রয়াস, দেশরক্ষার ব্রত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-সংস্কৃতি জীবনের মানোন্নয়ন প্রতিটি ক্ষেত্রে একটা নতুন প্রচেষ্টার আন্তরিকতা দেখে, সার্বিক কঠোরতার মধ্যেও বিশেষজ্ঞ, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানকর্মীদের কাজের সুযোগসুবিধার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার অভীপ্সা লক্ষ্য করেই ধীরে ধীরে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। একথাও মনে করার কোন কারণ নেই যে, তারা বলশেভিকদের মতাদর্শকে নিজেদের বলে গ্রহণ করেছিলেন।

দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের চেষ্টা এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্যমণ্ডিত বিজ্ঞান শিল্প সংস্কৃতির পঠীস্থানগুলি রক্ষার জন্য যতদূর সম্ভব সাহায্য দান বুদ্ধিজীবীদের এই বিশ্বাস আনতে সাহায্য করেছিল শ্রমজীবী জনগণের রাষ্ট্র অতীতের জ্ঞানভাণ্ডারকে শুধুমাত্র মূল্যবান সঞ্চয় বলেই মনে করে না, প্রকৃতপক্ষে

গোর্কি ও আলেক্সি তলস্তয়ের মত ঔপন্যাসিক, স্তানিস্লাভস্কির মত নাট্য পরিচালক, পাভলভের মত বৈজ্ঞানিক বা আলেকজান্দ্রভের মত শক্তি-বিশেষজ্ঞকে ফিরিয়ে আনতে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের কল্যাণে নিয়োজিত করতে পেরেছিল। এই প্রসঙ্গে আলেকজান্দ্রভের উক্তি স্মরণীয়। ১৯২৩ সালে এক প্রবন্ধে তিনি বললেন: "যে তীব্র সংকট চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছিল তার থেকে রুশ বুদ্ধিজীবীরা এখনও সম্পূর্ণ মুক্তি পান নি, কিন্তু একই জায়গায় স্থানুবৎ থেকে যাওয়াও আর সম্ভব নয় অনেক কারণেই, বিপ্লবের প্রথমদিককার ধ্বংসকারী ঝঞ্ঝাবাত্যার সম্মুখীন হবার সামর্থ্য রাখে এখন প্রমাণ দেখিয়েছে দেশ; নতুন সৃজন কর্মের অঙ্কুর দেখা দিয়েছে এবং বৃহত্তর জনসমষ্টি বিগত বছর-গুলিতে নবীন শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছে।

"ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বাইরে থাকা আর সম্ভব নয়। সামাজিক কাঠামোর এই বিশাল পুনর্গঠনের থেকে আত্মিক শাস্তি ভোগ না করেই সরে থাকা অসম্ভব। এখান থেকেই আসে আত্মিক মৃত্যু অথবা অবক্ষয়।"

৫

আজকের দিনেও দেশে দেশে, আমাদের দেশে তো বটেই বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে নানা ধারণা, নানা চিন্তার, পরস্পর-বিরোধী তত্ত্বের পাশাপাশি অবস্থান। এমনও দেখা যায়, বামপন্থী, এমনকি মার্কসবাদীরাও বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে নানা উদ্ভট অ-বামপন্থী, অ-মার্কসীয় অভিধাকে বিচার-নিরপেক্ষ-ভাবে প্রয়োগ করেন। এমনও দেখা যাচ্ছে যে, হয়ত প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া চিন্তা বা অতি-বামপন্থার নানা উদ্ভট ধারণা এই সব বাজার-চালু তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের চিন্তা ও কর্মনায়কদের বিরুদ্ধে আক্রমণ এরই প্রকাশ। আমাদের দেশে উগ্র বামপন্থা এই অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকেই আক্রমণ করছে। অপরদিকে, আজকাল সাম্রাজ্যবাদী কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ করতে চাইছে এদেশে উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের মূলে দেশজ চিন্তানায়কদের ভূমিকা ছিল না, বরং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই এই জাগরণের চিন্তা ও শক্তি জুগিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হোল বেশ কয়েকজন মার্কসবাদী (!) ঐতিহাসিক ও গবেষক এই সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বের খপ্পরে পড়ে স্বদেশে গণতান্ত্রিক চিন্তার উদ্বোধনে দেশের

এমন দাবী করছেন। কেউ কেউ বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিশীল ভূমিকাকে এতই বড় করে দেখাচ্ছেন যে, তারা বিপ্লবের শক্তি হিসেবে শ্রমিক-কৃষককে স্থানচ্যুত করছে আবার কোন কোন স্বার্থ হয়ত প্রমাণ করতে সচেষ্ট যে বুদ্ধিজীবীদের কোন ভূমিকাই নেই সমাজের প্রগতিমুখী পরিবর্তনে।

বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকাকে বিচার করতে গেলে উপরে বর্ণিত তথ্য ও অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের বারবার স্মরণ করতে হবে তবেই অ-শোষকশ্রেণীর মিত্ররূপে তাদের জয় করা যাবে। আর এ ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা খুবই জটিল এবং বিরাটও। একই সাথে তাকে লড়তে হবে বুর্জোয়া ও নানা পেটিবুর্জোয়া মতাদর্শের আওতা থেকে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে মুক্ত করার জন্য এবং অপরদিকে বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকেও জ্ঞানলাভের জন্য। অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে শিখতে হবে, তাদের শেখাতেও হবে। শেখাতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ। বোঝাতে হবে এ ছাড়া প্রকৃত মুক্তি ও শোষণাবসানের কোন পথ নেই। সে কাজে কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হই তার উপরেই নির্ভর করবে বুদ্ধিজীবীদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে আমাদের সক্ষমতা।

উচ্চশিক্ষায় ভাষা শিক্ষার স্থান

নির্মাল্য বাগচী

এই জটিল, বিতর্কমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি সমাজের প্রয়োজনের (Social necessity) কথা বিবেচনা করে সমাধান করা উচিত। শিক্ষক ও ছাত্ররা সমাজ বহির্ভূত নন, যদি সমাজ ও দেশের সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ইতিহাসের পটভূমিকায়, প্রশ্নটি ভাবা যায় তাহলে যে সমাধান পাওয়া যাবে তা ছাত্র ও শিক্ষক সকলের পক্ষেই শুভ হবে। ভাষা শিক্ষা ঐচ্ছিক করলে ছাত্রদের পাশের হার বৃদ্ধি পাবে, এই যুক্তি কতটা গ্রাহ্য তা ভাববার বিষয়। পাশ করাটাই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নয়, পাশ করে উৎপাদনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে শিক্ষার সার্থকতা, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৫, ৭৬ ও ৭৭ সালে গ্র্যাজুয়েট বেকারের স্থায়ী সংখ্যা হল দেড় লক্ষ, এর কারণ অর্থনৈতিক সংকট, তা ছাড়া বিভিন্ন বনিক সংস্থার বক্তব্য, "এরা শুধু বেকারই নয়, চাকুরীতে নিয়োগেরও অনুপযুক্ত।" ত্রি-বার্ষিক কোর্স চালু করার সময় কলেজ শিক্ষকরা দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষা কোর্স চালু করার সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা চাকুরীর নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দিহান হয়েছিলেন, কিন্তু চাকুরী যায় নি। দীর্ঘদিনের শিক্ষক আন্দোলন শিক্ষকদের চাকুরীর স্থায়িত্ব রক্ষা করে এসেছে। তাছাড়া মূল কথা হচ্ছে, সামাজিক প্রয়োজন থেকে শিক্ষার আগ্রহ বেড়েছে, স্কুল-কলেজের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বেড়েছে। সারা ভারতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ১৯৫০ ৫১ সালে ছিল ৩·৬ লক্ষ তা ১৯৭৬-৭৭ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪·৩২ লক্ষ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার ভিৎ যত প্রসারিত হচ্ছে। বাছাই করে নেওয়া সত্ত্বেও, কলেজে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। এখানে উল্লেখ করা দরকার পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ ক্লাশে ইংরাজীতে ছাত্রের ভীড় খুব বেশী।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ভাষা শিক্ষা আলোচনা করতে গেলে

শুধু মাতৃভাষা শেখানো হবে ও ইংরেজী তুলে দেবার একটা প্রস্তাব সরকার থেকে এসেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ও ইংরেজীকে ঐচ্ছিক করার একটা প্রস্তাব শিক্ষাবিদ মহলে রয়েছে।

এটা ঠিক কোঠারী কমিশন প্রাথমিক স্তরে ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পড়ানোর পক্ষপাতী নন। এই স্তরে সব দেশেই বোধ হয় একটি ভাষা, মাতৃভাষা শেখানো হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে অবস্থাটা আলাদা, এখানে গোটা প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে নেই, ফলে বে-সরকারী ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ মুক্ত বিত্তবান অভিভাবকের পুত্রকন্যাদের জন্য যে স্কুলগুলি আছে সেখানে ইংরেজী শেখানোর এবং অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু আছে। তা উঠিয়ে দেবার ক্ষমতা সরকারের নাই। সুতরাং দুই ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা—ইংরেজী যুক্ত ও ইংরেজী বিহীন শ্রেণী-ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গণতন্ত্রের যুগে বাতিল। ইংরেজী প্রাথমিক স্তর থেকে তুলে নিলে ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলের দিকে ঝোঁক আরও বাড়বে এবং সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে লুকিয়ে ইংরেজী পড়াবার ব্যবস্থা হবে। সুতরাং তত্ত্বের দিক থেকে ভাল শোনালেও আসলে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী তুলে দেওয়ার নীতি সুবিধাভোগী শ্রেণীকে বাড়তি সুবিধা যোগাবে এবং প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী উঠবে না, বাস্তবের সঙ্গে তত্ত্বের মিল না থাকলে, তা সঠিক হয় না। অন্যদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজীকে ঐচ্ছিক করার প্রস্তাব কোঠারী কমিশনের অভিমতের বিরোধী।

সব দেখেশুনে আশংকা হয় যে, বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী একেবারে তুলে দেওয়া এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজীকে ঐচ্ছিক করার একটা অভিপ্রায় উঁকি মারছে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতি সাম্প্রতিক ঘোষণা এসম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

আমরা মাতৃভাষাকে প্রথম ভাষা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, এবং ইংরেজী বা কোন আন্তর্জাতিক ভাষাকে দ্বিতীয় আবশ্যিক ভাষা হিসাবে (Secondary language) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত রাখার পক্ষপাতী।

দ্বিতীয় আবশ্যিক ভাষা হিসাবে কোন আন্তর্জাতিক ভাষা শেখার—ইংরেজী, রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্প্যানিশ গুরুত্ব অস্বীকার করে লাভ

ছাত্ররা একটি বা দুটি বিদেশী ভাষা শিখে থাকে। বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরেজীর চল বেশী; আমাদের দেশে ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজী শেখার কতকগুলি সুবিধা রয়েছে।

সেই সঙ্গে মাতৃভাষার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তুলতে হবে। সবকিছু বিষয় বাংলায় শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। অফিস ও আইন আদালতের কাজকর্ম বাংলায় চালু করতে হবে। ইংরেজীর প্রাধান্য হ্রাস করতে হবে। বাংলার মাধ্যমে এম. এ. এম-এসসি পর্যন্ত সব পরীক্ষা দেবার সুযোগ দিতে হবে। কয়জন জানেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৭ সাল থেকে বাংলার মাধ্যমে এম. এ ও এম. এস-সি সব পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে?

সকলের অভিযোগ, এত বছর পড়েও আমাদের ছাত্ররা ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করতে পারে না। ফেলের হার বড় বেশী। অথচ সেই সঙ্গে দেখি ছাত্ররা অন্য দেশে অনেক কম সময়ে, ভালভাবে ইংরেজী শিখে নিচ্ছে। সুতরাং শিক্ষাদানের প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে ভুল আছে; যে জন্য ইংরেজী শিক্ষাদানের প্রচলিত পদ্ধতির আমূল সংস্কার চাই। তা নিয়ে গবেষণা করতে হবে। Spoken English এর সাহায্যে অনেক তাড়াতাড়ি শেখা গেলে সেদিকে আমাদের যেতে হবে।

আমরা এই দ্বিতীয় ভাষা থেকে কি শিখতে চাই? অধিকাংশের জন্য মোটামুটি ভাষাজ্ঞানের চেয়ে বেশী কিছু নয়; তাও সহজ নয়। দৈনন্দিন জীবনের জন্য ব্যবহারিক ভাষাজ্ঞান, যার সাহায্যে বই, খবরের কাগজ পড়া চলবে শুদ্ধ করে লিখতে পারবে। এত চলমান জীবনের জন্য যা প্রয়োজন, সবদেশেই কিছু সাহিত্য অনুরাগী ছাত্র থাকবে। যারা সাহিত্যের দিকে ঝুঁকবে, তাদের কথা আলাদা।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাংলা প্রধান (Primary) এবং ইংরেজী দ্বিতীয় (Secondary) ভাষা হিসাবে আবশ্যিক রাখার পর স্নাতক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ভাষা আর আবশ্যিক রাখার আমরা পক্ষপাতী নই। আমাদের এ বক্তব্য কোঠারী কমিশনের অভিমতের দ্বারা সমর্থিত:

ভারত সরকারের উদ্যোগে অধ্যাপক ডি. এস. কোঠারির সভাপতিত্বে নিযুক্ত শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) এই সম্পর্কে যে প্রাসঙ্গিক সুপারিশ করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য:

"আমরা নিশ্চিতভাবে মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে কোনো ভাষা আবশ্যিক বিষয়রূপে গৃহীত হবে না, কিন্তু ভারতের ক্লাসিকাল ও আধুনিক ভাষাসমূহ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী ভাষাসমূহ নির্বাচিত (ইলেকটিভ) বিষয়রূপে গৃহীত হতে পারে। আমরা অন্যত্র যে সুপারিশ করেছি তদনুযায়ী বিষয়-নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোচিত সুবিধা ও অধিকার দেওয়া উচিত। কোনো একটি ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক হ'লে ছাত্রদের উপর ভার বোঝা চাপে। তার ফলে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়-কাম্বনেশন অসম্ভব হয়ে যেতে পারে। কোনো এক বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট স্তরে কেবল ভাষা পঠন-পাঠনের জন্যেই শিক্ষার সামগ্রিক সময়ের শতকরা ৩০ ভাগ সময় নিয়োজিত হতে দেখে আমরা উদ্বিগ্ন হয়েছি। এটা স্পষ্ট যে, এইরকম পরিস্থিতিতে প্রধান বিষয়গুলির পঠন-পাঠন খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শিক্ষার মান নীচু থেকে যায়।"

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি যুক্তি আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে—

প্রথম, আমরা এক নতুন যুগের মধ্য দিয়ে চলেছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের যুগকে আমাদের দ্রুত গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয়, দুটো Public Examination পাশ করে যারা কলেজে পড়তে আসছে তারা আগের যুগের ছাত্রের তুলনায় কিছু উন্নত মানের হবে। এদের একটা অংশ ইতিমধ্যে নানা ধরণের বৃত্তিমুখী শিক্ষায় চলে যাবে।

তৃতীয়, আগেকার দিনের মামুলী পাস "কোর্সে"র শিক্ষার চৌহদ্দীর মধ্যে এদের বেঁধে রাখা কোন মতেই ঠিক হবে না। "পাস" কোর্স কথাটার সঙ্গে একটা হীনমন্যতা অনেক দিন ধরে যুক্ত হয়ে রয়েছে। এই কথাটা তুলে দেওয়া দরকার। আজকের জীবনের উপযোগী কতকগুলি বিষয় এরা শিখতে চায়, গুরুত্ব দিয়েই শিখতে চায়। নমঃ নমঃ করে সময় কাটাতে ও একটা ডিগ্রি যা জীবনের প্রয়োজন মেটায় না। তা পেয়ে ধন্য হতে চায় না। এ এক নতুন তরুণ দল। আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ, তারা অনেক কিছু জানতে এসেছে, অনার্স না নিলেও। অনার্সের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষালাভের সুযোগ চায়। এদের ভাষাজ্ঞান স্কুল স্তরেই গড়ে উঠেছে। এদের উপর অযথা ভাষার বোঝা চাপিয়ে ভারাক্রান্ত করার কোন যুক্তি নেই। এখন দুটো বিষয় শেখে, নতুন ব্যবস্থায় তিনটি বিষয় শিখবে।

সাহিত্য-অনুরাগী হবে। ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করবে। সেক্ষায় তারা ভাষাকে একটি বিষয় হিসাবে নেবে। সেখানে ভাষার অধ্যাপকেরা উন্নতমানের ছাত্রদের পাবেন। তাদের পড়িয়ে অনেক বেশি তৃপ্তিও তাঁরা পাবেন।

পঞ্চম, যারা ঐচ্ছিক হিসাবে কোন ভাষা নিল না। তাদেরও কোন না কোন ভাষা শিখবার সুযোগ খোলা রাখা যাবে, তার জন্য তারা আলাদা ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট পাবে।

জীবন-শিল্পী তলস্তয়

সুশীল জানা

"...আমার জীবনী লেখা তাই কঠিন। সবটা কেউ পারেন না। খণ্ড খণ্ড করে কি জীবনী হয়? তারিখ ইতিহাসের সঙ্গে development কে দেবে? এলমহার্স্ট' বলেছেন—আমার জীবনী লেখা অসম্ভব। এত বিভিন্ন তার দিক যে তা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।...সাহিত্যের পরিচয়টাই আমার সব পরিচয় নয়।"

উক্তিটি অবশ্য নিজের জীবনী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের। এক মহান শিল্পীর এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আজ থেকে দেড় শ' বছর অতীতের আর একটি বিরাট মহৎ জীবন ও শিল্পীর কথা আমাদের মনে আসে—তিনি লেভ নিকোলায়েভিচ তলস্তয়। নানা বৈচিত্র্যে, নানা চিন্তা—আদর্শ ও বাস্তব জীবন-দ্বন্দ্বে সমাকীর্ণ ছিল সেই মহৎ মানুষটির সুদীর্ঘ জীবনধারা। অতীত ১৯শ শতাব্দী আজ যেমন তার নানা চিন্তা ও বিতর্ক, নানা পতন ও উত্থান, প্রতিক্রিয়া ও প্রগতি নিয়ে আমাদের কাছে সম্পূর্ণ এক ইতিহাস—তেমনি সেই বিরাট মানুষটিও আজ এক ইতিহাস রূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত। এ সত্য স্বীকার করতে সংকোচ নেই যে—আমাদের দেশে এই বিরাট মানুষটি—এই মহৎ জীবন শিল্পী—এই যুগপ্রতিনিধিস্বরূপ প্রতিভার ইতিহাস রচিতও হয় নি—পঠিতও হয় নি।

১৮২৮শে জন্ম—১৯১০ সালে মৃত্যু। তাঁর এই দীর্ঘ ৮২ বছরের জীবন-প্রবাহের বাঁকে বাঁকে বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা উপলব্ধির উজ্জ্বল স্বাক্ষর আমাদের চোখে পড়ে। সেগুলিকে খণ্ডিত করে—একটি থেকে আর একটিকে আলাদা করে দেখেছে নানা দেশের নানা মানুষ, যার যেমন উদ্দেশ্য। সে সবের বৈচিত্র্যও তো কম নয়—তাঁর শিল্পনীতি, ধর্মচিন্তা, রাষ্ট্র চিন্তা, শিক্ষাচিন্তা, সমাজচিন্তা—সবার উপরে তাঁর শিল্পসৃষ্টি। সবটা মিলে আধুনিক সভ্যতা-লালিত মানুষের জৈব ও মানস-রাজ্যের যা কিছু আশা ও আকাঙ্ক্ষা—সে সবের মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছেন এই শক্তিমান জীবন সন্ধানী

রুশ সাহিত্যের স্বর্ণময় যুগ বলতে বোঝায় ১৮৬০ থেকে ১৮৮০। এই যুগকে যে প্রধান তিনটি প্রতিভা উজ্জ্বল করে গেছেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে তুর্গেনেভ, দস্তোয়েভস্কি ও তলস্তয়। এঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ তলস্তয়। এবং এই সর্বকনিষ্ঠের জীবনাবসান ঘটে ১৯শ শতাব্দীর ওই সুবর্ণযুগ অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এসে। বলা যায়—১৯শ শতাব্দীর পূর্ণ পরিণাম—তার ব্যর্থতা ও সার্থকতা, তার সম্পূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা চিহ্নিত হয়ে আছে এই শেষ পুরুষটির মধ্যে।—প্রথম অংশে তার পূর্বতন শতাব্দীর ধ্যানধারণার সঙ্গে বিরোধ ও বিচ্ছেদ এবং শেষ অংশে নবোদ্ভিন্ন বিংশ শতাব্দীর নবীন উন্মেষ ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সঙ্গে বিরোধ ও বিলয়। এদিক থেকে এই জীবনরূপকারের আদ্যন্ত চিন্তা, কর্ম ও সৃষ্টি এবং তার সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনও মিলেমিশে আছে বিস্ময়করভাবে।

বিখ্যাত এক অভিজাত বংশের সন্তান তিনি। মহানগরী মস্কোর সওয়া শ' মাইলের মধ্যে ইয়াসনায়া পলিয়ানা গ্রাম তাঁর জন্মস্থান এবং এটাই তাঁদের জমিদারী। জন্মসূত্রে জমির সঙ্গে জীবন-প্রবাহ ছিল বাঁধা। কিন্তু ব্যবহারিক আভিজাত্যের ক্ষেত্রে ফরাসী কেতায় দুরস্ত হয়ে ওঠাই ছিল লক্ষ্য। ১৬ বছর বয়সে ভর্তি হলেন কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু বছর দুই যেতে না যেতে বিরক্ত হয়ে ছেড়ে চলে এলেন। রবীন্দ্রনাথের মতই বোধ করি চার দেয়ালে ঘেরা নিয়ম-তান্ত্রিক শিক্ষানীতি তাঁর ভাল লাগে নি। দুর্বার তখন তাঁর তারুণ্য—রুশ অভিজাত তরুণ সম্প্রদায়ের সব দুষ্কর্ম ও উদ্দামতায় ভাসিয়ে দিয়েছেন নিজেকে। এই সময়কার বাধাবন্ধনহীন দশটা বছর বোধ করি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন। এই সময়েই দুরন্ত অশান্ত তরুণ ১৮৫১ সালে রুশ বাহিনীর সঙ্গে ছুটেছেন ককেসাসের যুদ্ধক্ষেত্রে। সেখান থেকে দানিয়ুব। তারপর ক্রিমিয়ায়—সেবাস্তোপোলের যুদ্ধে। তখন তিনি অফিসার। এই দশ বছরে তথাকথিত রুশ অভিজাত সম্প্রদায়ের নির্বিচার ভোগসংকুল জীবন-আবর্তের মধ্যে থেকে যেমন পান করেছেন হলাহল—বোধ করি তেমনি সংগ্রহ করেছেন তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের—তাঁর শিল্পী জীবনের ফসল। গোর্কি যাকে বলেছেন তাঁর 'University Days'—নির্মাতীত সমাজ পরিত্যক্ত, শৃঙ্খলিত কিন্তু জীবনীশক্তিতে অফুরন্ত বিশ্বাস এক মানব-

"আমি যুদ্ধক্ষেত্রে নরহত্যা করতাম, অন্যকে হত্যার উদ্দেশ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিতাম, জুয়াখেলায় টাকা ওড়াতাম,...অকারণে নির্দয় ব্যবহার করতাম কৃষকদের উপরে, হল্লা করে বেড়াতাম ভ্রষ্টা নারীদের সঙ্গে, লোক ঠকাতাম। মিথ্যাবাদ, চুরি, পরদারগমন, মাতলামী, গুণ্ডামী, নরহত্যা...এর কোনটাই সে সময়ে বাদ যায় নি।"

এই হল তদানীন্তন তাঁর আমলে রুশ জমিদার শ্রেণীর চরিত্র—এ কোন ব্যক্তির কথা মাত্র নয়। মনে হয় এই বিকৃত আবর্তের মাঝখানে, জীবন-জিজ্ঞাসার সুগভীর এক কেন্দ্র থেকে তখন মহান এক শিল্পীর সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের ধারণা—শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, জীবনেও। তাঁর জিজ্ঞাসা—এই কি জীবন? এই কি অনিবার্য? কারণ, এই সময়ের মধ্যেই তলস্তয়ের প্রথম রচনা প্রকাশিত হল—Childhood, ১৮৫২ সালে। সেকালের সুবিখ্যাত বৈপ্লবিক চিন্তানায়ক ও সমালোচক চের্নিসেভস্কি এই রচনার সমালোচনায় মন্তব্য করেছিলেন—"a profound knowledge of the secret movements of the psychic life" এবং "a directness and purity of the moral sense."

এই movement of the psychic life গতিময় মানস-জগত এবং 'directness and purity of moral sense'—স্পষ্ট ও গ্লানিশূন্য নীতিবোধ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তাঁর পরবর্তী কালের সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে। শুধু সৃষ্টির ক্ষেত্রেই নয়—তাঁর চিন্তা, কর্ম ও জীবনেও তা লক্ষ্যনীয়। বিশেষতঃ উপরোক্ত মানদণ্ডে নিজের জীবনকেও রূপায়িত করার যে একটা অসাধারণ প্রয়াস—বোধকরি তার দৃষ্টান্ত সাহিত্য জগতে বড় বিরল। এ যেন অজ্ঞাত এক জগতের বিরাট এক শক্তিমান পুরুষ, তাঁর হাতের মশালের আগুনে সমকালীন সহস্র জঞ্জালের রাশি পোড়াতে পোড়াতে এগিয়ে চলেছেন অনাগত ভবিষ্যৎ এক শতাব্দীর দিকে—যেখানে আছে বিপ্লব, আছে মানুষের সম্পূর্ণতা। বিপ্লবের এ শতাব্দী তাঁর ঋণ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ না করে পারে না।

তাঁর এমন অনেক মতামত আছে যা তাঁর সমসাময়িক কাল এবং পরবর্তী কালেরও বহু সমালোচক ভাল চোখে দেখেন নি; সমালোচনা করেছেন, ত্রুটি ধরেছেন। কিন্তু তাঁর কালের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলিকে একটু যাঁচাই করে দেখলে মনে হয়—অত বড় শক্তিমান, নিয়ত সংগ্রামশীল, গতিময়

একটি প্রতিষ্ঠান। সেই কালে রাষ্ট্র সম্পর্কে অথবা ধর্মকেন্দ্র গীর্জা, শিক্ষানীতি অথবা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরে তার সুতীব্র সমালোচনাগুলির অবদান যে কতখানি, লেনিন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে গেছেন। বর্তমান শতাব্দীর মানুষের কাছে বিগত শতাব্দীর ত্রুটিবিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা সহজেই ধরা পড়া স্বাভাবিক। তবু এ কথাও ভুললে চলবে না যে, এই সতত-সক্রিয় মানুষটির কাছে সেদিন যা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে হয়েছে—তার উপরে পড়েছে তাঁর নির্মম আঘাত। সে-সব রচনা সেদিন রুশিয়ায় ছাপা নিষিদ্ধ ছিল। ছাপা হত রুশিয়ার বাইরে এবং সেখান থেকে হাতে লিখে স্বদেশে প্রচার হত, পঠিত হত পরম আগ্রহে।

শিল্প স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বের সাহিত্যসভায় যদিও আজ তাঁর আসন দৃষ্টান্ত-বিরল এক উচ্চাসনে কিন্তু কৌতুকের বিষয়, তাঁর শিল্প-ভাবনার মৌলিক গ্রন্থ 'শিল্প কী?' গ্রন্থে যে মতামত ব্যক্ত হয়েছে ইওরোপ আমেরিকার সাহিত্যিক মহলে, সমালোচক মহলে এবং আমাদের দেশেও অনেক শিল্প-শাস্ত্রী তার বিরোধী। তাঁদের কাছে শিল্প শুধু শিল্পেরই জন্য—আর তার কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। অন্যদিকে তলস্তয়ের মত—শিল্পের একটা উদ্দেশ্য আছে এবং তা হল promoting good actions অর্থাৎ সৎকর্মের প্রেরণা। শুধু 'শিল্পের জন্য শিল্প' অথবা তার আনুষঙ্গিক দুর্বোধ্যতা, জটিলতা বা সুনিপুণ সূক্ষ্মতা ইত্যাদির আবেদনকে তলস্তয় কৃত্রিম বলে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। বরং তিনি কি শিল্প-জিজ্ঞাসা সম্পর্কিত মতামতে, কি শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে—হয়েছেন সোচ্চার এবং সুস্পষ্ট; শিল্পকে করতে চেয়েছেন মানুষের আত্মপ্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম। বলা বাহুল্য—তলস্তয়ের এই সোচ্চার সুস্পষ্টতা, শিল্পের উদ্দেশ্যমূলক সংপ্রেরণা তাঁর সমকালীন জারের আমলও ভাল চোখে দেখে নি এবং আজ পর্যন্ত ইওরোপ আমেরিকাও ভাল চোখে দেখে না। ওদেশের সমালোচনার চোখ তাঁর সুবিখ্যাত মহৎ উপন্যাস ও কথা-সাহিত্যের মধ্যে একঘেয়ে ত্রুটি একটা লক্ষ্য করে থাকে—তা হল ওই moral sense, নৈতিক বুদ্ধি। আমাদের প্রশ্ন—ওই বুদ্ধি কি শিল্পের সর্বনাশ করে থাকে? এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের শিল্পের লক্ষ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি, এ আমাদের সুবিদিত। তিনি তাঁর 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে বলছেন—

আমাদের মনকে কোন দিকে চালাইতেছে? ক্ষুধাতৃপ্তির কে'কটা যাহাতে একেশ্বর হইয়া না উঠে, যাহাতে আমাদের মন হইতে ক্রমে একটু আলগা হয়, সৌন্দর্যের সেই চেষ্টা দেখিতে পাই।' [সাহিত্য]

এখানে সৌন্দর্যের যে ভূমিকা, তলস্তয়ের নৈতিক-বুদ্ধির সঙ্গে তার কোন পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে না। মানুষের অগ্রগতি ও সভ্যতার ইতিহাস শুধু ভোগের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে নি—গড়ে উঠেছে তার অনেকখানি ত্যাগের মধ্যে দিয়েই। এই ত্যাগ তার বন্য সেই জৈব ক্ষুধার দাবীর উপরে একটা অনন্য সুষমার মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—ইন্দ্রিয়ের সুখকর ও অসুখকর, জীবনের মঙ্গলকর ও অমঙ্গলকর, এই দুয়ের দ্বন্দ্বের মধ্যে স্ফুলিঙ্গ বিক্ষেপ করতে করতে একদিন যদি পূর্ণভাবে জ্বলে ওঠে তবে তার আংশিকতা ও আলোড়ন নিরস্ত হয়। সেখানেই সে সত্য ও সুন্দর। সেখানেই সে সংকীর্ণ কালের বা দেশের শুধু নয়—সে হয় সর্বকালের, সকল দেশের। আমাদের মনে হয়—একথা তলস্তয়ের কথাসাহিত্য সম্পর্কে শুধু নয়, তাঁর জীবন সম্পর্কেও অর্থবহ।

গল্প ও কাহিনী, বিচিত্র উপকথা, নাটক ও উপন্যাস নিয়ে তাঁর যে সৃষ্টি জগৎ—তাতে অজস্রতা হয়ত নেই। তার জন্যে কেউ কেউ মনে করেন—তাঁর সেই নীতিবোধই এ সর্বনাশ করেছে। কিন্তু আমার মনে হয়—অজস্রতা হয়ত নেই—এবং তার অভাবে ক্ষতিও কিছু হয় নি- কারণ যে বিশালতা ও গভীরত্বের উত্তরাধিকার তিনি পরবর্তী বংশধারার জন্য রেখে গেছেন, তা কম নয়। পূর্বেই বলেছি—তাঁর সম্বন্ধে পঠন পাঠন আমাদের দেশে খুব অল্পই হয়েছে। তাঁর জীবনকালের শেষ দিকে, বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাতকালে বাংলা সাহিত্যে তলস্তয় সম্পর্কে বেশ একটা আগ্রহের লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে সুখ্যাত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর 'সাহিত্য' পত্রিকায় তলস্তয় সম্পর্কে নানা ধরনের আলোচনার সূত্রপাত করেন। খণ্ড খণ্ডভাবে এ আলোচনার ধারা আমাদের প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা 'ভারতী', 'দাসী', 'প্রবাসী', 'সবুজপত্রে'র যুগ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। বলা যায়—প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাল পর্যন্ত। পরের কয়েক বছর আমাদের দেশে বিদেশী পুঁথিপত্র আমদানির একটা আকাল গেছে—বোধকরি তা বৃটিশ সাম্রাজ্যের যুদ্ধকালীন বিপর্যস্ততা। তার পরবর্তীকালে তলস্তয়ের মাত্র 'আনা কারেনিনা' ছবার

বলাবাহুল্য, তলস্তয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। বোধকরি ইংরেজ প্রকাশক এবং তাঁর সমালোচকরা তো বটেই—'আনা কারেনিনা'কেই তলস্তয়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে মনে করেন। তাই হয়ত ওই উপন্যাসখানা এ দেশে বহুল প্রচারিত ছিল—আর ছিল 'রেজারেকসন'। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস War and Peace আমাদের কাছে সুলভ হয়েছে অনেক পরে।

তলস্তয়ের নাটক ও গল্পকাহিনীর মধ্যে তার প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর অবশ্যই আছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাজসিংহাসন পাতা আছে আধুনিক গদ্য মহাকাব্য উপন্যাসের ক্ষেত্রে। এবং সার্থকতম তার প্রথম উপন্যাস War and Peace. এটির রচনা শুরু করেন ১৮৬৫ সালে এবং দীর্ঘ ৬ বছর ধরে চলে রচনা, সংস্কার এবং পুনঃসংস্কার। নেপোলিয়নের রুশ অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এ উপন্যাসে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ মহাকবি তলস্তয় ছোট বড় করে প্রায় ৫৫০টি চরিত্রের সমাবেশ করেছেন—এ হিসেব রুশ সাহিত্যের ইতিহাস-কারের। সুবিখ্যাত সমালোচক গোপাল হালদার ঠিকই বলেছেন যে—

"রুশ সাহিত্যের যদি একখানা বইও পড়তে হয় তাহলে পাঠ্য সম্পূর্ণ এই উপন্যাস—'যুদ্ধ ও শান্তি।'"

উপন্যাসের আধুনিক রচনা ধারায় চরিত্র বা জীবন-চিত্র রচনার যে ধারা আমরা দেখতে পাই—তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত War and Peace. শুধু শিল্পের আঙ্গিক নয়—বক্তব্যেও এ বিশ্ব জনতার সামিল। যুদ্ধ আসে—যুদ্ধ চলে যায়, ফেলে রেখে যায় নানা বিপর্যয়ের জঞ্জাল ঠিকই। কিন্তু জনজীবন-প্রবাহ অপ্রতিরোধ্য। সে যেন প্রকৃতির সূতিকাগার—নূতন সৃষ্টি হয়ত কিছুদিনের জন্য থমকে থাকে কিন্তু নিঃশেষিত হয় না। সোভিয়েত পাঠকের কাছে হয়ত এ মহাগ্রন্থের দেশ-গত দেশপ্রেমগত আবেদন বড় প্রত্যক্ষ। শোনা যায়—লেনিনগ্রাদ যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ—বোমাবর্ষণ, অনাহার ও মহামারীতে মরছে তখন লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত নরনারী, আর লড়াই করে যাচ্ছে অনমনীয় প্রতিজ্ঞায়, তখনও এ বই নাকি তারা কিনেছে এবং পড়েছে ৫ লক্ষ কপির উপর। তবু আমাদের কাছে এ বই শুধু রুশ-সংগ্রামের বই নয়—যুদ্ধকণ্টকিত এ শতাব্দীর কাছে সকল দেশের বই। এর প্রধান এবং অপ্রধান চরিত্রগুলি কোন এক কালে কোন এক দেশে বেঁচে ছিল তা নয়, তারা কাল যেমন ছিল, আজও

আর স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এই মহাগ্রন্থের স্রষ্টা। আমরা আগেই বলেছি—এই এক বিস্ময়কর শিল্পী, যিনি শুধু শিল্পের রূপকার নন, আপন জীবনেরও রূপকার। তাঁর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেসব নৈতিক সমস্যা তাঁকে পীড়িত করত—তাতে তিনি হয়ে উঠতেন আরও অধীর। সমস্যার সমাধান না করা পর্যন্ত তিনি সুস্থির হতে পরতেন না। একদিন তাঁর মনে হল—স্ত্রী ও পরিবারের স্বার্থপরতা তাঁর নৈতিক সততার পক্ষে বাধা হয়ে আছে, তাঁর অধ্যাত্মজীবনের পক্ষে গৃহ একটা যেন বন্দীশালা। ১৯১০ সালের ১০ই নভেম্বর এই বিরাশী বছরের বৃদ্ধ বেরিয়ে পড়লেন এতদিনের যত্নে সজ্জিত বৈভব-সাচ্ছন্দ্য ও আভিজাত্যে পরিবেষ্টিত গৃহসংসার ছেড়ে—এ মিথ্যাকে তিনি চিরকাল ঘৃণা করে এসেছেন।

জীবনের এই শেষ অংক সম্পর্কে তাঁর জীবনকাররা নানা কথা বলেন। কেউ বলেন—স্ত্রীর সঙ্গে বিরোধ; কেউ বলেন—তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যের ইন্ধন; কেউ বলেন—উৎকট নীতিবাগীশতা। কিন্তু আমরা দেখছি—জীবন-রূপকারের আর এক ভূমিকা, অন্তিম ভূমিকা। দশ দিন পরে ২০শে নভেম্বর আস্ত্রাপোভা স্টেশনে ভয়ংকর শীতের মধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুস্থতাই তার পরিশেষ।

সব মৃত্যুর মহিমা নেই—কিন্তু কোন কোন মৃত্যুর মহিমা আছে। এই জীবন রূপকারের অন্তিম মুহূর্তটি বোধ করি সেই মহিমার দ্বারা মণ্ডিত। সে মৃত্যু জগতের দৃষ্টি ও স্মৃতির উপরে চিরকালের মত একটা অন্ধকার যবনিকা ফেলে দেয় না—বরং যদি কোন যবনিকার অস্পষ্টতা থাকে, তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় চিরকালের জন্য।

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

Nava Bharat Enterprises Private Limited

"Nilhat House Annexe"

11 R. N. Mukherjee Road
Calcutta-700001

Regd. Office :

"Nava Bharat House"

6-3-654 Somajiguda
Hyderabad-500004

Other Branches :

BOMBAY ● COCHIN ● MADRAS
GUNTUR

MULYAYAN—Sharadiya
Vol.-XIV, No.-2
(Bhadra Aswin 1385 B. S.)

Regd. No.—WB/SC 16
R. N. 13785/65

এই প্রতীক
কী এবং কেন?

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস্,
সেই ১৯৩৬ থেকে দেশ ও দশের জন্যে উৎকৃষ্ট ওষুধের
গবেষণা, উদ্ভাবন ও সরবরাহ করে চলেছে।

এই প্রতীক আধুনিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র তৈরির কাজে দৃষ্ট হইয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস-এর স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত থাকার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এমন
এমন ওষুধ যা ডাক্তার সাহেবরা ব্যবহার করতে বলেন। যা-আই-পি-ওষুধ বলতে বোঝায়।
সালে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের আদর্শবান চিকিৎসক,
বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ এবং ডেমনস্ট্রেটর এর
গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁরা কী চেয়েছিলেন?
চেয়েছিলেন দেশীয়ভাবে বিশ্বমানের ওষুধের
গবেষণা আর উদ্ভাবন করতে। আর সেইসঙ্গে
সুলভে সারা দেশে তার যোগান দিতে।
এই চাওয়া ইতিমধ্যে সার্থক হয়েছে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্
আপনার সেবায়

EIPC-PR-10 BEN

10 OCT 1978

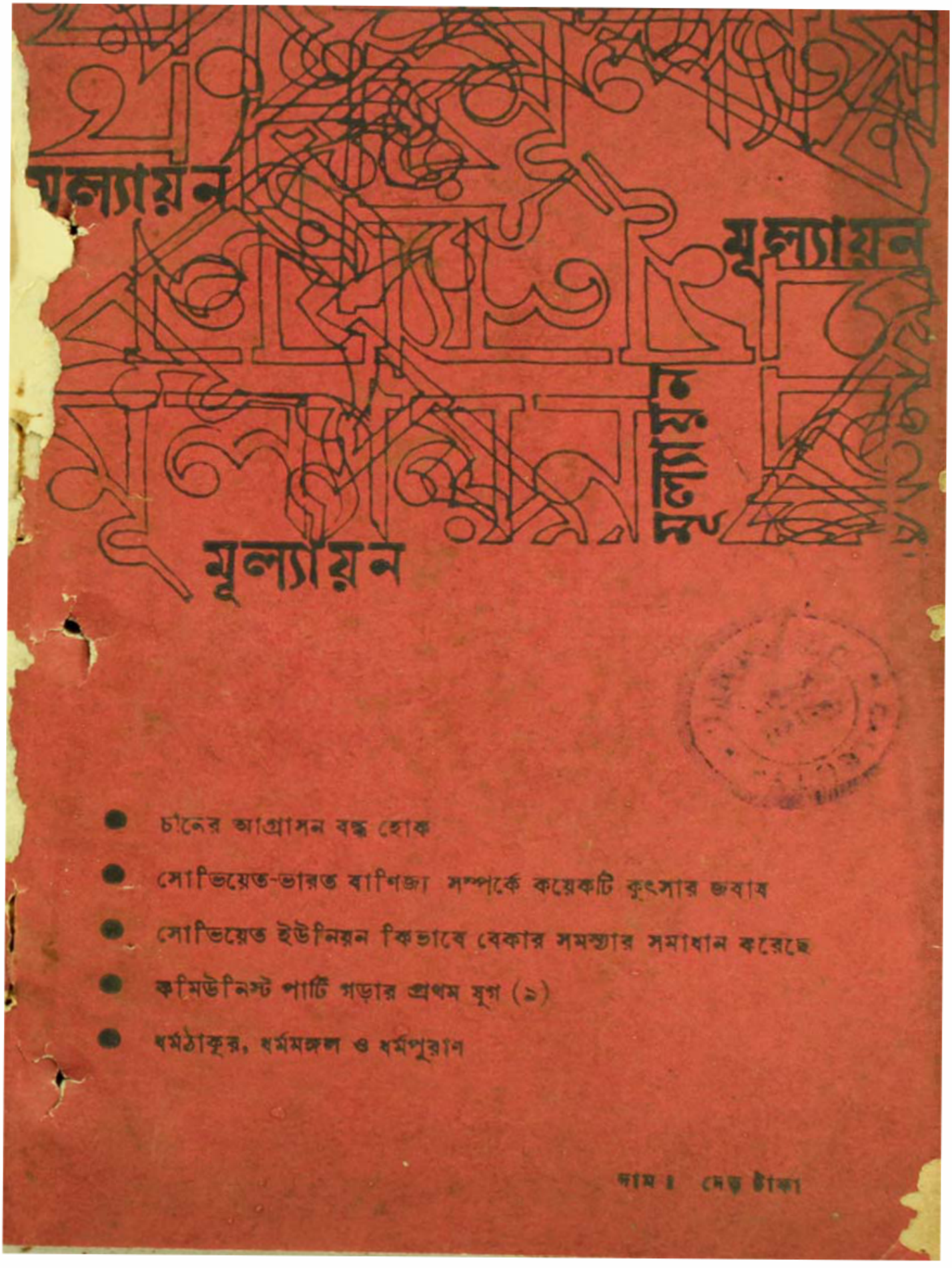

- চীনের আগ্রাসন বন্ধ হোক
- সোভিয়েত-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে কয়েকটি কুৎসার জবাব
- সোভিয়েত ইউনিয়ন কিভাবে বেকার সমস্যার সমাধান করেছে
- কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ (২)
- ধর্মঠাকুর, ধর্মমঙ্গল ও ধর্মপুরাণ

দাম : দেড় টাকা

মূল্যায়ন

বর্ষ ১৪, সংখ্যা ৩
১৩৮৫

সূচী

পৃষ্ঠা

ধর্মঠাকুর, ধর্মমঙ্গল ও ধর্মপুরাণ / সুকুমার মিত্র ১

কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ (১) / রবেন সেন ১২

সোভিয়েত ইউনিয়ন কিভাবে বেকার সমস্যার সমাধান করেছে / অসিত রায় ৩১

সোভিয়েত ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে কয়েকটি কুৎসার জবাব / চারুব্রত রায় ৪৭

অক্টোবর বিপ্লব এবং উপনিবেশ জাতিগুলির ভবিতব্য / ই. ঝুকভ ৫৭

জাতীয় মুক্তির জন্য কাম্পুচিয়ার জাতীয় যুক্তফ্রন্টের ঘোষণাপত্র ৬২

পুস্তক পর্যালোচনা ৭১

সম্পাদকীয় ৮৬

বিয়োগপঞ্জী ৮৯

সম্পাদক : **নরহরি কবিরাজ**

উপদেষ্টামণ্ডলী :

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, পরিমলচন্দ্র ঘোষ, সুশীল জানা,
নির্মালা বাগচী, রণধীর দাশগুপ্ত ।

পবিত্র রায় কর্তৃক কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭
থেকে মুদ্রিত ও ১৫৮ং বকুল রোড, কলিকাতা ১৯ হইতে প্রকাশিত ।

The Book Which Created History :

India Today

Rajani Palme Dutt

HARD BACK Rs. 65/- : SOFT COVER Rs. 40/- WILL APPEAR ON 19.6.79 (Approx) BY 30TH APRIL '79

PAYING ADVANCE OF Rs. 20/- TAKE THE HARD BACK AT Rs. 50/-

,, ,, ,, Rs. 10/- ,, ,, SOFT COVER AT Rs. 30/-

Manisha Granthalaya

4/3B, Bankim Chatterjee Street

Calcutta-73

বিয়োগপঞ্জী

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে প্রগতিশীল শিল্পসাহিত্য আন্দোলনের নেতা কথা সাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান এক নিদারুণ শোকাবহ ঘটনা। যে সময় অপসংস্কৃতির ব্যাপক সংক্রামের বিরুদ্ধে সুস্থ ও মানব প্রগতিবাদী শিল্প সাহিত্যকে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছিল, তখনই দীপেন্দ্রনাথের অকাল বিয়োগ একটা বড় রকমের আঘাত। প্রগতি লেখক সংঘের পক্ষে তা একটা বিরাট ক্ষতি।

যে সময় তরুণ গল্পকারদের হাতে খড়ি হয়, সেই বয়সে দীপেন্দ্রনাথ বাংলা ছোট গল্পের ভাষারীতি নিয়ে সফল নিরীক্ষা করেন—যে অবদান হাল আমলের সাহিত্যে, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর পরবর্তীকালে, এমনকি সমসাময়িকদের মধ্যেও এ অবদান কোন না কোন রকমে প্রভাবিত করেছে, অনেকের মতে, বাংলা ছোট গল্পে তিনি এক আর্ট ফর্মের প্রবর্তক। 'চর্যাপদের হরিণী', 'জটায়ু', 'অশ্বমেধের ঘোড়া', 'পরিপ্রেক্ষিত' প্রভৃতি তার স্বাক্ষর বহন করে।

এ সমস্ত পরিচয় ছাপিয়ে উঠেছিল একজন কমিউনিস্ট হিসেবে দীপেন্দ্রনাথের আত্মত্যাগ। জীবনের প্রায় অর্ধেকটাই কেটেছে কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনের কর্মী হিসেবে এবং 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদকীয় কর্মে। জীবনের শেষ দশক তিনি 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বিয়োগে প্রগতিশীল সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি আন্দোলন হারালো একজন কথাসাহিত্যিক, সংগঠক ও সর্বোপরি একজন একনিষ্ঠ কমিউনিস্টকে।

আন্তর্জাতিক সংখ্যা

মূল্যায়নের এর পরবর্তী সংখ্যা বিশেষ আন্তর্জাতিক সংখ্যা হিসাবে আত্ম প্রকাশ করবে।

এই সংখ্যায় থাকবে: বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়া সম্পর্কে, এশিয়া-আফ্রিকা লাতিন-আমেরিকার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নতুন ধারা সম্পর্কে, বিশেষ প্রবন্ধ।

এই সংখ্যায় থাকবে: কিউবার বিপ্লব, এ্যাঙ্গোলার বিপ্লব, ইথিওপিয়ার বিপ্লব, আফগানিস্থানের বিপ্লব, ইরাণের বিপ্লব সম্পর্কে পৃথক পৃথক নিবন্ধ।

এই সংখ্যায় থাকবে: ভিয়েতনামের ওপর চীনের আগ্রাসন ও কাম্পুচিয়া সম্পর্কে প্রবন্ধ।

এই সংখ্যায় থাকবে: ইওরোকমিউনিজম, মাওবাদ, প্রভৃতি সম্পর্কে বিশিষ্ট আলোচনা।

ভ্রম সংশোধন

গত শারদীয় সংখ্যায় (১৩৮৫, খণ্ড-১৭, সংখ্যা ২) "মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক অবস্থান ও বামপন্থী ঐক্য গড়ার সমস্যা" প্রবন্ধটির ১০৬ পৃষ্ঠায় ১২ লাইনে নিম্নলিখিত মুদ্রন প্রমাদ ঘটে।

নকসালপন্থীরা ভারতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরকে গ্রহণ করেছে।

এই লাইনটিকে পড়তে হবে—নকসালপন্থীরা ভারতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরকে গ্রহণ করে নি।

মূল্যায়ন পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিবরণী

(৪নং ফরম)

১। প্রকাশ স্থান—১০, বকুল রোড, কলিকাতা-১৯

২। প্রকাশের সময়—প্রতি মাসে।

৩। মুদ্রক—পবিত্র রায়।

জাতীয়তা—ভারতীয়।

ঠিকানা—১২ জি, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা-৩০।

৪। প্রকাশক—পবিত্র রায়।

জাতীয়তা—ভারতীয়।

ঠিকানা—১২ জি দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা-৩০।

৫। সম্পাদক—নরহরি কবিরাজ।

জাতীয়তা—ভারতীয়।

ঠিকানা—১০, বকুল রোড, কলিকাতা-১৯।

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—সমীক্ষা প্রকাশনী।

ঠিকানা—১০, বকুল রোড, কলিকাতা-১৯।

আমি, শ্রীপবিত্র রায়, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিলিখিত বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তাং ১০/৩/৭২

পবিত্র রায়
প্রকাশক

ধর্মঠাকুর, ধর্মমঙ্গল ও ধর্মপুরাণ

সুকুমার মিত্র

প্রথমার্ধ

আর একজন দেবতা বাংলাদেশে শুধু হিন্দু ও মুসলমান নয়, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরও বিরোধ ও মিলনের সাক্ষ্য হইয়া রহিয়াছেন, তিনি হইলেন ধর্মঠাকুর। অন্-আর্য বা আদিবাসীদের সূর্য ঠাকুর কালক্রমে বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, লৌকিক পৌরানিক, তান্ত্রিক ও ইসলামী দেব ভাবনার স্পর্শে এক বিচিত্র দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।

ধর্মপূজা এক সময় সমগ্র বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। ফলে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গেরও অধিকাংশ স্থানে ধর্ম শিবঠাকুরে পরিণত হইয়াছেন এবং ধর্মের গাজনই শিবের গাজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাঢ় (পুরুলিয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা সহ) অঞ্চলে এখনও ধর্মঠাকুর স্বতন্ত্র দেবতারূপে পূজিত হইয়া থাকেন যদিও উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ধর্মঠাকুরকে শিব বা বিষ্ণুরূপে পূজা করিয়া থাকেন। এখনও তথাকথিত নিম্নবর্ণের নিকটেই ধর্মঠাকুর সমধিক সমাদৃত এবং তাঁহার গাজন উপলক্ষে ধান চাষ হইতে লোহার কাজ, কাঁসার কাজ প্রভৃতি যাবতীয় দেশীয় শিল্প বহুমানিত হইয়া থাকে।

রাঢ়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও মালভূম অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের প্রতীক ও পাদপীঠ হইল কূর্ম বা কচ্ছপ। এই কূর্মের মধ্যেই ধর্মের আদিরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে 'ধ্ম' শব্দটি কূর্ম-বাচক কোন প্রাচীন অনার্য শব্দের (কোল জাতীয় অর্থাৎ অস্ট্রিক) শব্দের সংস্কৃত রূপ। এই রূপটি হয়ত ছিল "দড়ম" বা "দরম"। অশোক অনুশাসনে এবং চর্যাপদে কূর্মবাচক "ঢাড়ী" বা "ঢালি" শব্দ পাওয়া গিয়াছে। স্ত্রী-কচ্ছপ সূর্যের তথা সন্তান প্রজনন শক্তির প্রতীক বলিয়া আদিবাসীরা মনে করে। ধর্মদেবতাও সূর্যদেবতা। ধর্মঠাকুর পুত্রবরদানের দেবতা অর্থাৎ

উৎপাদনের (Fertility) দেবতা। সূর্য হইতেই সৃষ্টি এই ধারণা শুধু বৈদিক ঋষিদের নয়, প্রাচীন প্রাগার্য জাতিগুলিরও ছিল। এখনও সূর্যের কৃপায় পুত্রলাভের আশায় আদিবাসী রমণীদের মধ্যে উলঙ্গ হইয়া সূর্যের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকার প্রথা আছে।*

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্ত অর্থাৎ 'নাসদীয়' সূক্তের সঙ্গে ধর্ম-সাহিত্যের সৃষ্টি পত্তনের কাহিনীর বিশেষ মিল আছে। আবার 'নাসদীয়' সূক্তের সঙ্গে পলিনেশীয় জাতিদের সৃষ্টি তত্ত্বের বিশেষ সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল অনুমান করেন যে, "ধর্মপূজার মৌলিক রূপ এদেশে অস্ট্রিক জাতির দ্বারাই আমদানি হইয়াছিল।"

ধর্মঠাকুর যে মূলতঃ অনার্য ও লৌকিক দেবতা তাহার আরও কয়েকটি প্রমাণ আছে। যেমন—(১) ধর্মঠাকুর ডোম, নমঃশূদ্র প্রভৃতি বাঙ্গালী যোদ্ধাজাতিদের রণদেবতা (গোয়ালদেরও বটে)

(২) ধর্মঠাকুর অনার্য দেবতা যিনি কৃচ্ছসাধনে, দৈহিক নির্যাতনে— সালে ভর দিলে তুষ্ট হন। ভক্ত স্বহস্তে শিরচ্ছেদ করিলে ("হাকন্দ সেবন" তাঁহার পূর্ণ পরিতৃপ্তি)

(৩) ধর্মঠাকুর অনার্য শিলা দেবতা। ধর্মশিলা ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ অর্থাৎ মোটামুটি কচ্ছপ আকার।

পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে ধর্মপূজার অস্তিত্ব হইতে মনে হয় এখন হইতে অনুমান সার্ধ সহস্র বৎসর বা তাহারও পূর্বে অরণ্যাবৃত রাঢ় অঞ্চলের অনার্য পরিবেশেই ধর্মপূজার উদ্ভব হইয়াছিল। আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার একটি প্রবন্ধে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৮, ২য় সংখ্যা) ঐরূপ ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। দামোদর নদের আসল নাম হইল কোল ভাষায় 'দামু-দা'। 'দামু-দা' (বন্যা) হইতেই 'দামোদর' কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে। 'বরুকা' নদীর উল্লেখ সমস্ত ধর্মসাহিত্যেই আছে। বর্তমান বাকা নদীই 'বরুকা' হইতে পারে এবং বাকা নদীর একাংশ এখনও 'বরুকা' নামেই পরিচিত। বর্ধমান জেলার মেমারি রেল স্টেশনের অল্প দক্ষিণে 'বরুকা'

---

* সাঁওতালদের পুরাণে সূর্যদেব "ঠাকুরবাবা" (বিশ্বসংসারের কর্তা) বলিয়া পরিচিত। ঠাকুরবাবা 'সিংবঙ্গা' বা সূর্যদেব মানুষের সর্বপ্রকার সুখস্বচ্ছন্দের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন মানুষ নিজের দোষেই [illegible]

নামে একটি খাল আছে। এখানে বড়অাঁ নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। বড়অাঁ নামটিও আদিবাসীদের (সাঁওতাল) "বড়ধান" (বা বড়নদী) শব্দ হইতে আসিয়াছে বলিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় মনে করেন।

ধর্মঠাকুরের পূজার মূলে আদিবাসীদের প্রভাব থাকাতেই রাঢ় অঞ্চলে এবং মালভূমে ধর্মঠাকুরের প্রতীক বা পাদপীঠরূপে কূর্ম বা কচ্ছপের মাহাত্ম্য এখনও স্বীকৃত। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে অনার্য বা আদিবাসী প্রভাব না থাকায় বা কম থাকায় ধর্মঠাকুরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া ধর্ম সরাসরি শিবঠাকুরে পরিণত হইয়াছেন।

বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন ও তান্ত্রিক দেবভাবনার সংমিশ্রণ ঘটিবার পর সম্ভবতঃ দশম-একাদশ শতাব্দী হইতে ধর্মপূজা নীতি এত প্রচারিত হইতে থাকে। রামাঞি পণ্ডিত বলে কেউ ছিলেন কিনা জানা যায় নি, তবে ঐ নামে কোন ধর্মপূজা প্রচারক থাকা আশ্চর্যও নয়। ধর্মপূজার অন্যতম প্রবর্তকরূপে 'মগ' বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ময়ূরভট্টের আবির্ভাব বাংলাদেশে সূর্যপূজার প্রবর্তনে ইরানীয় বা পারসিক প্রভাবের ইঙ্গিত দেয়। ভারতীয় সূর্যপূজায় তিনটি ধারার সন্ধান পাওয়া যায়: প্রাগার্য ধারা, বৈদিক ধারা ও প্রাচীন পারসিক ধারা। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক হতে সূর্যপূজার প্রাচীন পারসিক ধারা ভারতবর্ষে প্রথম প্রবর্তিত হয় এবং এই ধারা প্রবর্তন করেন প্রাচীন পারস্যের (বর্তমান ইরান) ম্যাগি (Magi) পুরোহিত সম্প্রদায়। ভারতীয়দের কাছে এঁরা পরে মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শক-যুহানদের অধিকারকালে এঁদের প্রভাব বাড়তে থাকে। ম্যাগি পুরোহিতদের ভারতাগমনের স্মৃতির ছাপ ভবিষ্য পুরাণের প্রথম ও ব্রাহ্ম-পর্বে সুস্পষ্ট।

মগ বা শাকদ্বীপী সৌর উপাসকদের প্রভাবেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সূর্যমন্দির স্থাপিত হয়। কোনারকের বিখ্যাত মন্দির এগুলিরই অন্যতম। কোনারকের মন্দিরে সূর্যপূজার অনুষ্ঠান কখনও হয় নি। অসমাপ্ত অবস্থায় মন্দিরটি পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু মন্দিরের পাশে একটি ছোট মন্দিরে আজও সূর্যদেবতার পূজা হয় এবং শত শত কুষ্ঠরোগী সূর্যের কৃপায় রোগমুক্ত হওয়ার জন্যে আজও দিনের পর দিন প্রার্থনা জানায়।

শহরের নিকটে সোনাত্রপলে একটি বৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এটি সূর্যমন্দির বলেই অনুমিত হয়। বহুদিন পূর্বে এই গ্রামেই একটি সূর্যমূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছিল। সোনাত্রপলে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের বাস ছিল।

ম্যাগি পুরোহিতদের প্রভাবে রোগহর দেবতারূপে সূর্যের পূজা ষোড়শ শতকের মধ্যে উত্তর ভারতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। "সেন-যুগে বাংলা-দেশে যে সূর্যের পূজা প্রচলিত ছিল, সে সূর্য বৈদিক দেবতা নন, মগ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ভারতে আনীত ইরাণীয় সূর্যদেবতা; এবং খোদিত লিপিতে কোনও কোনও সেনবংশীয় রাজার "পরম সৌর" উপাধি, তৎকালীন যে সৌরধর্ম ও সৌর সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সূচিত করে সেই ধর্ম ও সম্প্রদায়ও বিদেশী ইরাণীয় প্রভাবপুষ্ট।" তবে প্রাগার্য ও বৈদিক সৌর ধর্মের সঙ্গে ইরাণীয় সৌরধর্মের যে সমন্বয় ঘটেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ইতিহাসের এই পটভূমিকায় দ্বাদশ শতাব্দীতে ধর্মপূজার প্রবর্তক রূপে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ময়ূরভট্টের আবির্ভাবের বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার।

ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের মতে সম্ভবতঃ ময়ূরভট্ট মহানাদ ধর্মপীঠের প্রবর্তক ও প্রচারক ছিলেন। অবশ্য, ময়ূরভট্টের রচিত কোন ধর্মমঙ্গল বা ধর্মপুরাণের পুঁথি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ময়ূরভট্টের 'ধর্মপুরাণ' জাল প্রমাণিত হইয়াছে। তবে, ময়ূরভট্টের রচিত পুঁথি ছিল ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিশ্বভারতী-সংগ্রহে 'ঐ ধর্মপুরাণ' ও 'ধর্মমঙ্গল' নামে দুইখানি পুঁথিতে ময়ূরভট্ট এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'নিরঞ্জন পুরাণে'র উল্লেখ আছে। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ধর্মঠাকুরকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিলেও ধর্মঠাকুর আজ পর্যন্ত প্রধানতঃ নিম্নকোটির মানুষেরই আরাধ্য দেবতারূপে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। এখনও ধর্ম-ঠাকুরের আসল পূজারী হইতেছেন ডোম, নমঃশূদ্র, বাগদী, কেসট, ধীবর, তন্তুবায়, যোগী, নাপিত, ধোপা, বাকজীবী, শুঁড়ি প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতির ধর্মপণ্ডিতগণ। এখন স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ধর্মের পূজা করেন শিব বা মহাবিষ্ণুরূপে। মালভূম জেলায় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরা ধর্মপূজা করায় এখনও পতিত হইয়া আছেন। আচার্য যোগেশ চন্দ্রের ভাষায়, (ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে) এখন ধর্ম ব্রাহ্মণের ক্লেশ দেখিলে থর থর কাঁপেন···

সংস্কার ধর্মঠাকুরে যুক্ত হইয়াছে। সাপের ভয় বাংলাদেশের সর্বত্র, কাজেই মনসা ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সর্বত্রই আছেন। আবার বাঘের ভয় সুন্দরবন ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলে এক সময় ছিল বা এখনও আছে। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলা ও অন্যান্য স্থানে বাকুড়া রায়, ক্ষুদি রায়, দলু রায়, বোকা রায়, চাঁদ রায়, খেলা রায়, পঞ্চানন্দ রায় প্রভৃতি রায় উপাধিধারী বহু ধর্মদেবতার বাহন 'ব্যাঘ্র' অর্থাৎ 'রায়' দেবতা না হইলেও ইঁহারা বাঘেরও দেবতা বটে। 'বাঘ রায়' নামেও একজন ধর্মঠাকুর আছেন এবং পশ্চিমবঙ্গে 'বাঘ রায়ের থানের অভাব নাই। এই প্রসঙ্গে ধর্মপুরাণে ধর্মঠাকুরের বলিস্বরূপ অজার বিহর্তারে 'বাঘ সেন'কে বসানোর কাহিনী এবং 'অনাদ্য পুরাণে' ধর্মঠাকুরের বল্লুকা তীরস্থ মন্দিরের দ্বারী 'দীপদ বাঘে'র কাহিনীও মনে রাখা দরকার। দেখা যাইতেছে, আদিম যুগে ব্যাঘ্রভীতির ফলে উদ্ভূত ব্যাঘ্র-দেবতা পরবর্তী-কালে ধর্মঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

নিম্নকোটি মানুষের দেবতা বলিয়া মনসাও যেমন বর্ণহিন্দুসমাজে সহজে স্বীকৃতিলাভ করেন নাই, ধর্মঠাকুরও তেমনিই সহজে বর্ণহিন্দুসমাজে মর্যাদালাভ করিতে পারেন নাই এবং বহু বিরোধের পর যখন এই সকল দেবদেবী স্বীকৃতিলাভ করিয়াছেন তখনও তাঁহারা বর্ণহিন্দুসমাজের সম্মানিত উচ্চ স্তরের দেবদেবীতে আসনলাভ করিতে পারেন নাই।

দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ধর্মপূজা প্রচারে ব্রাহ্মণেরা অগ্রণী হইলেও পঞ্চদশ শতাব্দীতেও প্রধানতঃ অন্ত্যজ বা তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা পূজিত ধর্মঠাকুরকে বর্ণহিন্দুগণ অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিয়াছেন। তৎকালীন সামাজিক অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন :

মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে।

এই 'যক্ষ' হইলেন ডোম, নমঃশূদ্র প্রভৃতি যোদ্ধা জাতিদের দ্বারা পূজিত ধর্মঠাকুর।

ধর্মপূজা উচ্চকোটির মানুষের মধ্যে সহজে প্রচারিত হয় নাই ইহার ইঙ্গিতও যাদুনাথের ধর্মপুরাণে পাওয়া যায়। রাজা হরিশ্চন্দ্রের পিতা চন্দ্রকেতু সদাশিব বা সদা ডোমের ধর্মের চেহারা ভাঙিয়া দিয়াছিলেন। স্বপ্নে ধর্মঠাকুর আদেশ পাইবার পর তাঁহার সুমতি হয় এবং তিনি ধর্মপূজা করেন। আবার তাঁহার পুত্র হরিশ্চন্দ্রও ধর্মপূজার বিরোধিতা করেন এবং ধর্মের চেহারা ভাঙিয়া দেন। ধর্মঠাকুর তাঁহাকে [illegible]

হরিশ্চন্দ্র সন্তানহীন হইলেন, তাঁহার রাজ্যের সমস্ত মানুষ, এমন কি পশুপক্ষী পর্যন্ত সন্তানহীন হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। বৃক্ষলতাও ফলফুলহীন হয়। মনসার দৈহিক নির্যাতন অপেক্ষা এই নির্যাতন অনেক বেশী ভয়াবহ। সন্তান-হীন রাজা ও রাণী বহু দুঃখভোগ করিয়া ধর্মঠাকুরের কৃপালাভ করেন এবং ধর্মঠাকুরের ভক্ত হন।

উচ্চ ও নিম্নকোটির বিরোধের অবসান ঘটিতে শুরু করে সম্ভবতঃ তুর্কী আক্রমণের পরে এবং ষোড়শ শতাব্দী বা তাহার কিছুকাল পর হইতে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ধর্মপূজার প্রতি আকৃষ্ট হন। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রভাবে ধর্মঠাকুর শিব বা মহাবিষ্ণুতে পরিণত হন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ধর্মপূজার আদিম রূপ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং প্রধানতঃ নিম্নকোটির মানুষের দেবতারূপেই তিনি পূজিত হইতে থাকেন। তুর্কী আক্রমণের পর ধর্মপূজকরাও লাঞ্ছিত হইতেন এবং মুসলমানগণ ধর্মের দেউল-দেহারা ভাঙ্গিয়া দিত এমন ইঙ্গিত ধর্ম-সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু এই অত্যাচার বেশী দিন চলে নাই এবং নিম্ন-কোটির মানুষ সহজেই তাহাদের পূজিত দেবতাকে মুসলমান সাজাইয়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার প্রভাব বর্ণহিন্দুদের উপরেও পড়িয়াছে। হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলমান ফকীর উভয় সম্প্রদায়েরই বন্দনীয় হইয়া উঠিয়াছেন। কালে ধর্মঠাকুর সন্ন্যাসী অথবা ফকীর মূর্তিধারী দেবতায় পরিণত হইয়াছেন এবং ধর্মঠাকুরের এই সন্ন্যাসী-ফকীর রূপ কল্পনা হইতে পরবর্তীকালে সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ ঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে।"

ধর্ম-সাহিত্য (ধর্মপুরাণ, ধর্মমঙ্গল ও ধর্মপূজা পদ্ধতি)

ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া মধ্যযুগে যে সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে ধর্মমঙ্গল বা ধর্মের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্যগুলি, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে ধর্মপুরাণ অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক শাস্ত্র কথা এবং তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে ধর্মপূজা পদ্ধতি।

নগেন্দ্রনাথ বসু "শূন্য পুরাণ" নাম দিয়া ১৩১৮ সালে ধর্মপূজা পদ্ধতি সংক্রান্ত কয়েকটি ছড়ার সংকলন প্রকাশ করেন। পরে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "শূন্য পুরাণের" একটি সংস্করণও প্রকাশিত হয়। "শূন্য পুরাণে"

পণ্ডিতের নাম আছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে শূন্য পুরাণের ছড়াগুলির রচনাকাল ত্রয়োদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দী, পঞ্চদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী এবং সপ্তদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী এবং বিভিন্ন কবি ছড়াগুলি রচনা করিয়াছেন। ডঃ সুকুমার সেনের মতে শূন্য পুরাণের ছড়াগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের রচনা এবং "নিরঞ্জনের রুষ্মা" শীর্ষক ছড়াটি অষ্টাদশ শতকে সহদেব চক্রবর্তীর রচিত :

মানিক গাঙ্গুলি, রূপরাম, ঘনরাম, সীতারাম প্রভৃতি ধর্মমঙ্গলকার আদি কবিরূপে ময়ূর ভট্টের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত ময়ূর ভট্টের ধর্মমঙ্গলের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "ময়ূর ভট্টের ধর্মমঙ্গল" জাল প্রমাণিত হইয়াছে। অবশ্য, ময়ূর ভট্টের রচিত "নিরঞ্জন পুরাণ" নামে যে একটি পুঁথি ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিশ্বভারতী-সংগ্রহে "শ্রীধর্মপুরাণ" ও "ধর্মমঙ্গল" নামে দুইখানি পুঁথিতে ময়ূর ভট্ট ও তাঁহার রচিত "নিরঞ্জন পুরাণের" উল্লেখ আছে।

যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণ' বিশ্বভারতী হইতে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া 'সাহিত্য প্রকাশিকা'য় (৩য় খণ্ড) প্রকাশিত হইয়াছে। এই ধর্মপুরাণটি নানাদিক হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাদুনাথের ধর্মপুরাণের রচনাকাল ১১০৩ সাল বা ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

এ পর্যন্ত ২০ জন ধর্মমঙ্গল কবির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে খেলারাম চক্রবর্তী ছাড়া আর সকলের লেখা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পাওয়া গিয়াছে। সকলেই রায়ের লোক। খেলারাম চক্রবর্তীকে ধরিলে এই সকল লেখকদের মধ্যে ১২ জন ব্রাহ্মণ, ১ জন সম্ভবতঃ ডোম-পণ্ডিত, ১ জন কৈবর্ত, ১ জন বণিক, ৩ জন কায়স্থ ও ১ জন ভঁড়ি (শৌণ্ডিক)। অপর একজনের (রামনারায়ণ) জাতি পরিচয় পাওয়া যায় নাই। লেখকদের জাতি-পরিচয় হইতেই ধর্মপূজায় ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণ লেখকদের কেহই খুব প্রাচীনকালের লেখক নহেন, শ্রীরাম পণ্ডিতের লেখা কাব্য সম্ভবতঃ রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্য অপেক্ষাও প্রাচীনতর। কিন্তু তাঁহার সামান্য কয়েকটি ভণিতা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় নাই। ভঁহার খণ্ডিত পুঁথির অধিকাংশই ধর্মদাসের (বণিক) রচনার আধুনিক রূপমাত্র।

যে সকল ব্রাহ্মণ কবি ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বীরভূমের মল্লরাজ বংশ। মল্লরাজারা উচ্চবর্ণের হিন্দু বলিয়া গণ্য হন না এবং বীরহাম্বির হইতে বাংলার বাগদী জাতির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া কিংবদন্তি আছে। এই মল্লরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় রূপরাম, সীতারাম, ঘনরাম, দ্বিজ রামচন্দ্র প্রভৃতি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়া ছিলেন। মল্লরাজাদের শাসনকালে ধর্ম ঠাকুরের বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। এখনও বিষ্ণুপুরের সমস্ত অঞ্চল ব্যাপিয়া বহু ধর্মঠাকুর রহিয়াছেন। বিষ্ণুপুর শহর হইতে মাত্র ১২-১৩ মাইল দূরে ময়নাপুর গ্রামে 'শূন্য পুরাণে'র ছড়াগুলির পুঁথি আবিষ্কৃত হয়। শূন্য পুরাণে দলমাদল শিলার উল্লেখ আছে ("দলমাদল শিলা ছিল কমঠ আকার")। দলমাদল রায় নামে ধর্মঠাকুরও আছেন। কাজেই বুঝা যাইতেছে দলমাদল রায় নামক ধর্মঠাকুরের ভক্ত মল্লরাজারা তাঁহাদের আরাধ্য ঠাকুরের নামেই বিখ্যাত 'দলমাদল' কামানের নামকরণ করিয়াছিলেন।* ধর্মঠাকুরের ভক্ত আদিবাসী রাজাদের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ কবিগণ ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই ঘটনা উচ্চকোটি ও নিম্নকোটির হিন্দুদের মিলনের ইঙ্গিত দিতেছে। পঞ্চদশ শতক হইতে এই মিলনের প্রক্রিয়া দ্রুততর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কাব্যে তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে এ পর্যন্ত রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলের প্রথম খণ্ড, ঘনরাম চক্রবর্তীর সম্পূর্ণ কাব্য এবং মানিক রাম গাঙ্গুলির সম্পূর্ণ কাব্য ছাপা হইয়াছে।

রূপরামের ধর্মমঙ্গল

রূপরাম চক্রবর্তীর নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার দক্ষিণপ্রান্তে কাইতির নিকটবর্তী শ্রীরামপুর গ্রামে। এ পর্যন্ত ধর্মমঙ্গল কাব্যের যত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে সেগুলির মধ্যে রূপরামের পুঁথিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ১৫৭১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ রূপরামের ধর্মমঙ্গল রচনা সমাপ্তির কাল। সম্রাট শাহজহানের রাজত্বকালে রূপরাম তাঁহার ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। তখন বাঙলার সুবেদার ছিলেন শাহ্ সুজা। গোপভূমির ব্রাহ্মণ-ভূস্বামী রাজা গণেশ রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া রূপরাম তাঁহার কাব্য রচনা করেন। নিজে

* দল মাদল কামানের ঐ তথ্য সকলে—মানিকলাল সিংহ সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

ব্রাহ্মণ, আশ্রয়দাতা ও পৃষ্ঠপোষকও ব্রাহ্মণ, কাজেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে রূপরামের ধর্মঠাকুরও ব্রাহ্মণের বেশে দেখা দিয়াছেন।

একে শনিবার তায় ঠিক দুপুরবেলা, সম্মুখে দাণ্ডাইল ধর্ম গলে চন্দ্রমালা।

গলায় চাঁপার মালা মাসাবাড়ি হাতে, ব্রাহ্মণের রূপে ধর্ম দাণ্ডাইল পথে॥

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব সত্ত্বেও রূপরাম উদার, সমস্ত দেবদেবী ও পীরদের প্রতি তাঁহার সমান ভক্তি। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের লেশমাত্র ইঙ্গিত তাঁহার রচনায় নাই। গণেশ, ধর্ম, ঠাকুরাণী, চৈতন্য, সরস্বতী ও বিপ্রের বন্দনা করিবার পরে রূপরাম তাঁহার দিগ্ বন্দনায় স্থানীয় সমস্ত ঠাকুর দেবতার বন্দনা গাহিয়াছেন, পীররাও বাদ পড়েন নাই। চৈতন্যোত্তর যুগের কবি রূপরামের চৈতন্য-ভক্তি অপরিসীম। তাই তিনি লিখিয়াছেন:

গোরাচান্দের মহিমা কহিব কার সনে।
গোরাচান্দের কহি কথা শুন একমনে॥
বৈষ্ণব হয় যদি জাতি অবসান।
অবধৌত সন্ন্যাসী নহে তাহার সমান॥
বৈষ্ণব হয় যদি জাতিয়ে যবন।
যুগে যুগে হই তার দাসীর নন্দন॥

যবন বৈষ্ণব হইলে তাহার দাসীর নন্দন হইতেও রূপরামের আপত্তি নাই। হয়ত যবন হরিদাসের কথা মনে করিয়াই চৈতন্যপ্রেমে উচ্ছ্বসিত রূপরাম ঐ কথা লিখিয়াছিলেন।

হিন্দু দেবদেবীর প্রতি রূপরামের ভক্তি যেমন গভীর পীরদের প্রতিও তেমনই। তাই তিনি লেখেন:

বন্দনা বন্দিতে ভাই মন কর স্থির।
পেড়োয় বন্দিব খাইব সুতি খাঁ পীর॥
* * *
মূল তরু কদলী সম্মুখে এড়ে বালি।
মান্দারণ গড়ে বন্দিব পীরিসমালী॥
পীরিসমালী সঙরিয়া পথে চলে যায়।
মৈষে নাহি মারে তারে বাঘে নাহি খায়॥

পেঁড়োর পীর সুতি খাঁর উপরে কবির ভক্তি একটু বেশি বলিয়াই মনে

বন্দিব বড়খাঁ গাজী রিসিবাটি গাঁ।
নিজ বাটী বন্দিব পেঁড়োর শুভি খাঁ॥
ত্রিপর্ণীর ঘাটে বন্দো যাকর খাঁ গাজী।
তাহার মোকামে বন্দো ষোল শয় কাজী॥

মান্দারণ গড়ের পীরিসমালির প্রতিও কবির ভক্তি কম নহে, তাহা ছাড়া কোন পীর পয়গম্বরের প্রতি ভক্তি না জানাইয়া তিনি থাকিতে পারেন না।

পীর-পাথাম্বর বন্দো আছে যতগুলি।
মান্দারণ গড়েতে বন্দিব পীরিসমালি॥
পীরিসমালি সঙরিয়া যে পথে চলে যায়।
দস্যুতে না মারে তারে বাঘে নাহি খায়॥
বন্দিব দরিয়ার পীর নাম কালু রায়।
এক শত প্রণাম প্রভুর দুই পায়॥

ব্রাহ্মণ কবি ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির সহিত লৌকিক ও স্থানীয় সংস্কৃতির পূর্ণ সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

ঘনরাম চক্রবর্তীর "ধর্মমঙ্গল"

কবি ঘনরাম চক্রবর্তীও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। তিনি "শ্রীধর্মমঙ্গল" রচনা করেন ১৭১১ খ্রীঃ অব্দে। মুঘল সাম্রাজ্যে তখন ভাঙ্গন ধরিয়াছে। বাংলা-দেশে মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় শান্তি, শৃংখলা আর্থিক সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। কাজেই অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন পরিবেশেই ঘনরাম তাঁহার কাব্যরচনা করিয়াছিলেন।

ধর্মমঙ্গলকাব্যে ধর্মপালের কোন বংশধরের রাজত্বকালের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু রাজার নাম স্পষ্ট করিয়া কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। ঢেকুর রাজ্য ও ইছাই ঘোষ বা ঈশ্বরী ঘোষের উল্লেখ থাকায় অনুমান করা যায় যে, ধর্মমঙ্গলকাব্যে মহীপালের রাজত্বকালের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মহীপালের ও নয়পালের রাজত্বকাল হইল একাদশ শতক। একাদশ শতকে কলচুরিরাজ গাঙ্গেয় দেব ও কর্ণদেবের আক্রমণে পশ্চিমবঙ্গ এই যুগে বিধ্বস্ত হইতে থাকে। কিন্তু, পালবংশ তখনও একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়ে নাই, ফলে গাঙ্গেয় দেব ও কর্ণদেব জয়লাভে

তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে তিনি পুনরায় বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। বহু যুদ্ধের পর কলচুরিরাজ কর্ণদেব সন্ধি করিতে বাধ্য হন এবং পালরাজবংশ ও কলচুরি রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বীরভূম জেলার পাইকোড় গ্রামে কর্ণদেবের স্তম্ভ এখনও তাঁহার বঙ্গাভিযানের সাক্ষ্যরূপে দাঁড়াইয়া আছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে ইতিহাসের যতটুকু তথ্য পাওয়া তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজবংশের বিরোধ ও মিলনকালের সন্ধিক্ষণের কাহিনীই ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু। কর্ণ সেন-সাউ সেন রায় অঞ্চলে রাঢ়া স্থাপনকারী বর্ণাটকের সেনবংশের কেহ কিনা বলা কঠিন, কিন্তু ইছাই ঘোষের সহিত তাঁহাদের দ্বন্দ্ব সেনবংশের সহিত প্রবল প্রতাপশালী সামন্ত নৃপতি ঈশ্বরী ঘোষের সংঘর্ষের ইঙ্গিত বহন করিতেছে।

ঘনরাম চক্রবর্তী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। বর্ধমানের অন্তর্গত কুকুড়া কৃষ্ণপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। সেকালের অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় ঘনরামও টোলে বিদ্যাভ্যাস করেন। ফার্সী ভাষা না জানিলে অর্থার্জনের ব্যাপারে সুবিধা করিতে পারা যাইবে না বুঝিয়াই ঘনরাম ফার্সী ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অর্থ ব্যতীত এ সংসারে সুখ ও মানমর্যাদা কিছুই থাকে না এই বোধটি ঘনরামের বেশ তীব্র ছিল। শ্রীধর্মমঙ্গলে লক্ষ্মী বন্দনায় ঘনরাম লিখিয়াছেন :

"বিফল জন্ম যার লক্ষ্মী নাই ঘরে।"
কিবা সে পণ্ডিত কবি কুলীন উত্তম।
সহসা সভায় তার না করে সম্ভ্রম॥
লক্ষ্মীছাড়া হইলে কত কুবুদ্ধি সংঘটে।
ঠক, ঠেঁটা, নাবড়, ছেবড় লোকে রটে॥
কুচক্রী চস্‌মখোর, চোকলাখোর হয়।
পাপিষ্ঠ দুরন্ত সেই পুণ্যময় নয়॥

ধর্মঠাকুরের ভক্ত কবি ঘনরাম চক্রবর্তী আর্থিক ব্যাপারে বাস্তববাদী এবং সম্ভবতঃ অর্থলাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি 'শ্রীধর্মমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। গৌড়া ব্রাহ্মণরূপে তিনি ধর্মঠাকুরকে পুরাপুরি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। শিবশক্তি, বিষ্ণুকে বাদ দিয়া

ভক্তি শ্রদ্ধা জানাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ ঘনরাম পীর পয়গম্বরের ধারই ধারেন না। ঘনরাম তাঁহার কাব্য রচনা শুরু করিয়াছেন গণেশ, ধর্ম, শক্তি, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও যোগাদ্যার (দান) বন্দনা গাহিয়া। ধর্মঠাকুর যে নিম্নকোটির মানুষের দেবতা ছিলেন একথা ঘনরাম ভুলাইয়া দিতে চাহিয়াছেন, তবু তাঁহার অজ্ঞাতসারেই উচ্চকোটি ও নিম্নকোটির অথবা বর্ণ হিসাবে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে যে ভেদরেখা ছিল তাহা কয়েকটি লাইনে স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে:

সেন বলে বীর কালু চল ধর্মবাদ।
কালু বলে যাই যদি পাই মদ মাস।
হেথা সেথা কে জানে অক্ষয় স্বর্গপদ।
যথা পাই সদাই শূকর মাংস মদ।
সেন বলে সুরা-ভোগে রাখিব সতত।
কালু বলে স্বর্গকে আমার দণ্ডবত।

ধর্মঠাকুরকে মদ্য মাংস দিয়াই তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ পূজা করিয়াছে। একারণেই পৃথিবীর মানুষ ইহারা, মদ্য-মাংস ছাড়িয়া ইহারা স্বর্গে যাইতে চাহে না। উচ্চবর্ণের আধ্যাত্মিকতা ইহারা বুঝে না, বুঝিতেও চাহে না।

ঘনরাম অষ্টাদশ শতকে, কাজেই সুদূর অতীতের কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করিতে গিয়াও তিনি মুসলমানদের কথা ভুলিতে পারেন নাই। ঘনরাম ঐতিহাসিক নহেন, কাজেই ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি কাব্য লিখিতে বসেন নাই, ইতিহাসের কোন জ্ঞানও তাঁহার ছিল না, তখনকার দিনের একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কাব্যকারের তাহা থাকিবার কথাও নহে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ঘনরামের নিশ্চয়ই পড়া ছিল। তাই মুসলমানদের উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি অনেকাংশে মুকুন্দরামেরই অনুসরণ করিয়াছেন। ইহার ফলে মুকুন্দরামের ন্যায় ঘনরামের রচনাতেও মুসলমানদের সম্পর্কে একটি উদার মনোভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

ঢেকুর পালায় ইছাই ঘোষের রাজধানী বর্ণনা প্রসঙ্গে ঘনরাম লিখিয়াছেন:

ধার্মিক ধনিক পক্ষ যে বণিক
যতেক কর্ণী কুমার
উগ্র ধর্মধারি বসিল আগুরি
[illegible]

• • • •

পুরীর অন্তর, গড়ে স্বতন্তর,
বসিল যবন যত।
পাইয়া মর্য্যাদা কত মিরজাদা
সৈয়দ, পাঠন কত॥
সমর কুশল বসিল মোগল
সেখজাদা যত জনা।
পেলে এক রুটি সবে খায় বাটি
সমরে পাশরে আপনা॥

(পৃঃ ১৫-১৬, বঙ্গবাসী সংস্করণ)

দেখিতেছি ঘনরাম অকপটভাবেই মুসলমানদের ঐক্যবোধ ও বীরত্বের সংগ্রাম উল্লেখ করিয়াছেন।

দুষ্টবুদ্ধি হিন্দুরা প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার জন্য মুসলমানদের দ্বারা প্রতিপক্ষের নারীদের হরণ করাইত এমন ইঙ্গিত ঘনরামের (ধর্মমঙ্গলের সমস্ত রচনাতেই) রচনায় পাওয়া যায়।

লাউসেনের মাতুল মহামদ অতি দুর্বৃত্ত। চক্রান্ত করিয়া লাউসেনকে ধর্মঠাকুরের পূজা করিতে পাঠাইয়া মহামদ গণ্ডারের উপদ্রব দমনের নামে লাউসেনের রাজ্যে হানা দিল। রাজধানী ময়না নগরী অবরুদ্ধ হইল। মহাবীর কালু ডোমের উপর ছিল নগরী রক্ষার ভার। লোভ দেখাইয়া ডোম যোদ্ধাদের হাত করিবার জন্য মহামদ কালুর স্ত্রীকে লখাকে বলিল যে, সে কালুকে রাজা করিতে চায়। লাউসেনের পাটরাণী কলিঙ্গাকে মুসলমান সৈন্যদের দ্বারা অপহরণ করানো হইবে এই ইঙ্গিতও মহামদ দিল।

তবে যে সতিনী বলে মনে ভাব ভয়।
হাদন হুসেন বলে লুটাই না হয়॥

(আগরণ পালা, পৃ. ২৩৩)

বীরাঙ্গনা ও কর্তব্যপরায়ণা লখাকে হাত করিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ মহামদ বলিল—

বেটা কাঁটা ঝুড়ি পেড়ি বেচা হবে সার।

লখার সদর্প জবাব—

লখা বলে জাতিবৃত্তি ভূষণ আমার।

আর,

ভাগিনা বৌকে মোগলে লুটাতি নারি মোরা ॥

মহামদ মন্দারণগড় আক্রমণ করিলে পাটরাণী কলিঙ্গা নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তীব্র ভাষায় তিনি মহামদকে গালি দিলেন।

শুনে পাত্র কোপে জ্বলে, ঈসন হোসেনে বলে,
সমরে শালীর জাতি নে ॥
যুবতী যবন মাঝে সেজে আসে কোন কাজে
বুকেতে নাহিক কুল ভয়।
সবে মিলি ধর ধর যে যার বাসনা কর,
ও মোর ভাগিনা বধূ নয় ॥ (পৃঃ ২৬৭)

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় কবি একজন দুর্দান্ত ও দুষ্টবুদ্ধি হিন্দু মন্ত্রীর জঘন্য চরিত্রটিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই মুসলমান সৈন্যদের ব্যবহার করিয়াছেন, মুসলমানদের সম্পর্কে নিজে কোথাও বিরূপ মন্তব্য করেন নাই।

অনুগত সৈন্যরূপে মুসলমানগণ কলিঙ্গাকে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বীরাঙ্গনা কলিঙ্গা পিছু হটিলেন না। বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিতে করিতে যখন তিনি দেখিলেন যবন সৈন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে তখন নিজের দেহে অস্ত্রাঘাত করিয়া তিনি রাজপুত নারীর ন্যায় মৃত্যুবরণ করিলেন।

কলিঙ্গার পর রাণী কান্‌ড়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। যবন স্পর্শে জাতি যাইবার ভয় ছিল হিন্দু রমনীদের, সেই ভয়ে কান্‌ড়া যুদ্ধযাত্রার পূর্বে পার্বতীর পূজা করিতে করিতে বলে,

যার ভয়ে যদুপতি জলে করে বাস।
যবন দুর্জ্জন হেন করে জাতি নাশ ॥
যদি যুবতীর জাতি যবনে যজায়।
যথার্থ জননী জিউ দিব তোর পায় ॥

যবন বিদ্বেষ অপেক্ষা যুদ্ধজয়ের প্রার্থনাই কান্‌ড়ার মূলকথা।

মুকুন্দরামের মত ঘনরামও মুসলমানদের সম্পর্কে সুস্থ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্যে মুসলমানদের কোন মূল ভূমিকা নাই। হিন্দু নৃপতির সৈন্যরূপে তাহারা পার্শ্বভূমিকা পালন করিয়াছেন মাত্র। ধর্মের ক্ষেত্রে ঘনরাম পুরাপুরিই হিন্দু। ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া তিনি

হিন্দু মুসলমান বিরোধ বা মিলনের আভাসও তাঁহার লেখায় কোথাও পাওয়া যায় না।

মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল

মানিকরাম গাঙ্গুলিও রাঢ়ের অধিবাসী। হুগলী জেলার বেলডিহা (বেল্‌টে) গ্রামে মানিকরামের জন্মস্থান। মানিকরামের ধর্মমঙ্গল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৩১২ সালে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। যে পুঁথি অবলম্বনে মানিকরামের ধর্ম মঙ্গল সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয় তাহা পরে পাওয়া যায় নাই। ১৩৬০ সালে বর্ধমান সাহিত্য সভা কর্তৃক সংগৃহীত আর একটি পুঁথি অবলম্বনে মানিকরামের ধর্মমঙ্গল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের সম্পাদনা করেন বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত। মানিকরামের গ্রন্থ রচনাকাল লইয়া মতভেদ আছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির মতে মানিকরামের ধর্মমঙ্গল রচিত হয় ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু বিশ্বভারতীর শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় মনে করেন যোগেশচন্দ্রের গণনা নির্ভুল নহে। তাঁহার মতে ১৭১১ হইতে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে মানিকরামের ধর্মমঙ্গল রচিত হইয়াছিল। মানিকরামের ভাষা ইত্যাদি আলোচনা করিলে মনে হয় মানিকরাম অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকেই অর্থাৎ ১৭৬৪ হইতে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য, বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত মানিকরামের ভাষার আধুনিকত্ব প্রমাণের জন্য মানিকরাম কর্তৃক "তবল" (stable = আস্তাবল) শব্দটির ব্যবহারের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, ঘোড়ার ব্যবহার আমাদের দেশে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং 'তবল' বা 'আস্তাবল' শব্দটি আসিয়াছে তুর্কী আমলে আরবী "ইস্তাবল" শব্দ হইতে। মানিকরামের কালে (১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ ধরিলেও) লিখিত বাংলায় কোন ইংরাজী শব্দ ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয় না।

ঘনরামের মত মানিকরামও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভক্ত এবং তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছাপও খুবই স্পষ্ট। রামায়ণ, মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণ ও লোক কাহিনীর প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া মানিকরামও

ঘনরামের স্থায় পীরকে ভুলিতে পারেন নাই। স্থানীয় দেবদেবীদেরও তিনি উপেক্ষা করেন নাই। ঘনরাম স্থানীয় দেবদেবীদের প্রতি উদাসীন।

মানিকরাম তাঁহার বন্দনায় বলেন :

ভিতর গড়ের সত্যপীরে করিয়া সেলাম।
মনাইচকের বন্দি মিলিকির মোকাম।।

(মানিকরামের ধর্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, পৃঃ ১১)

এই দুইটি লাইনেই হিন্দু-মুসলমান মিলনের ছবিটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে। বিভিন্ন স্থানের ধর্মঠাকুর, এবং অন্যান্য দেবদেবী সকলকেই মানিকরাম তাঁহার ভক্তি জানাইয়াছেন। উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ সকলেরই দেবতা তাঁহার পূজ্য, এক কথায় মানিকরামের সহিত সাধারণ মানুষের যোগ অনেক ঘনিষ্ঠ। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব তাঁহাকে সাধারণ মানুষ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারে নাই।

আর একটি ক্ষেত্রেও ঘনরাম হইতে মানিকরাম স্বতন্ত্র। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ধর্মঠাকুরকে আত্মসাৎ করিতে চাহিলেও উচ্চ কোটির মানুষ তাহাতে বিশেষ উৎসাহ দেয় নাই, ফলে উচ্চবর্ণের কেহ ধর্মঠাকুরের পূজা করিতে সাহসী হইত না, কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণেরা পতিতও হইতেন। ঘনরাম ইহা গ্রাহ্য করেন নাই এবং তাঁহার কাব্যে ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া কাব্য রচিতে গেলে কোন বিপদ হইতে পারে এমন কোন আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু মানিকরাম ভয় পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে ভরসা দিবার জন্য ধর্মঠাকুর বলিলেন :

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আমি দেব তিন।
ভক্তিবে অভেদ করে না ভাবিবে তিন।

তবু মানিকরাম ভরসা পাইলেন না। ধর্মঠাকুর লোভ দেখাইয়া বলিলেন, "জগত ভরি এ যশ হবেক বিস্তর"। কিন্তু ইহার পরেও মানিকরাম লিখিয়াছেন :

এতেক শুনি এ মোর উড়িল পরাণ।
জাতি যায় হবে প্রভু যদি করি গান।
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে।
দুপক্ষের সভোষে বিপক্ষ পাছে হাসে।।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও লৌকিক সংস্কৃতির ব্যবধান ঘুচিয়া যায় নাই, পক্ষ ও বিপক্ষ রহিয়া গিয়াছে। ঘনরাম কি করিয়া এই প্রশ্ন এড়াইয়া গেলেন তাহা বুঝা যায় না, তবে পরে যদি ঘনরামের অন্য কোন পুঁথি আবিষ্কৃত হয় তাহা হইলে হয়ত সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

যাহাই হউক, মাণিকরামকে দিয়া ধর্মমঙ্গল রচনা করাইবার জন্য ধর্ম-ঠাকুরকে অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হইয়াছিল।

তিনি আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন :

জগত ঈশ্বর কন আমি তোর জাতি।
তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি॥
আমি যার সহায়, এতেক ভয় কেন।
ময়ূর ভট্টের কথা মন দিএ শুন॥
বৈকুণ্ঠে রেখেচি তারে বিষ্ণুভক্তি দিএ।
অদ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিএ॥
সুপক্ষে বিপক্ষে আমি করিব সমান।
এতেক বলিএ প্রভু হল্যা অন্তর্ধান॥

(পৃ. ২১)

মুসলমান যোদ্ধাদের চিত্র ঘনরাম যত বিস্তারিতভাবে আঁকিয়াছেন মাণিকরাম তাহা তত বিস্তারিতভাবে আঁকেন নাই।

মাণিকরামের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। পাত্র মহামদ যখন লাউসেনের রাজ্যে হানা দিল তখন মুসলমান যোদ্ধাদের যুদ্ধ সজ্জার বর্ণনা নিম্নরূপ :—

হাসন হুসন সাজে হাতীর উপর।
সাজ্যা গায় মজা পায় হাতে চাপ সর॥
বাইশ হাজার খোজা বিশারদ মিঞা।
টাঙন উপরে তাজি টাটু যায় নুঞা॥
মোগল পাঠান সাজে খানদামা গাজি।
মুস্তাকিম সেকজাদা মীরমদ্দ গাজি॥

(পৃ: ৪১৮-৪১৯)

বীরাঙ্গনা লখ্যার সহিত যুদ্ধকালে

উত্তরে হাসনবীর যুঝে অনিবার।
সঙ্গে যার সেখজাদা সৈয়দ হাজার॥

পশ্চিমে পাঠান যুদ্ধে পবন যেমন।
ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি তীর ঝড় বরিষণ॥
(পৃঃ ৫১৭)

কিন্তু কানু ডোমের প্রতও আক্রমণে
হাসন হুসন ভঙ্গ দিলেক সমরে।
পলাঙ্গ পালায় যেন গরুড়ের ডরে॥
(পৃঃ ৫৫৪)

ঘনরামের কলিঙ্গা বীরাঙ্গণা যবন সেনাদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি আর উপায় নাই দেখিয়া নিজ অস্ত্রে মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু মানিকরামের কলিঙ্গা লজ্জাবনতমুখী, অবলা নারী। মহামদের কঠোর ভাষা তাঁহাকে আঘাত করে, তিনি ঘরে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন। ইতিমধ্যে—

হাসনে দিলেক টেয়া মাহুদ্যা পাতর।
যবন আগুলে পথ যমের দুসর॥
যুবতী জীবনে ভয় পাছে যায় জাতি।
তরুণী তিয়াসে তনু গলে দিয়া কাতি॥
(পৃঃ ৫৮২)

মুসলমানদের সম্পর্কে ঘনরামের ন্যায় মানিকরামের দৃষ্টিভঙ্গীও সুস্থ ও স্বাভাবিক। মানিকরাম আরও সংযত। তাঁহার যবন সৈন্যরা ঘনরামের যবন সৈন্যদের ন্যায় দুর্বৃত্ত মহামদের আজ্ঞাপালনকারী মাত্র। গৌড়েশ্বরের রাজসভায় ঘনরামের "মীর মিক্রা মোগল পাঠান খোরাসান"দের বাহির মহলে বসাইয়াছেন। মানিকরামের বর্ণনায় দেখি,

কারকুন মুহুরি কাগজ লয়্যা বসে।
মোখাদিম মণ্ডল মজুত আসে পাসে॥

মোখাদিম বা ভদ্র মুসলমানদের মানিকরাম রাজসভায় স্থান দিয়াছেন।

নিম্নকোটির মানুষের সঙ্গে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বহির্ভূত মানুষের সঙ্গে মানিকরামের যোগ গভীর একথা আগেই বলিয়াছি। এই কারণেই মানিকরাম ধর্মঠাকুরকে 'মুক্ত কল্কি-অবতার' বানাইতেও দ্বিধা করেন নাই।

কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ (৯)

রণেন সেন

১৯৩৮ সাল

পুরো '৩৭ সাল ও '৩৮ এর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার পার্টি বেশ ভালভাবেই চলতে থাকে। তবে পার্টি নেতৃত্বে কিছুটা অদলবদল হয়। এতদিন ('৩৬-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত) পার্টির মধ্যে শ্রমিকদের সংখ্যাই বোধ হয় বেশী ছিল। বাংলা পার্টির সেক্রেটারী মণি চ্যাটার্জি রাজাবাগান ডক ইয়ার্ডের শ্রমিক। কিন্তু খুব প্রকাশ্যে কাজ করতে পারতেন না বা তিনি টি ইউ কর্মী ছিলেন না। তাই একে তো বন্দীমুক্তির ফলে প্রচুর নতুন কমরেড আসতে লাগল, টি-ইউ ও প্রকাশ্য কাজের পরিধি বেড়ে গেল, মণির পক্ষে সুষ্ঠুভাবে পার্টি সেক্রেটারীর কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই আমরা প্রকাশ্য ও গোপন কাজের ভাগাভাগি করে নিই। এই সময় (তারিখ মনে পড়ে না) মেটেবুরুজ ও চেতলায় কিছু পার্টির বেআইনী কাগজপত্র পুলিশ তল্লাসী করে পায়। মামলা রুজু হয়, মণি প্রভৃতি ধরা পড়ে। মামলাটার নাম কলকাতা কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা। মামলায় সরকার পক্ষ কাউকে সাজা দিতে পারে না। কার্যত তাই গোপেনদাই সেক্রেটারীর কাজ চালাতে থাকেন।

তখন আমাদের কলকাতায় ১নং কেওরডাইন লেন ও গিরিধর মুখার্জি লেনে (রাস্তার নামটা ঠিক মনে পড়ে না) পার্টি অফিস। কিসান সভার দপ্তর ২৪১নং বউবাজার স্ট্রীটে। কলকাতা ট্রাম ইউনিয়ন অফিসটাও বোধহয় ঐ বাড়ীতেই তখনই খোলা হয়। পার্টি অফিসগুলি বেঙ্গল লেবার পার্টির নামেই ছিল।

১৯৩৭ এর শেষে সুভাষবাবু মুক্তি পান। ১৯৩৮ এর গোড়ায় হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হন এবং প্রকাশ্যেই তিনি কমিউনিস্ট, সি. এস.

মুল্যায়ন, বর্ষ ১২, সংখ্যা ১, ৩, ৩
ঐ বর্ষ ১৩, ,, ১, ২, ৩, ৪
ঐ বর্ষ ১৪ ,, ১

পি. ও অন্যান্য বামপন্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। হরিপুরায় আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিই। এ-আই-সি-সির সভা নির্বাচিত হয়েছিলেন নীহারেন্দু, বঙ্কিমবাবু ও মুজাফ্‌ফর আহমদ।

নতুন পরিস্থিতির সুযোগে বোম্বাই থেকে পার্টি কেন্দ্র 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' নামে সাপ্তাহিক বের করে। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন জোশী, অজয়, অধিকারী, ডাঙ্গে ও রণদীভে, সম্ভবত মাহ্‌মুদ জাফরও। সেটাই পার্টির মুখপত্র ছিল। সে যুগে এই পত্রিকা সারা পার্টির শিক্ষক, সংগঠক ও মুখপাত্র হয়ে সারা বামপন্থী আন্দোলনকেও সাহায্য করেছে। ঐ সময়ই "নিউ এজ" নামে মাসিক পত্রিকা পার্টি কেন্দ্র থেকেই ঘাটের সম্পাদনায় মাদ্রাজ থেকে বের হত। পত্রিকাটি রাজনৈতিক, তত্ত্ব ও মতাদর্শ সংক্রান্ত প্রবন্ধ বা অন্যান্য লেখা প্রকাশ করত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে 'নিউ এজ' বন্ধ হয়ে যায় বা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

মোটের উপর পরিস্থিতি এইরকম দাঁড়ায়—(ক) সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পার্টির প্রভাব, প্রচার ও সংগঠন তুঙ্গে, (খ) সি এস পি ও সুভাষবাবুর সহায়তায় কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের প্রচণ্ড প্রভাব। নেহরুর অবদানও কম নয় এ ব্যাপারে যদিও গান্ধীজীর প্রভাবে তিনি বেশ দোদুল্যমানতার পরিচয় বারবার দিয়েছেন, (গ) দেশে ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র আন্দোলন কংগ্রেসের ভিতরেও প্রভাব বিস্তার করে, (ঘ) অন্যদিকে মুসলিম লীগের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও সাম্প্রদায়িকতার প্রসার (কংগ্রেসও হিন্দু নেতৃত্বে থাকায় ঐ বিষ বপনে কার্যত অনেক সাহায্য ইচ্ছায় অনিচ্ছায় করেছে)।

চীনে মেডিকেল মিশন

জাপান চীন আক্রমণ করে ১৯৩১ এ। কংগ্রেস জাপানের নিন্দা করে ও চীনের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে প্রস্তাব পাস করেই ক্ষান্ত হয় না, কংগ্রেস থেকে চীনে একটা মেডিকেল মিশন পাঠাবার প্রস্তাব হয় ১৯৩৮ এ। পাঁচজন ডাক্তারের একদলকে চীনে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়—ডাঃ অটল, ডাঃ চোলকর, ডাঃ কোটনিস, ডাঃ দেবেশ মুখার্জী ও আমি। কলকাতা থেকে সুভাষবাবুর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে খানা খেয়ে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বিদায় সম্বর্ধনা

দিলাম। আমার কোনও পাসপোর্ট ছিল না। একদিনের নোটিশে চেতলার ডিসপেন্সারী তালা বন্ধ করে ডাঃ বিজয় বোসকে চাবী দিয়ে বাড়ীর কাউকে না বলেই চলে যাই। এই আমার বাগদত্তা লতিকাকে বলেছিলাম। সুভাষবাবু বললেন যে, বোম্বাইয়ে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা, কে এম মুন্সী হোম মিনিস্টার। সুতরাং একদিনের মধ্যে পাসপোর্ট হবে। বোম্বাই স্টেশনে নেহরুর ভগ্নীপতি হাতী সিং আমাদের অভ্যর্থনা করে একটা হোটেলে তুলে দিল। সেখানে ডাঃ চোলকর ও কোটনিসও হাজির। বিকেলে মুন্সীর সঙ্গে দেখা, পাসপোর্ট ফরমে দস্তখত করা ইত্যাদি শেষ করে খুশী মনে হোটেলে ফিরলাম। তার পরদিন মুন্সী ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "মহা মুস্কিল। ভারত সরকার তার পাঠিয়েছে তোমাকে পাসপোর্ট না দিতে, এখন কি হবে।" সেই রাত্রেই ট্রেণে কলকাতা রওনা দিলাম। পৌঁছে সোজা সুভাষবাবুর কাছে যেতে তিনি বললেন যে দেখি কি করা যায়। সুভাষবাবু মিঃ মার্টিন বাংলার হোম সেক্রেটারীকে ফোন করলেন। পরে বললেন যে না আপনার যাওয়া হবে না, আপনাকে সরকার ভীষণ কমিউনিস্ট বিপ্লবী মনে করে। সুভাষবাবু বললেন যে, আমারই মত ২৪ ঘন্টার ডাকে যেতে পারে এমন আর একটা ডাক্তারের সন্ধান চাই। আমি বিজয় বোসকে খাড়া করে নিই সেই দিনই। বিজয় বোস অবশ্য পাসপোর্ট একদিনেই পান ও আর কাউকে (বাবা বা স্ত্রীকে) না জানিয়ে বোম্বাই চলে যান। আর চীন থেকে ফেরেন ৫ বছর পর।

সম্প্রতি জাতীয় মহাফেজখানায় ডাঃ পঞ্চানন সাহা রেকর্ড দেখছিলেন। তিনি আমার ঐ চীনে যাওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে পুলিশের রেকর্ড কপি করে আমায় পাঠিয়েছেন। সেই নীচে অনুবাদ করে দিচ্ছি।

"রণেন্দ্রনাথ সেন।

বিষয়—রণেন সেনের চীনে যাবার পাসপোর্টে আপত্তি।

রেফারেন্স—হোম রাজনৈতিক, এফ ২৮/১০০/৩৮ রাজনৈতিক—জাতীয় মহাফেজখানা।

ডাঃ রণেন্দ্রনাথ সেন পিতা দ্বিজেন্দ্রনাথ, সাং: গ্রাম কালিয়া, জেলা যশোহর বর্তমানে ৪ আফতাব মল্লিক লেন, কলকাতা।

ইণ্ডিয়ায় (সি পি আই) যোগ দেয় ১৯৩২ সালে। '৩৪ এ দুবার রাজদ্রোহ ও দাঙ্গার অপরাধে তিন মাস করে প্রত্যেক দফায় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির হিংসাত্মক কৃষক বিপ্লবের নীতি অনুযায়ী বিপ্লবী কৃষক কমিটি গঠনের নীতিতে বিশ্বাসী। কথিত আছে বি এফ ব্রাডলে মারফৎ কমিন্টার্নের থিসিস পেয়েছে ও "বলশেভিক" নামক পত্রিকা প্রকাশ করে সৈন্যদের বিদ্রোহে উস্‌কেছে (১৯৩৬)।" "কমিউনিস্ট" পত্রিকা (বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির) সম্পাদনার ভারপ্রাপ্ত। ১৯৩৪ এ উইমকো ম্যাচ ফ্যাকটরীতে স্ট্রাইক ঘটায়, চেঙ্গাইল জুট মিলদ শ্রমিকদের নেতৃত্ব করে, '৩৫ এ কেশোরাম সুতাকলে স্ট্রাইক সংগঠিত করে এবং '৩৬ এ রেলওয়ে স্ট্রাইক কমিটিতে যোগ দেয়। গত বছর সি পি আই, বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বি পি কে সি দপ্তরে ঘন ঘন যাতায়াত ও কমিউনিস্ট নেতা মুজাফ্‌ফর আহমদ, সোমনাথ লাহিড়ী, সামসুল হুদা, বিশ্বনাথ দুবে ইত্যাদির সঙ্গে যথেষ্ট মেলামেশা করে। '৩৮ এর মে মাসে সি পি আই দ্বারা মেডিকেল ইউনিটের সভ্য হিসাবে চীনে যাবার জন্য মনোনীত। উদ্দেশ্য চীনের কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন। মনে করা হয়েছিল যে, ইউ পি থেকে পাসপোর্টের দরখাস্ত করবে। তাকে পাসপোর্ট দেওয়া একেবারে অবাঞ্ছিত।

স্বাক্ষর: ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ, এস বি, কলকাতা।"

সত্য-মিথ্যা ওজর আপত্তি করে চীনে যাওয়া আটকানর মত রিপোর্ট কলকাতা থেকে ভারত সরকারের কাছে পাঠান হয়েছিল।

১৯৩৮; আরও কয়েকটা প্রধান ঘটনা লিখে এ অধ্যায় শেষ করব। প্রথম—এই বছরে এ আই টি ইউ সি ও এন এম জোসীদের টি ইউ ফেডারেশনের সংযুক্তি। নাম এ আই টি ইউ সি থাকবে, পতাকা লাল ও তাতে সাদা হরফে টি ইউ সি লেখা থাকবে (আজও তাই আছে) ও কোনও রাজনৈতিক প্রস্তাব দুই-তৃতীয়াংশের ভোট ছাড়া গৃহীত হবে না—এই শর্ত সর্ববাদীসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। ভারতে আবার একটা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় টি ইউ খাড়া হল। বাংলাদেশে টি ইউ সির দফতর ২৪৯নং বউবাজার স্ট্রীটে মৃণালবাবুর অফিসে (দোতলায়) এসে গেল। নাগপুরে এই সংযুক্তির কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয়—শ্রীহট্টবন্ধুদের [illegible]

তারা যেন লেবার পার্টিকেই বেশী প্রাধান্য দিতে চায় (পার্টিতে যোগ দেবার পরও প্রকাশ্য মঞ্চ হিসাবে লেবার পার্টিকে রাখা সাব্যস্ত হয়)। কার্যক্রমেও মতপার্থক্য দেখা দিতে থাকে।

সব ঘন্ব মেটাবার জন্য প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলন ডাকা হয় চন্দননগরে। গোপনে সম্মেলন হয় কিন্তু ঐক্যকে মজবুত করতে পারে না বরং মতপার্থক্য আরও সুস্পষ্ট হল। গোপেনদাকে পাকাপাকিভাবে সেক্রেটারী নির্বাচিত করা হয় ঐ চন্দননগর গোপন কনফারেন্সে।

তৃতীয়—বাংলা থেকে লোক পাঠিয়ে জামসেদপুরে পার্টির বুনিয়াদ গাড়া হয়। টেলকো, ওয়ার প্রডাক্টস ও অন্যান্য শিল্পে ইউনিয়ন গঠন করা হয়। ওয়ার প্রডাক্টসে হরতাল হয়। কমরেড হাজারা সিংকে কোম্পানীর লোক খুন করে (গাড়ী চাপা দিয়ে ?)। যাই হোক্ পার্টির ভিত তৈরী হয়ে যায়। এই জামসেদপুর পার্টি বাংলার সঙ্গে যুক্ত থাকে বহুকাল পর্যন্ত।

চতুর্থ—রাণীগঞ্জের কাগজ কলে মোমিনের নেতৃত্বে (মোমিন '৩৮ এ ছাড়া পায়) ইউনিয়ন গঠিত হয়। এখানে সুকুমার ব্যানার্জী নামে একজন কমরেড নিহত হয় কোম্পানীর লোকদের দ্বারা।

পঞ্চম—দামোদর খালের সেচের জলের ট্যাক্স হঠাৎ বাড়িয়ে দেওয়া হলে এক সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট সকলে এই আন্দোলনে ছিল। ফলাফল মনে পড়ছে না তবে বর্ধমানে সেই কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাত।

ষষ্ঠ—এই বছরেই আবদুর রজ্জাক মলিহাবাদীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে উর্দু 'রোজানা হিন্দ' পত্রিকার রাজনীতি ও সাংগঠনিক পরিবর্তন করা হয়। কংগ্রেস ভাবাপন্ন পত্রিকা থেকে একে কমিউনিস্ট ঘেঁসা পত্রিকায় রূপান্তরিত করা হয়। খাঁসাহেবকে সম্পাদকমণ্ডলীতে নেওয়া হয় ও ঐ ঠিকানায় বাংলায় "আগে চলো" নামে একটা সাপ্তাহিক লাহিড়ী ও পাঁচুবাবুর সম্পাদনায় বের করা হয়। ফলে 'রোজানা হিন্দ' অফিসও আমাদের একটা মিলনস্থল হয়ে পড়ল। কিন্তু প্রায় পাশাপাশি একই কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে দুটা পার্টি চলতে থাকল। গুপ্ত কমিটি আমাদের হাতে, প্রকাশ্য ফ্রন্ট খানিকটা নীহারেন্দুদের হাতে, খানিকটা আমাদের হাতে।

সপ্তম—আন্দামান বন্দীদের মুক্তি আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল। বন্দীদের অবশ্য নিজ নিজ প্রদেশের জেলে রাখা হোক এই দাবীতে জোরদার

সভা ও মিছিল হতে থাকে। তখন লীগ মন্ত্রিসভা। সারওয়ার্দি'র নেতৃত্বে বিভিন্ন মহল্লায় মুসলমান জমায়েত ও পাল্টা মিছিল প্রভৃতি ঘটতে থাকে। চলল মিছিল ও পাল্টা মিছিলের পালা। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বন্দীমুক্তির উপর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কংগ্রেস থেকে অনাস্থা প্রস্তাব উপস্থিত হয় তবে ভোটে হেরে যায়। ভোটের আগের দিন লীগের হামলার ভয়ে জে সি গুপ্ত প্রভৃতি অনেক কংগ্রেস এম এল এ বিধানসভায় হাজিরা দেন। বাংলায় উত্তেজনা প্রচণ্ড হয়ে ওঠে।

আন্দামান বন্দীরা জেলে দেশে ফেরার দাবীতে অনশন শুরু করে দেন। সংবাদ ভারতে পৌঁছুলে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। গান্ধীজীকেও কলকাতায় আসতে হয়। বন্দীমুক্তি কমিটি স্থাপিত হয় যাতে শরৎ বোস প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের পার্টির প্রতিনিধিও ছিলেন (নাম মনে পড়ছে না)। এই আন্দোলনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। শ্রমিক-শ্রেণী বিভিন্ন টি ইউ মারফৎ ধর্মঘট ও মিছিলে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু ব্যাপারটা লীগ কৌশলে সাম্প্রদায়িক করে তুলবার চেষ্টায় খানিকটা সফল হয়। লীগ বোঝায় যে, হিন্দুর ষড়যন্ত্র লীগ সরকারকে উচ্ছেদ করার। মুসলিম জনতাও কিছুটা বেশ বিভ্রান্ত হয়ে মুসলিম লীগ সরকারের সমর্থনে দাঁড়ায়।

যাইহোক্, যদিও আন্দামান বন্দীরা মুক্ত হতে পারলেন না, এই আন্দোলনের ফলে মন্ত্রিসভার সাথে যে সমঝোতা হয় তার ফলে বন্দীরা দেশের জেলে ফিরতে পারলেন ও কিছু অন্যান্য সুবিধাও পেলেন। এই বন্দীরা শেষ ছাড়া পান ১৯৪৬-এ আবার একটা বিরাট আন্দোলনের ফলে। তখন অবশ্য ইংরাজ যাবেই বোঝা যাচ্ছিল এবং বাংলার প্রধানমন্ত্রী শহীদ সারওয়ার্দি নিজে এবিষয়ে কিছুটা উদ্যোগী হন। ১৯৩৮ এর বন্দী মুক্তি আন্দোলনে পার্টির উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও গৌরবজনক ভূমিকা দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের প্রশংসা অর্জন করে।

এইসব আন্দোলনের ভিতর দিয়ে আমরা ক্রমশই বেশী বেশী জন-সাধারণকে আমাদের দিকে আকৃষ্ট করি ও পার্টির শক্তিবৃদ্ধি পায়।

যতটা মনে পড়ে '৩৮ এর শেষাশেষি সুভাষবাবুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যের বামশক্তিগুলির একটা জমায়েত বা ফ্রন্ট গঠিত হয়—নাম দেওয়া হয় "লেফ্‌ট কন্‌সোলিডেশন কমিটি।" এই কমিটির মুখ্য ধ্বনি ছিল—আপসহীন সংগ্রাম—বৃটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে, পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য। এই কমিটিতে

সুভাষবাবু, সি এস পি-র কয়জন (জয়প্রকাশ প্রভৃতি) ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি (বোধহয় বঙ্কিমবাবু, নীহারেন্দু ও লাহিড়ী) সভ্য ছিলেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলায় শুধু নয় সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ও উত্তর প্রদেশে সি এস পি-র মধ্যে অনেক কমিউনিস্টই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—যথা ডঃ আহমদ, ডাঃ আশরফ, সাজ্জাদ জহীর (ইনি সর্বভারতীয় সি এস পির অন্যতম সম্পাদক হয়েছিলেন)। এরা প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট বলে পরিচয় না দিলেও সকলেই বুঝত যে এরা কমিউনিস্ট। ১৯৩৬-এর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর ডাঃ আহমদ, আশরফকে লোহিয়ার সঙ্গে এ আই সি সি-র বিভিন্ন দফতরে নেহরুই নিয়োগ করেন যে জন্য কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা নেহরুর উপর রুষ্ট হন। ফলে সি এস পি-র দক্ষিণ অংশ যথা অশোক মেটা, লোহিয়া, মাসানী ইত্যাদি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না। মাসানী প্রভৃতিরা সি এস পি-কমিউনিস্ট মিতালীতে চিড় খাওয়াতে পারে নি, বিশেষ করে যে পি যখন এই মিতালী বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। ঐ সময় রাজাজী, আচার্য কৃপালনী ও রাজেন্দ্রবাবু প্রভৃতির নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থীরা কংগ্রেসে মাথাচাড়া দেন। তাঁরা কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্টদের উপর রাজনৈতিক হামলা চালাতে থাকেন।

১৯৩৯ সাল—কংগ্রেসে ভাঙ্গন।

বৃটিশ সরকারের বরাবরই চেষ্টা থাকে জাতীয় আন্দোলনে বিভেদ আনার। কখনও কমিউনিস্ট হুজুর অবতারণা করে, কখনও বামপন্থী শক্তির বিভীষিকা সৃষ্টি করে। কখনও কিছুটা আরও ক্ষমতা ও অধিকারের টোপ ফেলে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের হাত করার চেষ্টায় সরকার কখনও কার্পণ্য করে নি। ভারতে একটা ফেডারেল কাঠামোর সরকারী পরিকল্পনা, জনপ্রতিনিধিদের হাতে আরও ক্ষমতা ন্যস্ত করা, ফেডারেল বিচার আদালত সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষমতা ও অধিকার জাতীয় বুর্জোয়াদের দেবার প্রস্তাব বৃটিশ সরকার করে এবং এই প্রসঙ্গে নানা কথা ও প্রতিশ্রুতির অবতারনাও করা হয়। নির্দলীয় ব্যক্তিদের মারফতও ঐ সমস্ত কথাবার্তা তোলা হতে থাকে। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদেরও কিছু বক্তব্য কাগজে প্রকাশিত হয়। হাওয়াটা ছিল যেন একটা নতুন কোন আপোষ কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে হতে চলেছে বা হতে পারে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে বা এ আই সি সি-তে ঐসব [illegible] 'ন্যাশনাল ওয়ার' পত্রিকা ঐসব আপোষের

চেষ্টা কিছুটা ফাঁস করে দিয়ে দেশকে ও কংগ্রেসকে বৃটিশের কুমতলবের ফাঁদ থেকে হুশিয়ার করে দেয়। সি এস পি-র পত্রিকাও ঐসব বৃটিশ ষড়যন্ত্র ও দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে লেখে। সুভাষবাবুও বোধহয় কিছু আঁচ করেন যে তার পিছনে কংগ্রেসের মধ্যে একাংশ একটা আপোষের চেষ্টায় আছে।

সুভাষবাবু সেদিন অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সঙ্গে প্রকাশ্যে আপোষের প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে, কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা থেকে একপাও পেছুবে না। আপোষের চেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য কংগ্রেসকে ডাক দেন সুভাষবাবু।

বামপন্থীরা তাঁর আহ্বানে উল্লসিত হয় কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা হয় নিরতিশয়-ক্ষিপ্ত। তারা বললেন যে কাল্পনিক কতকগুলি কথা ও ব্যাপারে কংগ্রেস সভাপতি যে প্রকাশ্য অভিযোগ করেছেন তাতে তাঁর সহকর্মীদের উপর তাঁর আস্থার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাই একত্র কিভাবে কাজ করা যায় ইত্যাদি। গান্ধীজীও তাদের কথায় সায় দেন ও সুভাষবাবুকে তিরস্কার করেন। নেহরু তুষ্ণীভাব অবলম্বন করেছিলেন—কোনপক্ষেই বলেন নি।

সারাদেশ এই বিতর্কে সচকিত হয়ে উঠল। বৃটিশের সাথে আপোষ অথবা স্বাধীনতার জন্য আপোষহীন সংগ্রাম—বামপন্থীরা এইভাবে প্রশ্নটি রাখে বা দক্ষিণপন্থীরা রাখে যে মন্ত্রণার অভাব হলে এক কমিটিতে কাজ একসাথে কিভাবে করা যায় এ শুধু কংগ্রেসকে ভাঙ্গবার বামপন্থী ষড়যন্ত্র ও কংগ্রেস সভাপতি তাদের পাণ্ডা হিসাবে আপোষ অথবা আপোষ না এই মিথ্যা প্রশ্ন তুলে দেশকে বিভ্রান্ত করছে।

বাংলাদেশ এই ঘাতপ্রতিঘাতে চঞ্চল হয়ে উঠল। বাংলায় দক্ষিণপন্থীরা কখনই শক্তিশালী ছিল না। গান্ধীবাদী প্রফুল্ল ঘোষ বা দক্ষিণপন্থী কিরণ শঙ্কর রায় কখনই জননেতা হিসাবে খ্যাত ছিলেন না। যেসব বিপ্লবী নেতা সুভাষের বিরুদ্ধে (যথা যুগান্তর দলের) তারাও প্রকাশ্যে আপোষহীন সংগ্রামের কথাই বলতেন। বাংলা বামপন্থী আন্দোলনের একেবারে শীর্ষে অবস্থিত ছিল। আর কমিউনিস্ট পার্টি তো অন্যতম ধারক ও বাহক বামপন্থী আন্দোলনের।

কংগ্রেসের নতুন সম্মেলন আসন্ন। নতুন সভাপতি নির্বাচন হবে। কে হবে

পন্থীদের সমর্থনে সভাপতির জন্য দাঁড়ালেন পট্টভি সীতারামিয়া, বামপন্থার, আপোষহীন সংগ্রামীদের প্রতিভূ হিসাবে দাঁড়ালেন সুভাষচন্দ্র। এক বিরাট সংগ্রামের অবতারণা হল। মনে পড়ে বাংলার এ আই সি সি সভ্যদের ভোটস্থল প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে একটা বাড়িতে। সামনে লোকে লোকারণ্য— সব ভোট দেখতে এসেছে। ময়মনসিং কংগ্রেসের সভাপতি সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ আর সম্পাদক জ্ঞান মজুমদার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এলেন। সুরেন্দ্রবাবু জ্ঞান বাবুর হাত ধরে বললেন চলুন দুজনে একসঙ্গে একইজনকে ভোট দিতে যাই অর্থাৎ সুভাষবাবুকে। দিয়েছিলেনও তাই। উদ্দেশ্য যে পরে কোনও গুজব না রটে যে সুরেনবাবু পট্টভিকে ভোট দিয়েছেন অর্থাৎ তিনি দক্ষিণপন্থী! সারা ভারতে বামপন্থীরা এত শক্তিশালী যে গান্ধীজী ও বল্লভভাই প্যাটেলের চেষ্টা সত্ত্বেও সুভাষবাবু বিপুল ভোটে সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী বিবৃতি দিয়ে বললেন "আমার পরাজয় হল।"

সংকট আরও ঘনীভূত হল নির্বাচনের পর। সভাপতিই নতুন ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়ন করেন। দক্ষিণপন্থীরা বলল গান্ধীজীর সাথে পরামর্শ করুন, নতুবা আমরা থাকব না। সুভাষবাবু গান্ধীজীর কাছে দৌড়ালেন কিন্তু গান্ধীজী কোনও মতামত দিলেন না। ব্যাপারটা দাঁড়াল যে, এবার ঠেলা বোঝ!

সুভাষবাবু অগত্যা প্যাটেল, রাজেন্দ্রবাবু, নেহরু প্রভৃতিকে মনোনীত করলেন কিন্তু তাঁরা ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকতে অস্বীকার করলেন। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে এই দলাদলি চরমে প্রকাশ পেল। দক্ষিণপন্থীরা সুভাষবাবুকে নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়ল।

পার্টির সামনে একটা নতুন সমস্যা এল। এই রকম সংকটে কি করা? সি এস পি দোদুল্যমান। ত্রিপুরীতে পার্টির পি বি বৈঠকে ঠিক হল যে আমরা নিরপেক্ষ থাকব কেন না পরিণতি ভাঙ্গনের দিকে। সি সির কয়েকজন সভ্য পি বির সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করায় উপস্থিত সি সি সভ্যদের সভা ডাকা হল। আমি উপস্থিত ছিলাম না। পরে শুনেছি যে, সি সি অধিক ভোটে ঠিক করে যে সুভাষবাবুকেই সমর্থন করা হোক। করাও তাই হল।

রাজাজী, গোবিন্দবল্লভ পন্থ ও প্যাটেলের আক্রমণ প্রকাশ্যে তীব্র থেকে তীব্রতর হল। সভাপতির ক্ষিতেও পরাজয়ের করে [illegible]

সব বয়কট করে বসলেন তাঁকে। কংগ্রেসের কাজ অচল। গান্ধীজীর বিবৃতির পর বিবৃতিতে একই কথা সুভাষকে রাখলে চলবে না।

কিছুদিন পর কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এ আই সি সি সভায় সুভাষবাবু পদত্যাগ করলেন। রাজেন্দ্রবাবু তখনই সভাপতির শূন্যপদ পূরণ করলেন। বাংলার বামপন্থীরা ক্ষিপ্ত—দারুণ উত্তেজনা। কিন্তু করবার কিছুই রইল না। রাজেন্দ্রবাবু গান্ধীজীর আশীর্বাদপুষ্ট নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করলেন তাতে নেহরুও রইলেন। যদিও সুভাষের কমিটিতে তিনি থাকতে চান নি!

কথাগুলি স্পষ্ট আমার মনে আছে। তাই বাস্তব ঘটনা শুধু বিবৃত করছি। এটাই ইতিহাস পরের ইতিহাস যাই হোক না কেন।

জাতীয় আন্দোলন এক সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। কংগ্রেস দ্বিখণ্ডিত হল। সুভাষবাবু কংগ্রেসের বামপন্থীদের নিয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করলেন। সঙ্গে পেলেন অনুশীলন, শ্রীসংঘ, বিভি প্রভৃতি দলগুলিকে। সি এস পি ও সি পি আই কংগ্রেসেই থেকে গেল। বামপন্থীরাও এইভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ল। সুভাষবাবু ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অ পোষহীন সংগ্রামের ডাক দিলেন। সি পি আই থেকে নীহারেন্দু ও তার সাঙ্গপাঙ্গ বেরিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিল।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এর আগেই মিউনিকের ঘটনাবলী ঘটেছে। হিটলারের আগ্রাসন নীতি বৃটিশ ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এসব ঘটনাবলীর অনেক বিবরণ কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট পুস্তক পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে এমনকি এখনও হচ্ছে। তাই তার মধ্যে আর গেলাম না। হিটলারের প্রতি পদক্ষেপ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতির পর্ব বিশেষ।

স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে হিটলারকে প্রতিরোধ করার জন্য, বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাবার জন্য বারবার সবিশেষ চেষ্টা করে বিফল হয়। অগত্যা নাজীবাহিনীর পূর্বাভিমুখীন গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত সরকার জার্মান সরকারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত করে, হিটলারকে পূর্বাভিমুখে লেলাবার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেয় অন্তত সাময়িকভাবে।

মিত্রশক্তি (ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি) জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হল।

আমি এখানে কেবলমাত্র এই যুদ্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন দল ও মতের প্রতিক্রিয়া ও কার্যকলাপের কিছু চর্চা করব।

ক) কংগ্রেস মিউনিকের ঘটনাবলীর সময়ই ফ্যাসিস্ট আক্রমণের ও বৃটিশ-ফরাসী সরকারের নিন্দা করেছিল। বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে নাৎসী আক্রমণের নিন্দা করে ও বৃটিশ সরকারকে তার যুদ্ধের উদ্দেশ্য ঘোষণা করতে আহ্বান জানায়। অর্থাৎ বৃটিশ সরকার কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে, যুদ্ধের মধ্যে তার উপনিবেশগুলি সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করবে এবং যুদ্ধ জয়ের পরেও বা কি করবে সুস্পষ্ট ঘোষণা করতে বলে।

খ) ফরোওয়ার্ড ব্লক ও অন্যান্য বামপন্থীদল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবে আরও দৃঢ়তর হয় যদিও অন্তরে ছিটলারকেই বাহবা দিচ্ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ আঘাত হানবার জন্য সব পার্টিকে আহ্বান জানায় সঙ্গে সঙ্গে ছিটলার ও ফ্যাসিস্টবাদের নিন্দাবাদ করে।

স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে ভারতে এসে কংগ্রেস নেতাদের সরকারের সাহায্যে এগিয়ে আসতে বলে। কিন্তু কংগ্রেস জানায় যে, যুদ্ধকালীন এক ভারতীয় সরকার গঠন করলে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধোত্তরকালে ভারতের স্বাধীনতা দেবার অঙ্গীকার দিলে কংগ্রেস যুদ্ধে বৃটিশকে সাহায্য করতে পারে। ক্রীপস রাজী হয় না।

মুসলিম লীগের মনোভাবও খুব বৃটিশের পক্ষে ছিল না তবে এই ফাঁকে বৃটিশকে দিয়ে কিছু কবুল করান বা আদায় করা যায় কিনা এই ফিকিরে ছিল। পাকিস্তানের পরিকল্পনা লীগ মহলে আলোচনা চলছিল এবং যুদ্ধের মধ্যেই ১৯৪০ সালে লাহোরে লীগ সম্মেলনে পাকিস্তান প্রস্তাব পাসও হয়।

এই সময় পার্টি থেকে দুখানা পুস্তক প্রকাশিত হয় 'প্রোলিটেরিয়ান পথ' ও 'পার্টিজ এণ্ড পলিটিকস আনমাসকড'। প্রথমোক্ত পুস্তকে বিপ্লবাত্মক কর্মসূচী – সাধারণ ধর্মঘট, রাজনৈতিক ধর্মঘট ও সশস্ত্র সংগ্রামের পথই যে একমাত্র পথ তা দেখান হয়। শেষোক্ত পুস্তকে বুর্জোয়া দল যথা কংগ্রেসের রাজনীতি ও আপোষমুখীন নীতি ও মনোভাবের নিন্দা করা হয়। পার্টি ও জি কে ইউ-

হরতাল করে। তার কিছু পরে প্রায় ছলক্ষ সুতাকল শ্রমিক আবার মাগগী-ভাতার দাবীতে ধর্মঘট করে দেশবাসীকে সচকিত করে তোলে।

পার্টির কথা ও কাজের ফলে দেশপ্রেমিক ব্যক্তিমাত্রই পার্টির প্রতি আস্থা-স্থাপন করে। বিভিন্ন বামপন্থী দলের অনেক লোক পার্টির ধারে কাছে আসতে থাকে। ঐসময়ে সরকারী দমননীতি পার্টির উপর দারুণভাবে প্রযুক্ত হয়।

১৯৩১ সালের শেষ দিকে বৃটিশ সরকার সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট পার্টির উপর আক্রমণ শুরু করে। বোম্বাই, কলকাতা, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে কমিউনিস্ট নেতারা গ্রেফতার হন। ডাঙ্গে, রণদীভে, অজয়, লাহিড়ী আগে পরে ধরা পড়ে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কিভাবে বেকার সমস্যার সমাধান করেছে

অসিত রায়

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই পৃথিবীতে একমাত্র সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে বেকার সমস্যার পূর্ণ এবং চিরস্থায়ী সমাধান সম্ভব। বিশ্বের ইতিহাসে সোভিয়েত ইউনিয়নই সর্বপ্রথম বেকার সমস্যার পূর্ণ সমাধান করেছে। এই সমাধান কিভাবে হল; কেমন করে সোভিয়েত রাষ্ট্র তার সমস্ত নাগরিকের জন্য কাজের গ্যারান্টি দেয়—এইগুলি বেকার সমস্যায় জর্জরিত ভারতীয় জনগণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

বিশ শতকের সুরুতে রুশ দেশে বেকার সমস্যা ছিল ভয়াবহ সমস্যা, অনাহারে দরিদ্র মানুষের মৃত্যু তখন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পরে রাশিয়ার শত শত কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯১৬ সালে বাঁচা মাল, কয়লা, তেল ও বিদ্যুতের অভাবে সমগ্র পরিবহণ ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে যায়। ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের তিন বছর অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের সময় এক সমীক্ষায় প্রকাশ পায় যে, ৪৮০০ প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বন্ধ এবং চাকুরীর সংখ্যা ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ১৯২১ সালে থেকে সোভিয়েত-ইউনিয়নে বেকার সমস্যা আবার বৃদ্ধি পায়। তার কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ এবং বৈদেশিক আক্রমণ মোট সাত বছর ধরে চলেছিল, যার ফলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ঠিক এই সময় অর্থাৎ '২১ সালে দেশজুড়ে সুরু হল অভূতপূর্ব অনাবৃষ্টি। তার ফলে কৃষি উৎপাদনও দারুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গ্রাম থেকে শহরে খাদ্য ও কাঁচামাল রপ্তানী প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৪ সালে কেবলমাত্র শহর-গুলিতে ১৩ লক্ষ কর্মক্ষম লোক ছিলেন বেকার। দেশজুড়ে বেকার সমস্যা প্রধান সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

১৯২১ সালে লেনিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী New Economic Policy

চালু হয় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছোট ছোট শিল্প ও কুটির শিল্প গড়ে তোলার উৎসাহ দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ কিছুটা শিল্প পুঁজি গড়ে তোলা এবং অর্থনীতিকে একটু চাঙ্গা করা। অবশ্য বৃহৎ উৎপাদন ব্যবস্থা পুরোপুরি রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল। ১৯২৩ সালে কলকারখানার সংখ্যা এবং উৎপাদন কিছু বাড়ল এবং শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তখনও বেকার সমস্যা যথারীতি প্রতি বছরই বেড়ে চলছিল। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সামনে অপেক্ষমান চাকুরী প্রার্থীদের লাইন তখনও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছিল। তার কারণ এখন শহরের বেকার সমস্যার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্রাম। জারের রাশিয়ায় কৃষিতে ২ কোটি বাড়তি লোক ছিল —অর্থাৎ ভূমিহীন কৃষক। বিপ্লবের পর দ্রুতগতিতে বহু এলাকায় সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ এবং ভূমি সংস্কার করা হল বটে কিন্তু সমস্ত ভূমিহীন কৃষককে জমি দেওয়া সম্ভব হয় নি। এই উদ্বৃত্ত ভূমিহীন কৃষকরা কাজের সন্ধানে দলে দলে শহরে আসতে সুরু করল। ১৯২৩-২৪ সালে ১৫ লক্ষ এবং ১৯২৫ সালে ৩০ লক্ষ উদ্বৃত্ত ভূমিহীন কৃষক চাকুরীর আশায় শহরগুলিতে এসে ভীড় করে। ফলে শহরের বেকার সমস্যা এক লাফে অনেক বেড়ে গেল। একই সঙ্গে শহরের বেকার শ্রমিক কর্মচারী জনসাধারণ এবং সদ্য বয়োপ্রাপ্ত তরুণরা কাজের জন্য ভীড় করছিল। গ্রাম থেকে আগত এই কৃষিজীবীদের অধিকাংশই ছিলেন নিরক্ষর এবং কলকারখানা বা অফিসের কাজের পক্ষে অদক্ষ। বেশীর ভাগ লোকেরই কায়িক পরিশ্রমের যোগ্যতা ছাড়া আর কিছু ছিল না। যে পরিস্থিতির মধ্যে সেদিন নিত্য সোভিয়েত রাষ্ট্র পড়েছিল তার মোকাবিলা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু এটাই আশ্চর্য যে এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটল অতি দ্রুত এবং আমূলভাবে। ১৯২৮-২৯ সালের হিসাবেও দেখা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে তখনও ১৭ লক্ষ বেকার। কিন্তু ১৯৩০ সালের মধ্যে এই সমস্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ১৯৩০ সালের ৭ই নভেম্বর, নভেম্বর বিপ্লবের ত্রয়োদশ বার্ষিকীতে প্রাভদা ঘোষণা করল—'শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী কৃষকশ্রেণীর মৈত্রীর নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে বেকার সমস্যার পূর্ণ সমাধান হয়েছে।"

তারপর থেকে আরও ৪৮ বছর পার হতে চলেছে। এই সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে সোভিয়েত দেশে নূতন করে এই সমস্যা সৃষ্টির কোন [illegible]

মন্দার এমনকি এ যুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের অবাধ জয়যাত্রা, অর্থাৎ অটোমেশন, কমপিউটার, সাইবারনেটিকস-এর ব্যাপক বিস্তার হওয়া সত্ত্বেও সে দেশে বেকার সমস্যার পুনরাবির্ভাবের কোন আশংকা দেখা দেয় নি।

অথচ এরই পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশ আজ বেকার সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের কথা না তোলাই বোধহয় ভাল। কারণ ১৯৭৮ সালের ৩১ মার্চের হিসেব অনুযায়ী ভারতে এখন রেজিস্ট্রিকৃত বেকার সংখ্যাই ১ কোটি ১০ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩ জন। কিন্তু উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতেই বা কি অবস্থা? ১৯৭৭ সালের মাঝামাঝি পৃথিবীর উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৮০ লক্ষ। এঁরা অশিক্ষিত বা নিরক্ষর নন। এদের সকলেই শিক্ষিত এবং বিভিন্ন কাজে দক্ষ, অনেকে আবার উচ্চ শিক্ষিত অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কৃষিবিজ্ঞানী বা লেখক হিসাবে কাজ করার যোগ্যতাসম্পন্ন।

১৯৭৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকার সংখ্যা ছিল ৮০ লক্ষ, ব্রিটেনে ১৬ লক্ষ, জাপানে ১২ লক্ষ ৪৩ হাজার, ইতালিতে ১২ লক্ষ, ফ্রান্সে ১০ লক্ষ ৪৫ হাজার এবং পশ্চিম জার্মানীতে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার। এই ব্যক্তিগুলি সম্পূর্ণ কর্মহীন। এছাড়া আধা-বেকার—অর্থাৎ যাঁরা সারা সপ্তাহ ধরে কাজ পান না, অনেকে বৎসরে ছয় মাস কাজ পান—এরকম মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। এর সঙ্গে তৃতীয় দুনিয়ার চিত্রটা যদি দেখা যায় তাহলে সমস্যার গভীরতা আরও বোঝা যাবে। এই দেশগুলিতে Reserve army of labour এর অন্তর্গত ব্যক্তির সংখ্যা ৩০ কোটি। এই ৩০ কোটি মানুষের কেউ হয়ত একটা কাজ করেন কেউ করেন না কিন্তু সকলেই কাজ চান। এই চিত্র দেখলে যে, কোন সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে এই পার্থক্য ঘটছে কেন? প্রশ্ন ওঠে কি উপায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন মাত্র তেরো বছরের মধ্যে তার ভয়ঙ্কর বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পেরেছে অথচ অনেক ঐতিহাসিক সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি নিজের নিজের দেশের বেকার সমস্যা হ্রাস করতে বারংবার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যে যে কারণের জন্য নিজ দেশের বেকার সমস্যার পূর্ণ ও স্থায়ী সমাধান করতে পেরেছে তাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান কারণ ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব। নভেম্বর বিপ্লব রুশদেশে পুঁজিপতি ও সামন্ত-

শ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে, পুরাতন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামো ধ্বংস করে দেয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক, ও সমস্ত সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার উপযোগী একটা রাষ্ট্রযন্ত্র, আইনকানুন, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথ পরিষ্কার করে দেয়। ৭ নভেম্বর, ১৯১৭ রাত্রি ১০ টা ৪৫ মিনিটে পেত্রোগ্রাদের স্মলনিতে সারা রাশিয়ার সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসেছিল এবং ২৪ ঘণ্টা চলার পর সেখান থেকে একটি ঘোষণা এবং দুটি ডিক্রী জারি করা হয়। ঘোষণাটি হল—'Backed by the will of vast majority of the workers, soldiers and peasants, backed by the victorious uprising of the workers and the garrison which has taken place in Petrograd the congress takes the power into its own hand' অর্থাৎ নভেম্বর বিপ্লবের মূল ঘোষণা হচ্ছে যে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক-শ্রেণীর ও সৈন্য বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থনে, পেত্রোগ্রাদের বিপ্লবী সেনাবাহিনীর সাহায্যে সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস নিজের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করল। এই ঘোষণার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে শ্রমিক কৃষকশ্রেণীর মিলিতভাবে নিজের হাতে ক্ষমতা নেওয়া—কারণ তার দ্বারাই ঘোষিত হল যে ভবিষ্যতে এই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্ত নীতি ও নিয়মকানুন শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যই তৈরী হবে। এছাড়া ৮ নভেম্বর রাত্রে দুটি ডিক্রী জারি হয়। একটি শান্তির সম্পর্কে, অপরটি ভূমি সম্পর্কে, যা এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। ভূমি সম্পর্কে ডিক্রীতে আদেশ জারি হল জমির উপর আর কোন ব্যক্তিগত মালিকানা সত্ব থাকবে না এবং রাষ্ট্রই হবে দেশের সমস্ত জমির একমাত্র মালিক। জারের জমিদারী ভূস্বামীদের জমি, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের জমি, কৃষকের জমি, মধ্যবিত্তের জমি, জমির উপর সমস্ত জংগল, মাটির তলায় অবস্থিত সমস্ত খনিজ সম্পদ—এ সবকিছুর মালিকানা সত্ব রাষ্ট্রের। সমস্ত ভূসম্পত্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ এবং পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণ, যা কেবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারাই সম্ভব, পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নে বেকার সমস্যা নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে আবশ্যিক সর্ত ছিল—এবং এই সর্ত পুরোপুরি পালিত হয়েছিল।

কিন্তু এর সঙ্গে যদি ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ জুলাই প্রকাশিত আমেরিকার

মিলিয়ে দেখি তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ দেখা যায়। মার্কিন কংগ্রেসে গৃহীত ও সংশোধিত প্রথম সংবিধানের পঞ্চম অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছে—No person……will be deprived of life, liberty or property without due process of law, nor shall private property be taken for public use without just compensation অর্থাৎ কোন লোককে আইনের মাধ্যম ছাড়া জীবন স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি জনসাধারণের কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

খুবই উদার এবং মানবিক ঘোষণা সন্দেহ নেই! কিন্তু এই উদার অনুচ্ছেদের জোরেই ব্যক্তিগত মালিকানা থাকল কোটি কোটি ডলারের এবং হাজার হাজার একর জমির মালিক একচেটিয়া প্রভুরাও স্থায়ী হলেন। অতএব শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর জীবন স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্র নিলেও সেই রাষ্ট্রের পরিচালক হলেন আসলে এই প্রভুরাই। তাই সেই রাষ্ট্রে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থেই অর্থনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি হল এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারই বিকাশ ঘটল যার অনিবার্য পরিণাম হিসাবেই আজ স্বাধীনতা লাভের ২০০ বছর পরেও ৮০ লক্ষ বেকার। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে জন্মের ১৩ বছরের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান করে দিল তার কারণ নভেম্বর বিপ্লবের ঘোষণাপত্র এবং প্রাথমিক ডিক্রীতেই শোষকশ্রেণীর হাত থেকে উৎপাদন ও সম্পত্তির মালিকানা কেড়ে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বনিয়াদ গড়ার পথ খুলে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু কেবলমাত্র ঘোষণাপত্র, ডিক্রী, আইন, প্রতিশ্রুতি অথবা বৈপ্লবিক ধ্বনি দিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান হয় না—এটা সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি যদি সঠিক অর্থনৈতিক লাইন বার করতে না পারত তাহলে এইসব ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বেকার সমস্যা থেকে যেত। বেকার সমস্যা সমাধানের লাইন ছিল লেনিনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনের পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি এমন যে সমগ্র পরিকল্পনাটি রূপায়িত হবার সাথে সাথে বেকারসমস্যা হ্রাস পেতে থাকল এবং শেষপর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হল। লেনিনের পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল তিনটি মৌলিক পরিবর্তন রাশিয়ার সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঘটানো।

১। সোভিয়েত ইউনিয়নকে কৃষিপ্রধান অনগ্রসর দেশ থেকে অগ্রসর শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা এবং এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে সারা দেশে বৈদ্যুতিকরণ এবং ভারী শিল্প গঠন।

২। কৃষি সমবায়, যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার গঠনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন এবং কৃষি পদ্ধতির আধুনিকীকরণ।

৩। সাংস্কৃতিক বিপ্লব—যার অর্থ ব্যাপকভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান, সর্বস্তরের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসার, শ্রমজীবী জনসাধারণের দক্ষতা ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন।

এই তিনটি পদক্ষেপের তাৎপর্য এবং ফলাফল একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

প্রথম লক্ষ্য অর্থাৎ শিল্পায়ন সম্পর্কে যে নীতি গৃহীত হল তা ছিল প্রথমে ভারী শিল্প, পরে হাল্কা শিল্প বা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র উৎপাদনের শিল্প। ভারী শিল্পের মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া হল ইস্পাত, মেশিন তৈরীর কারখানা, ইঞ্জিনীয়ারিং, রাসায়নিক দ্রব্য করণ, সিমেন্ট, ভারী ট্রাক ইত্যাদিকে। কিন্তু ভারী শিল্প গড়ে তোলার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ছিল শক্তি (energy) উৎপাদন—প্রধানতঃ বিদ্যুৎ শক্তি।

লেনিন অত্যন্ত সরল ভাষায় নির্দেশ দিলেন, বর্তমান মুহূর্তে সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য প্রয়োজন সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা এবং বিদ্যুৎ। Communism-Soviet power & electrification of the whole country—এই ছিল লেনিনের সমীকরণ। ভারী শিল্প গঠনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ যে তার দ্বারা দেশে সর্বপ্রকার শিল্প বিকাশের বনিয়াদ বা infrastructure সৃষ্টি হবে। বাস্তবিকই তাই ঘটল।

কিন্তু কৃষি প্রধান, দরিদ্র, নিরক্ষর যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত একটা দেশে ভারী শিল্প গঠনের লক্ষ্য পূরণ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তার জন্য জনসাধারণকেও দীর্ঘকাল ত্যাগস্বীকার ও কষ্টভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি কিন্তু তবু এই পরিকল্পনার প্রতি গণসমর্থন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারী শিল্প গঠনের কাজে তখন সোভিয়েত রাষ্ট্রের সামনে বাধা ছিল মূলতঃ তিনটি:—

(খ) দক্ষ শ্রমিক, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ এবং দক্ষ তত্ত্বাবধায়ক,—ইত্যাদির অভাব।

(গ) অভিজ্ঞতার অভাব, অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে অনিশ্চয়তা বোধ।

তথাপি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ভারী শিল্পকেই শিল্পায়নের চাবি-কাঠি হিসাবে গুরুত্ব এবং অগ্রাধিকার দিয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্রই সেদিন বিশ্বে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলি দ্বারা পরিবেষ্টিত। বৈদেশিক সাহায্য লাভের আশা প্রায় ছিলই না বরং আশঙ্কা ছিল যে কোন মুহূর্তে বহিরাক্রমণের। বিশ্বের প্রথম শ্রমিক-শ্রেণীর রাষ্ট্রকে সেদিন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গঠনের জন্য যে কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হয়েছিল উত্তরকালে কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকেই অর্থনীতি গড়তে সেই দুঃসহ অবস্থায় পড়তে হয় নি—কারণ একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সাহায্যের হাত সকলের ক্ষেত্রেই প্রসারিত হয়েছে, এবং সেই হাত সোভিয়েত। কিন্তু বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল কে? কোন রাষ্ট্রই নয়। তবু সাহায্যের অভাব হয় নি—কারণ তার সমর্থনে ছিল সারা পৃথিবীর শোষিত শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পগঠন করতে পুঁজির সমস্যা সমাধানের জন্য সেদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন চারটি উপায় অবলম্বন করেছিল।

প্রথম—সমস্ত উৎপাদন যন্ত্রের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানো। তার ফলে তৎকালীন শিল্প, কারখানা, পরিবহণ, ব্যাঙ্কিং, এবং যাবতীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসার দরুণ যা কিছু লাভ তার প্রায় সবটাই রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা পড়তে লাগল এবং এই মুনাফাকে নূতন শিল্পগঠনের জন্য রাষ্ট্রীয় পুঁজিতে পরিণত করা হল।

দ্বিতীয়—শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী ও সহযোগিতাকে দৃঢ়তর করা। তার ফলে কৃষকশ্রেণী ক্রমশঃ উপলব্ধি করল যে, ভারী শিল্প গড়ে উঠলে তারা লাভবান হবে কারণ শিল্পজাত কৃষির যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর, হার্ভেস্টার, রাসায়নিক সার ইত্যাদি তারা ন্যায্য দরে অধিকতর পরিমাণে পাবে। তাই তারা তাদের কৃষিজাত পণ্য ও শ্রম দিয়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগল।

তৃতীয়—জনসাধারণের আস্থা অর্জন—যার ফলে ১৯৫ কোটি রুবলের

চতুর্থ—শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নীতি, যার ফলে শত্রুভাবাপন্ন বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গেও বাণিজ্যিক লেনদেন সুরু করার চেষ্টা ক্রমশঃ ফলপ্রসূ হল এবং কিছু বৈদেশিক ঋণও পাওয়া গেল যদিও তার পরিমাণ বৎসামান্য অর্থাৎ মোট লগ্নীকৃত পুঁজির মাত্র শতকরা ১.৫ ভাগ।

তবু বহু চেষ্টা করেও যা জোগাড় হল, প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্ত কম। কিন্তু এই নিয়েই ১৯২৮-৩২ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুরু করতে হয়। অধিকাংশ প্রকল্পে রাস্তা ও ঘরবাড়ী নির্মাণ, মাটি খোঁড়া, মেশিন বসানো এমনকি পরিবহণ হত কায়িক শ্রমের সাহায্যে। তথাপি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী এবং সমগ্র জনগণ দেশগড়ার কাজে মেতে উঠল। এই যুগের গঠনমূলক মানসিকতার অপূর্ব বর্ণনা আছে রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠিতে'। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দ্রুত সাফল্যলাভ করল। অবিশ্বাস্য গতিতে অর্থাৎ বৎসরে শতকরা ২০ ভাগ হারে শিল্পোৎপাদন বেড়ে চলল। অবিশ্বাস্য এই জন্য যে, একশ বছর আগে যখন পুঁজিবাদের বিকাশের হার ছিল সবচেয়ে তেজি তখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার বৎসরে শতকরা ৮'৭ ভাগের উপরে যায় নি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ৫ বছরে সোভিয়েতে ১৫০০ ভারী শিল্প গড়ে উঠল অর্থাৎ গড়ে প্রায় প্রতি কাজের দিনে একটি নূতন শিল্পের সৃষ্টি! এই শিল্পগুলির মধ্যে পড়ে নীপার জলবিদ্যুৎকেন্দ্র, উরালের হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং, স্তালিনগ্রাদ খারকোভের ট্রাক্টর কারখানা, কুজনেতস্কের ইস্পাত কারখানা, গোর্কি মোটর কারখানা, রস্তোভ কৃষিখামারের যন্ত্র কারখানা, মস্কোর বলবেয়ারিং কারখানা ইত্যাদি। এই ধরনের শিল্প যদি কোন দেশে প্রতিদিন একটা করে এবং পাঁচ বছর ধরে তৈরি হতে থাকে তাহলে দেশের চেহারা কত দ্রুত বদলে যায়? সোভিয়েত দেশের অর্থনীতির চেহারাও দ্রুত বদলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যাও তাপমান যন্ত্রের পারদের মত ধীরে ধীরে নামতে নামতে একেবারে রেমিশন পয়েন্টে এসে গেল! দ্রুত ভারী শিল্প গঠনের জন্য শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা (Productivity of labour) বৃদ্ধির উপায় হিসাবে দুটি পদ্ধতি নেওয়া হল। একটি Intensive process—অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়টি Extensive process—যার অর্থ প্রত্যেক উৎপাদনে শ্রমিক সংখ্যার বৃদ্ধি করে ঐ শিল্প ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো। এই সময়ের ফলে শিল্পক্ষেত্র

উৎপাদন এবং চাকুরী একসাথে বৃদ্ধি পেতে লাগল। সমগ্র বন্টন ব্যবস্থা এবং বাজার দরের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতে এবং উৎপাদন ও ছকবাঁধা কর্মসূচী অনুযায়ী। তাই দ্রুত শিল্পায়ন সত্ত্বেও অত্যুৎপাদন সংকট, মন্দা; মুদ্রাস্ফীতি বা ছাঁটাই সমস্যা দেখা দেয় নি।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নির্মাণের জন্য দ্বিতীয় লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারিত হয়েছিল শিল্পগঠনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন। এই পরিবর্তন না ঘটাতে পারলে গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, অনগ্রসরতা ও দারিদ্র্য থেকে যেত এবং শিল্পবিকাশের ক্ষেত্রে নানাভাবে বাধার সৃষ্টি হত। কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রধানতঃ দুইটি পদ্ধতি নেওয়া হল। একটি কৃষি সমবায় গড়ে তোলা এবং ছোট ছোট খণ্ড খণ্ড জমিগুলিকে একত্র করে বিরাট আকারে যৌথভাবে চাষ করা। তাই যৌথখামার বা কালেকটিভ ফার্ম, রাষ্ট্রীয় খামার ইত্যাদি গঠনের জন্য জোর দেওয়া হ'ল। দ্বিতীয় পদ্ধতি—কৃষি পদ্ধতির দ্রুত আধুনিকীকরণ এবং তার জন্য যৌথখামারগুলিকে কৃষি যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর, সার, উন্নত ধরনের বীজ ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য করা। ১৯৩০ সালে কৃষিসমবায় গঠনের আন্দোলন ব্যাপক আকার নিল এই বছর যৌথখামারগুলিতে কাজ করার জন্য শহর থেকে ৫০ হাজার ট্রাক্টর অপারেটার ও লরী চালক, ১ লক্ষ দক্ষ শ্রমিক এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজার ম্যানেজার পাঠানো হল। কৃষিব্যবস্থার আধুনিকীকরণের ফলে গ্রামে নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হতে লাগল, কৃষি শ্রমিকরা কাজ পেল এবং চাকুরীর সন্ধানে শহরে আসার প্রয়োজনীয়তা আর রইল না। বরং শহর থেকে গ্রামের দিকে উল্টো স্রোত বইতে সুরু করল। জনবিরল গ্রামাঞ্চলে, এশিয়াটিক রাশিয়ার ও সাইবেরিয়ার জনহীন প্রান্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হতে লাগল। কৃষিশিল্প, খনিশিল্প, পথঘাট নির্মাণ, অরণ্য সম্পদের ব্যবহার ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন হল গ্রামাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষ শ্রমিক, কৃষিবিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী, ভূতাত্ত্বিক, ডাক্তার, শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কের। কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং গ্রাম উন্নয়নের এই লক্ষ্য না থাকলে শহর থেকে গ্রামে লোক পাঠানো ত দূরের কথা গ্রাম থেকে শহরে আসার স্রোতকেই বন্ধ করা যেত না।

বেকার সমস্যার সমাধান ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গঠনের জন্য

বিপ্লবকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে নানা ধরনের অদ্ভুত ধারনার সৃষ্টি হয়েছে। তাই এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, লেনিন পরিকল্পিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। লেনিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে মূর্তি ভাঙা, বই পোড়ানো, পোস্টারের দ্বারা পার্টি নেতাদের নামে কুৎসা প্রচার, স্কুল-কলেজ বন্ধ করা বা পার্টির হেড কোয়ার্টারে কামান দাগার কোন কর্মসূচী স্থান পায় নি। এই সব ঘটনা চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য—কারণ তার লক্ষ্য ছিল পার্টি বহির্ভূত এবং পার্টির অভ্যন্তরে জনসাধারণের একাংশকে সংগঠিত করে পার্টি নেতৃত্ব দখল করা। স্বয়ং মাও সে-তুং এবং তাঁর বিশেষ অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিরা কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ধ্বংস করে গোষ্ঠী একনায়কত্ব স্থাপনের জন্যই এই কায়দা নিয়েছিলেন।

লেনিন যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের চিন্তা করেছিলেন এবং বাস্তবে যা ঘটেছিল তার মূল বিষয়বস্তু—দেশজুড়ে ব্যাপক সাক্ষরতার অভিযান, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তার এবং শ্রমজীবী জনসাধারণের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন। সর্বহারা সংস্কৃতি বা বিপ্লবী সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায় তা লেনিন ১৯২০ সালের ২ অক্টোবর ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পরিষ্কার-ভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন—'Proletarian culture is not an invention of those who call themselves experts on proletarian culture. That is all nonsense. Proletarian culture must be logical development of the store of knowledge, mankind has accumulated under the yoke of capitalist landowner and bureaucratic society.'

যে সমস্ত অতিবিপ্লবী এবং অত্যুৎসাহী সাংস্কৃতিক কর্মী রাতারাতি বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে নূতন শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য ক্ষেপে উঠেছিলেন সেইসব Utopian দের সম্পর্কে লেনিন বলেছেন—

'For a start we should be satisfied with our real bourgeois culture. For a start we should be glad to dispense with cruder types of pre-bourgeois culture i.e bureaucratic culture or serf culture. In matters of culture haste and sweeping measures are most harmful. Many of our young writers and communists should get this well into their head. (প্রাভদা, ৪ মার্চ ১৯২০)।

তাহলে লেনিন সাংস্কৃতিক বিপ্লব বলতে কি বুঝেছিলেন ? তিনি বুঝেছিলেন এমন সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত ক্রিয়াকলাপ যা সমগ্র দেশের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরে সহায়তা করবে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক মান উন্নত করবে। তাই ১৯২০ সালের ২ অক্টোবর ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের তৃতীয় কংগ্রেসে তিনি বলেছিলেন—
A communist society cannot be built in an illiterate country—
অর্থাৎ নিরক্ষর দেশে কমিউনিস্ট সমাজ গড়া যায় না। কেন বলেছিলেন ? কারণ সেদিন রাশিয়ায় নিরক্ষতার সমস্যা ছিল এক ভয়াবহ সমস্যা। ১৯২০ সালের হিসাবে দেখা যায় ইওরোপীয় রাশিয়ায় শহরের শ্রমিকদের মধ্যে ৪০ শতাংশ এবং কৃষকদের মধ্যে ৮০শতাংশ নিরক্ষর—প্রায় ভারতের বর্তমান অবস্থান মত। এশিয়াটিক রাশিয়া ছিল মধ্যযুগীয় অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকারে। উজবেকদের মধ্যে নিরক্ষরতার সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৯৮.৪ শতাংশ, তুর্কমেনদের মধ্যে ৯৯.৩ শতাংশ এবং তাজিকদের মধ্যে ৯৯.৫ শতাংশ। এছাড়া ৪০টি জাতি ও উপজাতির নিজস্ব কোন বর্ণমালাই ছিল না। এমনকি বিপ্লবের সময় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যেও শতকরা ৪০ জন ছিল নিরক্ষর এবং উচ্চশিক্ষিত কর্মীর সংখ্যা আঙুলে গোনা যেত। সেই কারণেই লেনিন পরিকল্পিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল লক্ষ্য ছিল : সাক্ষরতার অভিযান এবং জনশিক্ষার বিস্তার এবং উন্নয়ন। শিক্ষার উপর লেনিন অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন—

'We must at all costs set out first to learn, secondly to learn and thirdly to learn and then to see it that learning shall not remain a dead letter.' (প্রাভদা, ৪ মার্চ ১৯২০)।

মনে হয় আজও তৃতীয় দুনিয়ার যে কোন অনগ্রসর, কৃষিপ্রধান এবং নিরক্ষর প্রধান দেশে লেনিনের উপরোক্ত বক্তব্যই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে সঠিক পথনির্দেশ।

রাশিয়ায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরিণাম কি হল ? বিপ্লবের তিন বছরের মধ্যেই অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের সময়েই লক্ষ লক্ষ মানুষকে লিখতে পড়তে শেখানো হল। সমগ্র দেশে সোভিয়েতগুলি থেকে আওয়াজ উঠল নিরক্ষরতা হটাও ! ১৯২৭ সালের মধ্যে ১ কোটি এবং ১৯২৮ থেকে ৩২ এর মধ্যে ২ কোটি মানুষকে সাক্ষর করা হল। এই প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার যুগে শতকরা ৪০ ভাগ স্কুল বাড়ল। প্রাথমিক স্কুলের জন্য শিক্ষকের চাহিদা বাড়ল ৩ গুণ, মাধ্যমিক

স্কুলের বাড়ল ৩ গুণ। এই পাঁচ বছরেই উচ্চশিক্ষালব্ধ বিশেষজ্ঞ সংখ্যা ১০ হাজার থেকে বেড়ে হল ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ০ শত—যাদের একটিও বেকার রইল না বরং দ্রুত উচ্চশিক্ষা বিস্তারের তাগিদ আসতে লাগল। গ্রামে গ্রামে শুধু শিক্ষকের নয়, লাইব্রেরিয়ান, সংগ্রহশালার কর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং ভ্রাম্যমান চিকিৎসকদলের কাজ বেড়ে চলল। এশিয়াটিক রাশিয়ার উপজাতিদের জন্য বর্ণপরিচয় আর অক্ষর বই ছাপতেই অজস্র নতুন প্রেস ও পাবলিশিং হাউস গড়ে উঠল। শিক্ষাবিস্তারের চাহিদা মেটাতে গিয়ে কাগজকলগুলি হিমসিম খেয়ে যেত এবং সর্বত্র দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ এল। এইভাবে সোভিয়েত সাংস্কৃতিক বিপ্লব দেশের বেকার সমস্যার পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনাকে নির্মূল করে দিয়েছে।

লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক অনুসৃত উপরে বর্ণিত তিনটি পদক্ষেপ এবং তার সাথে ব্যাপক নারী-শিক্ষার প্রচলন, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার ইত্যাদি ঐ দেশের বেকার সমস্যার পূর্ণ সমাধান করেছে। এই হল সোভিয়েত ইউনিয়নে বেকার সমস্যা সমাধানের মোটামুটি ইতিহাস।

কিন্তু বর্তমান যুগে অনগ্রসর দেশের বেকার সমস্যার কারণ এবং আধুনিক শিল্পোন্নত দেশের বেকার সমস্যার কারণের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে ব্যাপক শিল্পায়ন হয়েছে, কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ হয়েছে, প্রায় শতকরা ৮০ থেকে ১০০ ভাগ মানুষ সাক্ষর এবং প্রচুর উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি সৃষ্টি হয়েছে। তৎসত্ত্বেও বেকার সমস্যা সমাধান করা যাচ্ছে না—বরং তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বহু অনগ্রসর দেশের বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ উপরোক্ত ঘটনাগুলির দোহাই দিয়ে বলেন যে, কৃষিপ্রধান দেশে শিল্পায়ন, কৃষির আধুনিকীকরণ ইত্যাদি ঘটালে বেকার সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। তাঁদের মতে কুটির শিল্প, কায়িক শ্রম ও সনাতন কৃষি ব্যবস্থার মধ্যেই বেকার সমস্যার সমাধান হবে—অন্ততঃ অনগ্রসর কৃষিপ্রধান দেশে। এই তত্ত্ব মিথ্যা এবং প্রতিক্রিয়াশীল। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা দেশের স্বয়ম্ভরতা অর্জনের পথের বাধা এবং নয়া ঔপনিবেশিক নীতির বিশ্বস্ত প্রচারক ছাড়া কিছু নয়।

বর্তমানে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বেকার-সমস্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হচ্ছে ঐ সব দেশের পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক আর শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-

গত বিপ্লব যে অতি উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার, অটোমেশন এবং কমপিউটারের জন্ম দিয়েছে তার ফলে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই বিপ্লবের অগ্রগতির সাথে সাথে দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞান প্রযুক্তিগত বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক এবং উন্নত পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী উভয় ধরনের রাষ্ট্রেই ঘটে চলেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মালিকশ্রেণী এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে মালিকশ্রেণীর মুনাফার স্বার্থে। তাই উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা যখন আধুনিকতম প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে তখন তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে উৎপাদনের খরচ কমানো এবং মুনাফা বৃদ্ধি। নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারের ফলে পুরাতন দক্ষ শ্রমিকরা যখন অযোগ্য বা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় তখন স্বভাবতঃই তাদের ছাঁটাই করা হয়। এই বাতিল শ্রমিকদের কাজে রাখার, ভরণপোষণ করার, নতুনভাবে শিক্ষিত করার বা নতুন কর্মসংস্থানের যাবতীয় দায়িত্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিতে পারে না—নেওয়া সম্ভবও নয় কারণ তাহলে মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই উন্নত ধরনের মেশিন আনলেই ছাঁটাই করতে হয়, অটোমেশন চালু করলে ছাঁটাই হয় এবং কমপিউটার বসালেও ছাঁটাই হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্প-প্রসারও হয় মালিকশ্রেণীর মুনাফার স্বার্থে এবং বাজারের চাহিদা ও বাজার দরের ওঠা পড়ার উপর ভিত্তি করে। সমস্ত মানুষের জন্য কর্মসংস্থান, শ্রমিকশ্রেণীর জীবনধারণের মান উন্নয়ন এবং সমগ্র জনসাধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো—ইত্যাদি লক্ষ্য নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে শিল্পবিস্তার করা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অসম্ভব। তাই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বড়জোর বেকারভাতা দিতে পারে বা চক্রাকারে নিয়োগ প্রথা (Rotational employment) করতে পারে কিংবা ঘাটতি বিনিয়োগ (Deficit financing) দ্বারা সাময়িকভাবে বাজারকে তেজি করে দু চারটি ক্ষেত্রে নূতন কর্মসংস্থান করতে পারে কিন্তু বেকার সমস্যার স্থায়ী ও পূর্ণ সমাধান কখনই করতে পারে না।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনীতিতে এই সমস্যাগুলি নেই। কাজেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের অগ্রগতি সত্ত্বেও, অটোমেশন ও কমপিউটারের দ্রুত প্রসার হওয়া সত্ত্বেও বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয় না। তাই যে অটোমেশন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জনগণের কাছে অভিশাপ হচ্ছে সেই অটোমেশনই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জনসাধারণ আশীর্বাদ মনে করে। এ সম্পর্কে হয়ত কারুর কোন সন্দেহ থাকতে পারে। তাই প্রমাণ হিসাবে কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করা গেল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭১-৭৬) উন্নত ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যা এবং অটোমেশন বৃদ্ধি করার ফলে শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা যেভাবে বাড়ল তাতে দেখা গেল ২ কোটি শ্রমিকের দৈনিক ৮ ঘন্টার শ্রম লাঘব হয়েছে। সোভিয়েত যদি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হত তাহলে সেখানে তখন কি ঘটত? তাহলে দেখা যেত উৎপাদন হয়ত বিপুলভাবে বেড়েছে কিন্তু ২ কোটি শ্রমিক অপ্রয়োজনীয় হিসাবে ছাঁটাই হয়ে গেছে। সোভিয়েত যদি খুব জনদরদী ও উদার পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হত অর্থাৎ welfare state—তাহলে ২ কোটির জায়গায় হয়ত ১ কোটির চাকরী যেত—এবং তাদের হয়ত কিছু বেকারভাতাও দেওয়া হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার সোভিয়েত ইউনিয়নে নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে একটিও ছাঁটাই হয় নি। তারপর বর্তমান অর্থাৎ দশম পরিকল্পনায় (১৯৭৬-৮০) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সহায়তায় শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা যেভাবে বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হয়েছে তাতে ১৯৮০ সালে আরও ২ কোটি ৬০ লক্ষ শ্রমিকের শ্রম লাঘব হবে। এই বাড়তি শ্রমিকরা কি তখন বেকার হবে? গ্যারান্টি দিয়ে আজ বলা যায়—একটিও হবে না।

তাহলে ব্যাপারটা কি? ব্যাপার একটাই কিন্তু সেটা সম্ভবতঃ বুর্জোয়া অর্থনীতির অন্ধ ভক্তদের মগজে ঢুকবে না, যদিও শ্রমিক কৃষক ও শ্রমজীবী জনসাধারণের কাছে এই ব্যাপার অত্যন্ত সহজবোধ্য।

একথা অনস্বীকার্য যে, কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমশিল্পে যখন উন্নত ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যা বা অটোমেশন চালু করা হয় তখন ঐ শিল্পে নিযুক্ত জনশক্তির (Manpower) একটা অংশ বিমুক্ত হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই বিমুক্ত জনশক্তিকে (released manpower) সঙ্গে সঙ্গে নূতন কাজ দেওয়া যায় না। ফলে তারা বেকার হয়, দারিদ্র্য ভোগ করে এবং কাজের চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের লক্ষ্য যেহেতু শ্রমিকশ্রেণীর ও জনসাধারণের মধ্যে কর্মক্ষম প্রত্যেককে কাজ দেওয়া এবং উৎপাদনের আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যও যেহেতু জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করা তাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই বিমুক্ত জনশক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প কাজ দেওয়ার ব্যবস্থাও আগে ভাগে করা হয়ে থাকে। সুতরাং কোন শিল্পে অটোমেশন করার সুযোগ থাকলেই বা কোন উন্নত ধরনের যন্ত্র বসিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি বা লাভের সম্ভাবনা দেখলেই পরিচালকরা যখন যদি যত ইচ্ছা অটোমেশন করবেন বা

নতুন কারখানা চালু করবেন—সে অধিকার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন পরিচালকমণ্ডলী বা মন্ত্রীর থাকে না। স্বাধীন দুনিয়ার স্বাধীন একচেটিয়াদের দৃষ্টিতে এটা অবশ্য ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে হয়। কিন্তু কি আর করা যাবে—সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন কাঠামো রাখতে হলে এটুকু হস্তক্ষেপ অনিবার্য। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গোটা উৎপাদনই প্ল্যানিং-এর অন্তর্গত। কাজেই কোন কোন শিল্পে, কখন কতখানি অটোমেশন হবে সেটাও প্ল্যানিং-এর মধ্যে পড়ে এবং তার ফলে কি কি সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, এই সমস্যাগুলির সমাধান কেমনভাবে হবে সমস্তই পূর্বাহ্নে স্থির করা হয়। তাই অটোমেশন, কমপিউটার বা নূতন প্রযুক্তিবিদ্যা যে জনশক্তিকে বিমুক্ত করে তাকে উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই সঙ্গে সঙ্গে টেনে নেওয়ারও বন্দোবস্ত থাকে। যে ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন করার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অনিশ্চয়তা থাকে সে ক্ষেত্রে ঐ পরিবর্তনকে স্থগিত রাখা হয়—এটাই সমাজতান্ত্রিক দেশের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। এই ব্যাপার সম্পর্কে দু একটি উদাহরণ দিয়েই বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করব।

ইংরোপীয় রাশিয়ায় টুলা অঞ্চলের স্চেকিনো শহরে একটা বৃহৎ উৎপাদন সংস্থা আছে যার নাম অ্যাজট। এই সংস্থা নানা ধরনের জিনিস উৎপাদন করে। এই সংস্থার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় অটোমেশন ও কমপিউটার চালু করার ফলে ১৭০ শতাংশ উৎপাদন বাড়ল কিন্তু ১১০০ শ্রমিক উদ্বৃত্ত হল। এছাড়া যেসব কাজের জন্য দৈহিক শ্রম ব্যবহার করা হচ্ছিল সেইসব কাজে যন্ত্র ব্যবহার করার ফলে আরও ৩২৪ জন শ্রমিক বাড়তি হল। অর্থাৎ মোট উদ্বৃত্ত শ্রমিক হল ১৮২৪ জন। কিন্তু এদের কেউই বেকার হয় নি। কারণ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এদের বেশীরভাগকে ঐ উৎপাদন সংস্থার অন্যান্য শাখায় এমন ধরনের চাকরী দেওয়া হল যাতে তাদের শিক্ষাগত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি অনুযায়ী তারা ঐ কাজগুলি করতে পারে। দ্বিতীয় অংশকে আনা হল ঐ শহরেরই অন্য এক কারখানায় যেখানে একই ধরনের কাজে তাদের নিয়োগ করা যায়। তৃতীয় অংশকে নূতন কাজের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হল এবং শিক্ষার যাবতীয় খরচ এবং শিক্ষাকালীন বেতন অ্যাজটই বহন করল। শিক্ষান্তে ২০০ জন শ্রমিক দেশের অন্যান্য শিল্পসংস্থায় চলে গেল এবং তাদের সপরিবারে স্থানান্তরিত হবার খরচও ঐ সংস্থা

এই নবাগতদের ক্রি কোয়ার্টার দিল। ক্রি কোয়ার্টার সবাই পায় না। কিন্তু যেহেতু এঁরা ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক কাজেই এদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সূতাশিল্প সবচেয়ে প্রাচীন এবং এই শিল্পে অদক্ষ কায়িক শ্রমিক ছিল সবচেয়ে বেশী। সাম্প্রতিককালে এই শিল্পের আধুনিকীকরণের ফলে প্রায় এক লক্ষ কায়িক শ্রমিক বাড়তি হয়েছিল। এদের প্রত্যেককেই বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং দিয়ে উন্নত ধরনের যন্ত্র ব্যবহারের উপযুক্ত করে কাজ দেওয়া হয়েছে এবং যেহেতু এদের শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে তাই প্রত্যেকেই ২০ শতাংশ বেশী মজুরী পেয়েছেন। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিপ্লব বেকার সমস্যা সৃষ্টি করার কারণ হচ্ছেনা। বরং এই বিপ্লবের ফলে একদিকে উৎপাদন বাড়ছে, অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষা ও দক্ষতার মান উন্নত হচ্ছে।

পরিশেষে, ভারতবর্ষের বেকার সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে দু-একটা কথা বলা প্রয়োজন। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা যে ভারতের ক্ষেত্রে ষোল আনা প্রযোজ্য তা কখনই হতে পারে না। প্রত্যেক দেশেরই সমস্যা ও পরিস্থিতির একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তাই এক দেশের পদ্ধতি কখনই হুবহু অন্য দেশে প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু একটা মৌলিক বিষয় আজ পৃথিবীর সব দেশের ক্ষেত্রেই সত্য এবং ভারতের ক্ষেত্রেও। বিষয়টি হল সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার ও বণ্টন ব্যবস্থার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর করায়ত্ত না হলে কোন ভাল পরিকল্পনাকেই জনসাধারণের স্বার্থে বেশীদূর কার্যকর করা যায় না এবং বেকার সমস্যারও পূর্ণ সমাধান হয় না। ভারতবর্ষে অনেক অনেক পরিকল্পনা হয়েছে এবং আজও হচ্ছে—কিন্তু এই গোড়ার কাজটিকে বাদ দিয়ে।

সোভিয়েত-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে কয়েকটি কুৎসার জবাব

চারুব্রত রায়

ভারত-সোভিয়েত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যগত সম্পর্ক নিয়ে নানা পত্র-পত্রিকায় বিকৃতি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অন্ত নেই। এ ব্যাপারে একচেটিয়া পুঁজির সেবাদাস বাজারী পত্রপত্রিকাগুলি সদা সক্রিয়। তবে গত কয়েক বছরে এ বিষয়ে অধিকতর তৎপর হয়ে উঠেছে নকশালপন্থী ও চীনপ্রেমিক বুর্জোয়া মহল, ঠিক যেমন "গ্লাটো" যুক্তজোটের সমর্থনে আমেরিকার চেয়ে চীনের উৎসাহ সম্প্রতি অতিশয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের বক্তব্যের সারমর্ম: ভারতকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি প্রতারণা করছে। উদ্দেশ্য: ভারত সমাজতান্ত্রিক সমবায়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবে অধিকতর আনুগত্যসহ প্রবেশ করুক। বলা বাহুল্য, চীনের বর্তমান মাওবাদী শাসকগোষ্ঠীও চায় মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে জোট বেঁধে তাদের কল্পিত "সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ"-এর বিরুদ্ধে সমবেত হতে।

এ আলোচনায় মাওবাদের চরমতম বিশ্বাসঘাতকতার রাজনৈতিক দিক নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই। আমরা আলোচনা করব ভারত সোভিয়েত ও ভারত সমাজতান্ত্রিক সমবায়ের অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি দিক: ভারতের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক বাণিজ্যের স্বরূপ। এ সম্পর্কে প্রধানত চারটি অভিযোগ প্রায়শই বাজারী পত্রিকাগুলি উত্থাপন করে

(ক) ভারতকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতারণা করে অর্থাৎ কম দামে ভারতীয় পণ্যক্রয় করে ও বেশী দামে ভারতকে পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করে।

(খ) ভারত থেকে পণ্য ক্রয় করে অন্যত্র (বিশেষত 'কয়েকন' ভুক্ত

(গ) সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইওরোপীয় দেশগুলিতে রপ্তানী করে ভারত বহু বৈদেশিক মুদ্রা হারায়।

(ঘ) ভারতীয় টাকার (রুপি) সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন একতরফা রুবলের বিনিময় হার বদল করে ভারতকে যথেচ্ছ প্রতারণা করছে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এই অভিযোগগুলি প্রধানত একতরফা, অন্যদিক থেকে প্রতিবাদ যথাযথভাবে তুলে ধরা হয় নি, যার ফলে সাধারণ মানুষের মনে এই অভিযোগগুলি প্রায়শই সত্য বলে প্রতিভাত। কিন্তু তথ্য ও পরিপ্রেক্ষিত বিচারে এ অভিযোগগুলি সত্য হতে বহু দূরবর্তী। এগুলি প্রধানত কুৎসানিভর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

প্রথমত, দেখা যাক সোভিয়েত ইউনিয়ন বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতারণা করে কিনা। এ সম্পর্কে যারা অভিযোগ এনেছেন, তারা সামগ্রিক তথ্য/পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের ধার দিয়ে যান নি। আর এ অভিযোগগুলি যারা এনেছেন, তাদের অর্থবিজ্ঞানী হিসেবে দেশে-বিদেশে খ্যাতি আছে—যেমন: জগদীশ ভগবতী, পদ্মা দেশাই, টি এন শ্রীনিবাসন, এন কে চন্দ্র, দীপক নায়ার, আন্দ্রে গুণ্ডার ফ্র্যাংক প্রভৃতি, যাদের সাদৃশ্য এক জায়গায়—হয় এরা মার্কিন-ঘেঁষা, নয় চীন-ঘেঁষা এবং অবশ্যই সোভিয়েতবিরোধী। রিজার্ভ ব্যাংকের একটি সমীক্ষায় এদের উল্টো কথাই বলা হয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ভারতীয় পণ্য যে দামে কেনে, তা অন্যান্য দেশে রপ্তানীকৃত ভারতীয় পণ্যমূল্যের চেয়ে সাধারণভাবে বেশী। তাতে এও বলা হয়েছে যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ব্যাপকভাবে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করে অন্যত্র বিক্রয় করে, এর মধ্যে সত্যতা নেই। (Cf. Nalini Ambegaokar, "India's Trade with East European Countries : Trends and Problems—RBI Bulletin, March 1974)। যারা বিস্তৃত সমীক্ষা করেছেন তাদের বিশ্লেষণে অনুরূপ অভিমতই প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ সুমিত্রা চিত্তি একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কিভাবে পূর্ব ইওরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ভারতকে বৈদেশিক বাণিজ্যে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। তা থেকে কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। (পাশের পৃষ্ঠায় সারণীতে)

এছাড়া জুতা, রং প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন

সারণি :

১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৪-৭৫-এ ও অবশিষ্ট বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে রপ্তানীকৃত কিছু কিছু ভারতীয় পণ্যের একক মূল্যের গতি

পণ্য	একক	সোভিয়েত ইউনিয়নে	অবশিষ্ট বিশ্বে
কাজু বাদাম (ভাঙা)	টাকা প্রতি কেজি	৭·৮৪ থেকে ১৬·৫৫	৭·৬৩ থেকে ১৬·৩৯
কাজু বাদাম (গোটা)	,,	১০·৮১ থেকে ১৯·০০	১১·৫৩ থেকে ১৮·১৭
কফি	,,	৬·১১ থেকে ১১·৩০	৮·৩১ থেকে ১০·৮৮
চা পাতা	,,	৮·১৬ থেকে ১২·২৮	৭·১৪ থেকে ১০·৩১
অ-প্রস্তুত তামাক (ভার্জিনিয়া ফ্লু কিওরড্)	,,	৮·৫০ থেকে ১২·৫২	৬·৮৯ থেকে ১১·২৮
চীনা বাদামের খৈল	টাকা প্রতি টন	১২৫·৯১ থেকে ১২৫৫·৩৪	৭২৫·৮৯ থেকে ১২১৪·৪২

(সূত্র : Sumitra Chisti– India's Trade with East Europe : An Overall View, Foreign Trade Review, April-June '77)

১৯৭২-৭৩এর মধ্যে দেখা যায় যে, ভারত থেকে পূর্ব ইওরোপীয় দেশগুলিতে রপ্তানীকৃত পণ্যদ্রব্যসামগ্রীর সামগ্রিক একক মূল্যের (unit price) সূচক সংখ্যা ১৭·২৫ শতাংশ বেড়েছে, আর অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি ১৪·২৫ শতাংশ (দ্রষ্টব্য : O. P. Sharma : India's Exports to the East European Countries ··Issues and Prospects, Foreign Trade Review, April-June '77)

চা-এর কথা বাদই দিলাম। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সালের গড় নিয়ে দেখা যায় যে, ভারতের প্রধান চা-বাজার ব্রিটেনে কিলো প্রতি পাওয়া গেছে ৮·৭২ টাকা, যেখানে একই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পাওয়া গেছে কিলো প্রতি ১২·৬১ টাকা (Econ. Times, ৭. ৯. ৭৮)। ভারতীয় চায়ের প্রধান ক্রেতা এই দুটি দেশই।

সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে ঠকাচ্ছে, একথা বলা মানে মিথ্যার বেসাতি। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আমরা যে [illegible]

তার দামও আমরা সাধারণভাবে অন্য দেশ থেকে বেশী পাই। পূর্বোক্ত ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অফ ফরেন ট্রেড-এর সমীক্ষায় একথা বলা হয়েছে। অধিকন্তু, ভারত ও পূর্ব ইওরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমবায়-এর অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ে একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে। "There is a broad consensus opinion among export bodies/economists that on the whole there is no basis for contending that India has secured low prices for exports to these countries or India has been buying import products from these countries at high prices as compared to other convertible currency sources." (Cf. S. Ramachandran, Indo-CMEA Economic Cooperation, Foreign Trade Review, Oct-Dec '75, p. 180)—সহজ অনুবাদ : রপ্তানী সংস্থা ও অর্থশাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে মোটামুটি এই মর্মে মতৈক্য রয়েছে যে, ভারত এই সব দেশ থেকে রপ্তানী বাবদ কম দাম পেয়েছে বা অন্যান্য অবাধ মুদ্রাবিনিময়-ভিত্তিক বাণিজ্যসম্পর্কের দেশগুলির তুলনায় আমদানীকৃত পণ্যে বেশী দাম দিচ্ছে, এ ধারণা ভিত্তিহীন)। ডঃ সুমিত্রা চিস্তি-ও অনুরূপ কথা বলেছেন : "Pricewise, India has not been adversely affected. It has been able to get goods very often at cheaper prices than those bought from other sources and prices have in any case been normally kept aligned to world prices. In exports as well, the prices have been favourable to India and in some cases higher than what it received from the rest of the world." (Sumitra Chisti, India's Trade with East Europe, op cit)।

এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে, যা ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্যের বিরুদ্ধে কুৎসার মুখোশ খুলে দেয়। যাঁরা তথ্য নিয়ে মুক্ত চিত্তে ভারত-সোভিয়েত বা ভারত-সমাজতান্ত্রিক সমবায় বাণিজ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন, তাদের কাছে এ কুৎসাগুলি অজানা নয়। বহুল প্রচারিত একচেটিয়া পুঁজিনিয়ন্ত্রিত দৈনিকগুলি এ কুৎসা প্রচারে নিরলস।

সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ভারতের ব্যবসায়িক কিরকম স্বার্থানুকূল, তিন বছর আগে পণ্য রপ্তানী সম্পর্কে এক সেমিনারে সেকথা

"Coming to export of knitwear to rupee areas, my submission is that this export can be doubled provided we in the Ministry and others in the economic ministry shed this idea that this export is some kind of a second rate export, we import so much of wool worth so much and get rupees or whatever it is in return for our exports, a kind of logic prevails. This is not fair. If we are paying in dollars or other hard currency, then there is some logic behind this. In fact, we are providing employment to lakhs and lakhs of people and we are making ourselves capable of exporting to the West. From my own experience of exports of not only garments, but so many other items, we know that it is by exporting to rupee area we are slowly improving our capability to export to the West. Even from the point of view of being able to export to the west, we must see that our exports to the rupee area are not neglected. I am sure, if a poll is conducted in the Ministry of Commerce, leave alone the Ministry of Economic Affairs, 90 per cent of the officers will say that rupee export is somewhat less. It is out of courtesy that they have agreed to call it rupee trade ; it would have been rouble or dollar trade. It is only balanced trade. We can export to any country we want and get what we want in terms of dollars or any other currency. Export to rupee area is in many ways superior to GCA areas. When we export to GCA (অর্থাৎ General Currency Area—লেখক) areas they are not bound to sell us what we want from them.

(Proceedings of the Seminar on "Prospects of Woollen Exports" Dec 3, 1975 at New Delhi : Wool News, Feb '76, p. 31) । সহজ অনুবাদ : রুপি-বাণিজ্য এলাকায় (অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ক্ষেত্রে—লেখক) বয়নবস্ত্র রপ্তানীর ব্যাপারে, আমার

ভাগ করি যে এই রপ্তানী দ্বিতীয় স্তরের গোছের কিছু, তাহলেই এই রপ্তানী দ্বিগুণ হতে পারে। যুক্তিটা এমন যে আমরা এত অর্থব্যয়ে পণ্য আমদানী করি আর রপ্তানীর পরিবর্তে টাকা যা কিছু পাই, এটা ঠিক নয়। আমাদের যদি ডলার বা বিনিময় মুদ্রা দিতে হত, তাহলে এর পেছনে এরকম যুক্তি দেওয়া যেত। প্রকৃতপক্ষে আমরা লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করছি এবং পশ্চিমী দুনিয়ায় রপ্তানীসক্ষম করে তুলছি নিজেদের। শুধু পরিধেয় বস্ত্র রপ্তানী, অন্যান্য পণ্য রপ্তানী করে আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, রুপি এলাকায় রপ্তানী করেই আমরা ধীরে ধীরে পশ্চিমী দুনিয়ায় রপ্তানী ক্ষমতা অর্জন করেছি। পশ্চিমী দুনিয়ায় রপ্তানী যোগ্যতা অর্জনের দিক থেকেও, আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে রুপি এলাকায় রপ্তানী অবহেলিত না হয়। অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রকের কথা বাদই দিলাম, যদি বাণিজ্যমন্ত্রকে ভোট নেওয়া হয়, আমি নিশ্চিত যে, ৯০ শতাংশ কর্মচারী বলবেন, রুপি এলাকায় আমাদের রপ্তানী কম। সৌজন্যের খাতিরেই তারা একে রুপি বাণিজ্য বলতে রাজি হয়েছে। এটা ডলার বা রুবল বাণিজ্য হতে পারত। এটা সমতার বাণিজ্য। আমরা যে কোনো দেশে খুশী রপ্তানী করতে পারি ও যা খুশী পেতে পারি ডলার বা অন্য কোনো বিনিময় মুদ্রার বিনিময়ে। অবাধ বাণিজ্য এলাকার অনুপাতে রুপি এলাকায় বাণিজ্য বহু দিক থেকে শ্রেয়, আমরা যখন অবাধ বাণিজ্য এলাকায় রপ্তানী করি, তারা আমাদের চাহিদাকে কিছু বিক্রী করতে বাধ্য নয়।"

সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বাণিজ্য আমাদের অর্থনীতিকে বিশেষ শক্তিদান করছে, একথা অস্বীকার করা মানে সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া। এটা কেবলমাত্র রপ্তানী একক মূল্যে লাভ বা আমদানী মূল্যে সুবিধার ব্যাপার নয়, অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য নেহাৎই লেনদেনের ব্যাপার, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমবায়ের সঙ্গে বাণিজ্য জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগমনে সহায়ক।

ভারত ও সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যাপারে ইদানীং সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে ভারতীয় মুদ্রা রুপি ও সোভিয়েত মুদ্রা রুবলের বিনিময় সম্পর্কে। একচেটিয়া পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রে এ নিয়ে কুৎসার অন্ত নেই। সাধারণভাবে এইসব কুৎসার উদ্দেশ্য, সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ রুবলের মান একতরফা বাড়িয়ে ভারতকে প্রতারণার পথ নিয়েছে। তথাকথিত

"রুপি-রুবল-স্টার্লিং" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কুৎসাত্মক ও তথ্যবিকৃতিপ্রবণ ঐ প্রবন্ধে বলা হয় যে, ১৯৭৪ সালের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন একতরফাভাবে এক রুবলের বিনিময় হার ৮·৩৩ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২ টাকায় বাড়িয়ে তোলে। প্রাবন্ধিকমশাই এ থেকে একটা হিসেবও করে ফেলেন যে, ভারতকে যেখানে দিতে হত ৮৩০ টাকা, সেখানে দিতে হবে ১২০০ টাকা। কিন্তু ঐ সময়েই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সি সুব্রহ্মনিয়ম সংসদে বিবৃতি দেন যে, রুপি-রুবল বিনিময় হারের যে বিতর্ক চলছে ভারত সরকার ও সোভিয়েত সেন্ট্রাল ব্যাংকের মধ্যে, তা কেবলমাত্র অ-বাণিজ্যিক লেনদেনের মধ্যে প্রযোজ্য, (যা মোট লেনদেনের এক শতাংশও নয়) যতদিন এ ব্যাপারে মতৈক্য না হচ্ছে। অথচ ঐ প্রাবন্ধিক একটা মোটামুটি হিসেব করে ফেললেন যে, এতে ভারত কিরকম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অবশ্য ঐ প্রবন্ধটি যে পাঠককে যথাযথ তথ্য পরিবেশন করার জন্য প্রকাশিত হয়েছিল তা নয়, বরং পাঠককে বিভ্রান্ত করার জন্যেই রচিত হয়েছিল। এ সিদ্ধান্তে কেন উপনীত হয়েছি, তার কয়েকটি কারণ দর্শাচ্ছি। ঐ প্রবন্ধে বলা হয়েছিল যে, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির ১২ ধারা অনুযায়ী কোনও দেশ একতরফা কিছু করতে পারে না, করলেও ৪৫ দিনের মধ্যে সে নিয়ে বৈঠক বসতে হবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্য চুক্তির মোট ধারা বারোটির অনেক কম। সাংবাদিকতার নামে সর্বাধিক বিক্রীত দৈনিকটি কি চালাচ্ছে, পাঠক নিজেই তা নিরূপণ করতে পারেন। অবশ্য প্রাবন্ধিক তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন একটিমাত্র বাক্যে: "১৯৭৬ সালে ভারত টাকার দাম কমিয়েছিল মার্কিন চাপে, কিন্তু ভারতের স্বার্থের কথা ভেবে", মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আনন্দবাজার পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধ যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল, তার আরো প্রমাণ দেওয়া যায়। ঐ গোষ্ঠীরই দৈনিক 'বিজনেস স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় ২৯ মার্চ, ১৯৭৫ (অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের একমাস আগে) 'রুপি ডার্লাস রুবল' শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি তুলনা-মূলকভাবে অনেক তথ্যমূলক ছিল, তাতে বলা হয়: 'India is understood to have proposed a new formula for fixing the rupee-rouble exchange ratio on the basis of the "weighted average of Indian trade in different currencies." This is in contrast to the method

of averaging the cross rates of the major currencies in the international market with rupee, which is the method stated to be followed by tha State Bank of USSR in arriving at the rupee rouble rate.' উপরোক্ত উদ্ধৃতির মর্মার্থ এই যে, ভারত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত "ক্রসরেট অ্যাভারেজ" সূত্র মানছে না, সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ ঐ সূত্র অনুসারে রুবল-রুপি বিনিময় হার পরিবর্তনের কথা বলছে। সুতরাং সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুসারেই ঐ বিনিময় হার পরিবর্তনের কথা বলেছে। যদি এই হার বাণিজ্যিক লেনদেনে প্রয়োগের কথা হত, সেটা কি অযৌক্তিক হত? সোভিয়েত ইউনিয়নের এই আচরণ কি বন্ধুজনোচিত নয়?* আনন্দবাজারের প্রাবন্ধিক এই মৌলিক প্রশ্নগুলি এড়িয়ে গেছেন। স্পষ্টত এ মনোভাব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, যার মূলকথা উগ্র সোভিয়েত-বিদ্বেষ।

ভারত-সোভিয়েত বা ভারত-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমবায়ের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, যেগুলি নিয়ে সম্প্রতিকালে নকশালপন্থী ও চীনপ্রেমিকেরা প্রতিনিয়ত বিভ্রান্তির প্রয়াস চালাচ্ছে। তার কয়েকটি এ নিবন্ধে আলোচনা করেছি। এ ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত অত্যাবশ্যক। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি থেকে আমাদের আমদানীকৃত পণ্যের চরিত্র। নকশালপন্থীরা বলে থাকে যে, ঐসব আমদানীকৃত পণ্য আমাদের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে তুলছে। পূর্ব ইওরোপ (সোভিয়েত ইউনিয়নসহ) থেকে আমরা যা আমদানী করি, তার সিংহভাগ হল মূলধনী পণ্য (capital goods), যা শিল্পোদ্যোগে প্রয়োজনীয়। ১৯৬০-৬১ সালে দেখা যায়, পূর্ব ইওরোপ থেকে মোট আমদানীর ৬২·২% মূলধনী পণ্য ও ভারী যন্ত্রপাতি, ১৬·২ মাঝারি শিল্পপণ্য ও কাঁচামাল।

* এ প্রবন্ধটি নভেম্বর '৭৮এ রুপি-রুবল চুক্তি সম্পাদিত হবার পূর্বে রচিত। রুপি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতি রুবল দশ টাকা হারে রফা হয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে চার বছরের বিরোধের অবসান ঘটল। এই চুক্তিও ভারতের অনুকূলে সম্পাদিত হয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ক্রস-রেট পদ্ধতি অনুসরণকালে রুবলের অনুপাতে রুপির ৪০ শতাংশ অবমূল্যায়ন হয়েছে, [illegible] ২০ শতাংশ মেনে নেওয়া হয়েছে। (দ্রষ্টব্য: Rupee-Rouble

Agreement, Economic and Political Weekly, Dec 2, 1978—এই নিবন্ধটি উৎসাহী পাঠকের অবশ্য পাঠ্য। এ পত্রিকাটি কিন্তু সাধারণত সোভিয়েতবিরোধী প্রবন্ধ ও অভিমত প্রকাশ করে।

১৯৭৩-৭৪ সালে এই দুই অনুপাত পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ালো ৫১·১% ও ২৮·৭%, (Cf. Foreign Trade Review. October-November '75)। প্রশ্ন হতে পারে যে, ভারী যন্ত্রপাতি ও মূলধনী পণ্য আমদানী কমল কেন? তার কারণ ভারী শিল্পে ভারতের অগ্রগতি তার স্বয়ম্ভরতা বাড়িয়ে তোলা, যার ফলে পুরনো অনেক পণ্য এখন আমদানী করতে হয় না, আবার নতুন কিছু পণ্য আমদানী করতে হয়। মার্কিনি শিল্পপণ্যের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, অনেক উৎপাদনী উপকরণ ও কাঁচামাল ভারতের প্রয়োজনে ভারী শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার যথাযথ সদ্ব্যবহারের জন্য। যেমন রাষ্ট্রীয় সংস্থা ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালস যেসব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরী করে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ক্রোম-স্টিল সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আমদানী করা হয়। সুতরাং পূর্ব ইওরোপ থেকে আমদানীর কাঠামো ভারতের শিল্প উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক, একথা বাস্তব সত্য।

এরা বলে থাকে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতে পুঁজিলগ্নী করে নির্মম শোষণ চালাচ্ছে। লোকসভায় এক প্রশ্নোত্তরে কিছু দিন আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান ১৯৭৩-৭৪ থেকে ১৯৭৫-৭৬এর মধ্যে প্রতি বছর কোন দেশে কত টাকা মুনাফা রয়্যালটি, ডিভিডেণ্ড, সুদ কারিগরী সাহায্য বাবদ পাঠানো হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে কেবল কারিগরী সাহায্য বাবদ টাকা পাঠানো হয়েছে, অন্য খাতে নয়। (Lok Sabha No. 1283, dt. 25. 7. 78)। স্বল্পতম কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও জানে যে, পুঁজি লগ্নী না করলে মুনাফা, রয়্যালটি বাবদ টাকা পাঠানো যায় না। নকশালপন্থীরা একথা ভালোভাবেই জানে, তবু কুৎসায় নেমেছে। কারণ আর কিছু নয়, তাদের আরাধ্য পিকিং এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিবেক বন্ধক রেখেছে। চীন এখন সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের পথ বন্ধ রেখেছে, একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ২৬।৯।৭৮ তারিখে পিকিং-এর পিপলস ডেলি (রেনমিনবিরাও) স্বীকার করেছে চীনে বেকার সমস্যার অস্তিত্বের কথা। [illegible]

সমস্যা সমাধান এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।" (বিজনেস স্ট্যাণ্ডার্ড, ৩ পি, ৭।১০।৭৮)।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী হয়ে কি সমাজতন্ত্র সংরক্ষণ করা যায়? বৈদেশিক নীতিতে সাম্রাজ্যবাদের পদলেহন ও অভ্যন্তরীণ নীতিতে সমাজতন্ত্র একই সঙ্গে চলে না, কারণ সেটা স্বস্বগতভাবে বিশ্লেষণযোগ্য নয়। আমাদের দেশে যেসব নকশালপন্থীরা চীনের প্রশস্তি ও সোভিয়েত বিদ্বেষের প্রচারক, তাদের কাজকর্ম বিষয়গতভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই সুবিধা করে দেয়।

ভারত ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমবায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে অপপ্রচার কেন? আমরা জানি যে, এ সম্পর্ক কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেন নয়, ভারতের শিল্পবিকাশ ও আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যের সঙ্গে এ সম্পর্কের যোগসূত্র। আসলে ভারত সোভিয়েত সম্পর্কের বিকাশ-এর প্রাথমিক পর্ব হতেই নয়া উপনিবেশবাদী ও কায়েমী স্বার্থ এই কুৎসার পথ নিয়েছে। কারণ আর কিছু না, ভারতকে স্বয়ম্ভর হতে না দেওয়া, নয়া উপনিবেশবাদী গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা। তবে আজকাল কায়েমী স্বার্থের পরিশ্রম অনেকটা লাঘব হয়েছে। কারণ তাদের কাজ করে দিচ্ছে নকশালপন্থীরা, যেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরন্তর সোভিয়েত-বিরোধী কুৎসা করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই সুবিধা করে দিচ্ছে প্রকারান্তরে।

অক্টোবর বিপ্লব এবং উপনিবেশ জাতিগুলির ভবিতব্য

আকাদেমিসিয়ান ইয়েভগেনি ঝুকভ

বিপ্লব কখনো পুরনো হয় না, বস্তুত নবীনতর হয়। ৬১ বছর আগে রাশিয়ায় পৃথিবীকে পুনর্গঠিত করার যে সর্বব্যাপী প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা চলছে, এর প্রমাণ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুষ্টি এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ভাঙন। পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের প্রায় অর্ধেক, অর্থাৎ প্রায় ২০০ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক অধীনতার হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করেছেন এবং গত কয়েক দশকে ৭০টির বেশি স্বাধীন রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের জয় গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গভীরতম সংকটের সূচনা করেছিল এবং পৃথিবীজুড়ে সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত প্রতিষ্ঠাভূমিকে গুরুতররূপে দুর্বল করেছিল। উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে ব্যাপক জনগণ অক্টোবর বিপ্লবজাত প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ সমর্থনের উপর নির্ভর করে সফল মুক্তিসংগ্রাম চালাবার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

অক্টোবরের অভিঘাতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির দুকূলপ্লাবী জোয়ারের ফলে মঙ্গোলিয়ার জনগণের বিপ্লব জয়ী হয়েছিল, আফগানিস্তান জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করেছিল, তুরস্কের জাতীয় সার্বভৌমত্ব সুসংহত হয়েছিল এবং চীনে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠাভূমি গুরুতররূপে দুর্বল হয়েছিল। ভারত, ইরাক, সিরিয়া ও মিশরে উপনিবেশবাদীদের পায়ের তলায় মাটি কাঁপছিল। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, বর্মা, মালয় ও ফিলিপাইনে এবং লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশগুলিতে।

বিশ্বব্যাপী মুক্তি প্রক্রিয়ার গতি বিশেষভাবে দ্রুত হয়ে উঠেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ত আগ্রাসকদের পরাজয়ের পর। হিটলারের জার্মানি ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছিল প্রধানত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির দরুন। এর অর্থ, সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠাভূমি আরও দুর্বল হয়েছিল, উপনিবেশবাদী পরিকল্পনা-চক্রগুলি হেয় প্রতিপন্ন হয়েছিল এবং পরাধীন জাতিগুলির বিপুল সংখ্যাগুরু জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জয় নিকটতর হয়েছিল।

১৯১৯ সনে উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলি আমাদের গ্রহের শতকরা ৭২ ভাগ ভূখণ্ড অধিকার করেছিল এবং এদের জনসমষ্টি ছিল পৃথিবীর জনসমষ্টির ৬১ শতাংশের বেশি। ষাটের দশকের শেষদিক নাগাদ উপনিবেশবাদীদের দখলে ভূখণ্ডের পরিমাণ সংকুচিত হয়ে দাঁড়ায় ৩·৬ শতাংশ এবং এগুলির জনসমষ্টি কমে দাঁড়ায় বিশ্বের জনসমষ্টির ১ শতাংশেরও কম। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের অবশেষসমূহের বিলোপের পর ১৯৮৪ সনে এই অনুপাত একেবারে নগণ্য হয়ে দাঁড়ায়।

ঔপনিবেশিক নিপীড়ন থেকে মুক্ত জাতিগুলির বিকাশ ঘটছে বিশ্ব অঙ্গনে দুটি বড় শক্তির—সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের শক্তির—মধ্যে মুখোমুখি সংঘাতের প্রেক্ষাপটে। এ থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলি কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পথ বেছে নিচ্ছে। সমাজতন্ত্রের দুনিয়া ও পুঁজিবাদের দুনিয়া উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতি একেবারে বিপরীত মনোভাব পোষণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অন্যান্য দেশ উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সমতাপূর্ণ ও পারস্পরিক কল্যাণকর সহযোগিতার এবং তাদের স্বাধীনতার সংহতিসাধনের জন্য চেষ্টা করে। এর বিপরীতে, পুঁজিবাদী দেশগুলি উন্নয়নশীল জাতিগুলিকে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে সমান অধিকার না দিয়ে উপাঙ্গ হিসেবে রেখে দিতে আগ্রহী।

সাম্রাজ্যবাদ উন্নয়নশীল জাতিগুলিকে তাদের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনকারী নানা অর্থনৈতিক সন্ধিপত্র ও সামরিক রাজনৈতিক চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করতে চাইছে এবং আন্তর্জাতিক অর্থ সংগঠনগুলির দ্বারা সব ধরনের তথাকথিত 'সাহায্য' ও চাপ দেবার নীতির আশ্রয় নিচ্ছে। ফলে, পুঁজিবাদী কর্পোরেশনগুলি একমাত্র ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধেই উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে

পুঁজিবাদী শক্তিগুলি এদের যে 'সাহায্য' দিয়েছিল তার দেড়গুণ অর্থ। তদুপরি আজ উন্নয়নশীল দেশগুলির বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ২৫০০০ কোটি ডলার।

বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলির অবস্থার গত ২০ বছরে বহুভাবে অবনতি ঘটেছে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এদের আর্থব্যবস্থায় কোন সমৃদ্ধি নিয়ে আসে নি, স্বাধীনতা তো এনে দেয়ই নি। উন্নয়নশীল ও অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলির মোট জাতীয় উৎপন্নের মধ্যেকার ব্যবধান ১৯৩৩ সনের ৮'৪ গুণ থেকে বেড়ে ১৯৭৩ সনের ১৩'৫ গুণ। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সমর্থদেহী ব্যক্তিদের প্রায় শতকরা ২০ জন (মোট প্রায় ১০ কোটি) কর্মহীন। কোটি কোটি নরনারী অনাহার ও অপুষ্টিতে ভুগছে।

এসবই গত কয়েক বছরে বিপুল জনসমষ্টির মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে, শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্র করে তুলেছে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শাসক অংশগুলিকে তাদের জাতীয় স্বার্থের সপক্ষে অধিকতর কর্মতৎপরতায় লিপ্ত করেছে।

এসব দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সামনে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অন্যান্য দেশের গতিময় বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত। কাজেই, তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাচ্য প্রজাতন্ত্রগুলির তথা মঙ্গোলিয়ার সফল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারের অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করে সমাজতান্ত্রিক বিকাশগতির কর্মসূচী হাজির করছে। এই অভিজ্ঞতা পৃথিবীর সামনে সামাজিক সংগঠনের পশ্চাৎপদ রূপগুলি থেকে সবচেয়ে আধুনিক ও অগ্রসর রূপগুলিতে উত্তরণের বাস্তব সম্ভাবনাকে তুলে ধরছে।

উদীয়মান জাতীয় রাষ্ট্রগুলির সামনে সম্ভাব্য ভবিতব্যের প্রশ্নটি বেশ প্রাসঙ্গিক। আফ্রিকা ও এশিয়ার একাধিক দেশ তাদের বিকাশে সমাজতান্ত্রিক নির্দেশিকাকে অনুসরণযোগ্য বলে বেছে নিয়েছে।

জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ নানা রূপে সাহায্য দিচ্ছে। তাছাড়া জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষায় লিপ্ত জাতিগুলিকে সুসঙ্গতরূপে নৈতিক ও রাজনিতিক সমর্থন তো দিয়েই চলেছে। এর নির্দিষ্ট অভিব্যক্তি ঘটছে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সাহায্যের মধ্যে, বিশ্ব অঙ্গনে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিকে কূটনৈতিক সমর্থনদানের মধ্যে। আর

সর্বশেষে, এর নিহিত অর্থ হল যেখানে প্রয়োজন সেখানেই সরকারগুলির সামরিক সাহায্যের অনুরোধ পালন করা।

সমাজতান্ত্রিক জাতিগুলি, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের প্রধান চাপটা বহন করে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবিপ্লব রপ্তানির সুযোগকে সংকুচিত করে দিচ্ছে এবং এইভাবে উপনিবেশ ও পরাধীন জাতিগুলির জনসাধারণের পক্ষে তাদের সংগ্রাম চালানোকে সহজতর করে দিচ্ছে।

১৯৭৭ সনের গোড়ার দিক পর্যন্ত ৬০টি উন্নয়নশীল জাতির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি ছিল। সোভিয়েত সাহায্যের প্রায় ৯০ শতাংশ বিভিন্ন শ্রমশিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের খাতে, অর্থাৎ প্রধানত অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে, ব্যয়িত হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাহায্য নিয়ে প্রায় ৬০টি উন্নয়নশীল দেশে প্রায় ৩ হাজারটি শিল্প ও অন্যবিধ প্রকল্প নির্মিত হয়েছে বা হচ্ছে। পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদের দেশগুলি উন্নয়নশীল জাতিগুলিকে সহজ শর্তে প্রায় দেড় হাজার কোটি রুবল দীর্ঘমেয়াদী ধার হিসেবে দিয়েছে। এইসব দেশের অনেকগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য দিয়ে তাদের উৎপাদনের নিহিত শক্তি বাড়ছে, তাদের ভারী শিল্পের বনিয়াদ রচনা করেছে, এবং লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিদ্যুৎশক্তি, তেল অনুসন্ধান ও পরিশোধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে শত শত প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছে।

সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক পূর্ণ সমানাধিকার, পারস্পরিক উপকার, জাতীয় সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অ-হস্তক্ষেপের সম্পর্ক। ভবিষ্যৎদৃষ্টি দিয়ে লেনিন যেকথা বলেছিলেন সেইভাবেই যেসব জাতিকে ঔপনিবেশিক পীড়নের পুরো গুরুভার বইতে হয়েছিল তারা "আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ক্রমেই বেশি করে অবহিত হয়ে উঠছে।"

অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরতার অবসান ঘটাবার এবং জনজীবন গণতান্ত্রিক করে তোলার মৌল সমস্যাদিকে বাগে এনে বর্তমানে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের গভীরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকগুলি মুক্ত জাতি [illegible] পথ অবলম্বন করে সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্যস্থল হিসেবে গ্রহণ

করে শোষণমুক্ত সমাজ নির্মাণে ব্রতী হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির সংখ্যাগুরু অংশের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান শ্রেণীগত পৃথকীভবনের প্রক্রিয়া এই পর্বে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশের এক মৌল লক্ষণ। এ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে আরও বৃহত্তম মাত্রা দান করছে এবং জনগণের ব্যাপকতর অংশকে টেনে আনছে। স্বাধীনতাকে সুসংহত করার এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত বিকাশের চরিত্র শুধু জাতীয় নয় সামাজিকও বটে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সামাজিক শক্তিগুলির মেরুকরণও শ্রেণীগত বিরোধকে প্রকাশ করছে ও তীব্র করছে এবং প্রায়শই স্থানীয় শোষকশ্রেণী-গুলির উচ্চস্তরের গোষ্ঠীগুলিকে বাইরের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে যোগসাজসে চলতে তাগিদ দিচ্ছে।

এ মুক্তির প্রক্রিয়াকে জটিল করছে এবং কোন কোন স্থানে কখনো কখনো একে মন্থরগতি করে তুলছে। কিন্তু এ নিশ্চিতই সাময়িক ব্যাপার। জাতিসমূহের পূর্ণ জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির পথে যে নির্দিষ্ট অসুবিধাই থাকুক না কেন, অক্টোবর মহাবিপ্লবজাত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান শক্তির দরুন প্রতিক্রিয়ার দুর্বল হয়ে পড়ার এবং প্রগতিকামী সামাজিক শক্তিগুলির পরাক্রম অবিচলভাবে বেড়ে ওঠার ঐতিহাসিক স্তরে পৃথিবী প্রবেশ করেছে।"

সোভিয়েত সমীক্ষা : সংখ্যা, ১১-৫০
১৯৭৮ থেকে গৃহীত

জাতীয় মুক্তির জন্য কাম্পুচিয়ার জাতীয় যুক্তফ্রন্টের ঘোষণাপত্র

প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় স্বদেশবাসীগণ,
প্রিয় কর্মী ও যোদ্ধাগণ,
বিদেশস্থ প্রিয় স্বদেশবাসীগণ,

উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের জোয়ালে কাম্পুচিয়া বাঁধা থাকার সুদীর্ঘ কালপর্ব ধরে আমাদের কত স্বদেশবাসী কর্মী ও যোদ্ধারা আমাদের পূর্বপুরুষদের গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং অসংখ্য অসুবিধা ও ত্যাগ স্বীকার সত্ত্বেও ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অতুলনীয় বীরত্ব সহকারে অক্লান্তভাবে লড়েছেন যাতে করে আমাদের দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা, আমাদের মহীয়সী আঙ্কোর ভূমির গৌরব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশেষ করে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশপ্রেমের যুদ্ধের সময়, আমাদের নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে এবং একই সময় সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলির ও পৃথিবীজুড়ে শান্তি ও ন্যায়বিচারকামী জনগণের সহ-মর্মিতা, সমর্থন ও সাহায্য লাভ করে আমাদের জনগণ ১৯৭৫, ৭ এপ্রিল তারিখে এক গৌরবমণ্ডিত জয় অর্জন করেন এবং আমাদের দেশকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে কাম্পুচিয়ার জনগণের সামনে এক নতুন যুগ—মুক্তি, স্বাধীনতা ও সমাজ-তন্ত্রের যুগ উন্মোচন করেছিলেন।

আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর আমাদের জন্য শান্তি উপভোগ করতে, জাতীয় পুনর্নির্মাণে সকল শক্তি নিয়োজিত করতে, এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও সমগ্রভাবে পৃথিবীতে শান্তি, মুক্তি ও স্বাধীনতা কামনা করে এমন সব দেশের সঙ্গে সংহতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে পারত।

কিন্তু গত তিন বছর ধরে ঠিক উল্টোটাই ঘটেছে। নৃশংসতার ইতিহাসে

বলেছিল। প্রতিক্রিয়াশীল পল পত, ইয়াংসেরী চক্র ও তাদের পরিবারবর্গ বেআইনীভাবে ক্ষমতা সম্পূর্ণ দখল করেছিল সর্বতোভাবে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে ও জনগণের ক্ষতি করতে চেয়েছিল, আমাদের কাম্পুচীয় ভাইবোনদের অপরিমেয় দুঃখদুর্দশা ঘটিয়েছিল এবং গোটা জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার বিপদ উপস্থিত করেছিল। চীনা কর্তৃপক্ষই এই বিশ্বাসঘাতক ও স্বৈরাচারীদের উৎসাহ যুগিয়েছিল এবং পুরোপুরি সমর্থন করেছিল।

মুক্তি অর্জনের মাত্র কয়েকদিন বাদে "সর্বাঙ্গীন, আমূল সামাজিক বিপ্লব" ও "সামাজিক শুদ্ধিকরণ"-এর সাইনবোর্ডের আড়ালে ওরা গোটা এক একটা শহরকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল এবং শহর ও নাগরিক কেন্দ্রগুলির লক্ষ লক্ষ নরনারীকে তাদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি ফেলে রেখে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে এক বিপজ্জনক জীবনযাপন করতে ও কঠিন শ্রমের বিনিময়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করেছিল।

ওরা মাতাপিতার সঙ্গে, ভাইবোনের মধ্যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যেকার এবং এমনকি প্রতিবেশীদের মধ্যেকার পবিত্র সম্পর্ক-বন্ধনকেও ছিন্ন করেছিল। বস্তুত, ওরা গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস করেছে যেখানে আমাদের জনগণ পুরুষানুক্রমে বাস করেছেন, হাজার হাজার বছর ধরে আত্মিক বন্ধন গড়ে তুলেছেন।

ওরা জোর করে সহযোগিতার ও অর্থ ও বাজার বিলোপের কথা ঘোষণা করে এবং জনগণকে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে খেতে-পরতে ও ঘুমতে বাধ্য করে। বস্তুত, ওরা আমাদের দেশবাসীদের ছুঁচাবরণযুক্ত বন্দী শিবিরে পশুযূথের মত পুরে দিয়েছে, আমাদের জনগণকে উৎপাদনের উপায় ও ভোগ্যপণ্য থেকে বঞ্চিত করেছে, মাত্রাতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য করেছে আর তাদের দিয়েছে ন্যূনতম খাবার ও পোশাক, সব স্তরের মানুষকে বাধ্য করেছে ক্রীতদাসদের মত দুর্দশার মধ্যে বাস করতে। ওরা জনগণকে বিভিন্ন বর্গে ভাগ করছে। উদ্দেশ্য আরও সহজে তাদের অবদমিত করা এবং পরস্পরকে হত্যা করতে বাধ্য করা।

পল পত-ইয়াংসেরী চক্রের অপরাধমূলক কাজকর্ম শুণে শেষ করা যায় না। সর্বত্রই আমাদের জনগণ মধ্যযুগে কিংবা হিটলারী ফ্যাসিস্তদের দ্বারা আচরিত হত্যালীলার চেয়েও অধিকতর বর্বর, অধিকতর দানবীয় হত্যালীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। পল পত-ইয়াংসেরী চক্র এমনকি এও ঘোষণা করছে যে, নিজেদের

ইতস্তত করবে না। বহু স্থানে ওরা গোটা এক একটা গ্রাম ও পল্লীর অধিবাসীদের হত্যা করেছে। ওরা এমনকি মাতৃজঠরে ভ্রূণকেও রেহাই দেয় নি! এর চেয়েও অশুভ সংবাদ, ওরা পূর্ব অঞ্চলে ১৭ লক্ষাধিক নরনারীকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল।

এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ ওদের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়েছেন; আরও হাজার হাজার ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ায় তাঁরা মাতৃভূমি ছেড়ে বিদেশে চলে গেছেন। যাঁরা দেশে রয়ে গেছেন তাঁরা সতত ভয়ে বাস করছেন, যেন জালে ধরা মাছ। তাঁরা জানেন না কখন তাঁদের পুন হবার পালা আসবে।

পল পত-ইয়াংসেরী চক্র পার্টির নেতৃত্ব বেআইনীভাবে দখল করেছে, ওদের খাইয়ে পরিয়ে রাখার জন্য ও রক্ষা করার জন্য জনগণ যা করেছেন সে-সবকিছু ওরা ভুলে গেছে। ক্ষমতা দখল করেই ওরা এর প্রতিদান দিয়েছে পুন আর অত্যাচার দিয়ে। ওরা স্বদেশবাসীদের ও ওদের কমরেডদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কত কর্মী কত পার্টি সদস্য, প্রকৃত বিপ্লবী ও দেশভক্ত, সশস্ত্র বাহিনীর কত কর্মী ও যোদ্ধা যাঁরা দেশের মুক্তিতে অবদান রেখেছেন এবং মাতৃভূমির প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের প্রমাণ দিয়েছেন, তাঁদের সর্বত্র ও সকল স্তরে পাইকারিভাবে হত্যা করা হয়েছে। এর একমাত্র কারণ তাঁরা পল পত-ইয়াংসেরী চক্রের প্রতিক্রিয়াশীল ও বর্বর কর্মনীতি অনুমোদন করেন নি।

ওরা আমাদের জনগণের সকল ঐতিহ্য, সকল সুন্দর রীতিনীতি ও অভ্যাসকে পদদলিত করেছে এবং দেশের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি ধ্বংসের কাজে মেতেছে। ওরা ধর্মের স্বাধীনতা নিষিদ্ধ করেছে, বলপূর্বক সমষ্টি বিবাহ সংগঠিত করেছে, পরিবার ভেঙেছে এবং আমাদের জাতির রীতিনীতি ও অভ্যাসকে কলুষিত করেছে।

ওরা কাম্পুচিয়ার সুপ্রাচীন রাষ্ট্রীয় ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের মন্দির ও প্যাগোডা ধ্বংস করেছে এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পারিবারিক সামাজিক জীবনে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে। ওরা হিন্দুধর্মকে বিনষ্ট করেছে। চম্পা অধিজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ওরা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে, ১৩-১৪ বছর বয়সের ছাত্রদের লেখা-পড়া ছেড়ে ওদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করেছে।

পল পত ইয়াংসেরী রাজ এক নতুন ধরনের ক্রীতদাস বানাবার রাজ, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এর কোনওরূপ সাদৃশ্য নেই।

আমাদের জাতির বিরুদ্ধে দানবীয় অপরাধকে ঢাকা দেবার ও দেশে-বিদেশে জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য, ওদের কাছে যারা নতি স্বীকারে অস্বীকৃত হবে তাদের সবাইকে হত্যা করতে প্রস্তুত এক বর্বর একনায়কতন্ত্রী ও সামরিক রাজ প্রতিষ্ঠার কুটিল চক্রান্ত কার্যকর করার জন্য এবং চীনা কর্তৃপক্ষের বৃহৎশক্তিসুলভ সম্প্রসারণবাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিল করার জন্য ওরা ভিয়েতনামের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষ উসকে দিয়েছে এবং এইভাবে বন্ধুকে শত্রুতে পরিণত করেছে। ওরা আমাদের বিপ্লবী সংস্থাগুলিকে চীনা কর্তৃপক্ষের তাঁবেদার বাহিনীতে এবং বিদ্রোহের গণ-আন্দোলনকে দমনের হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

প্রদ্ধেয় স্বদেশবাসীগণ,

প্রিয় কর্মী ও যোদ্ধাগণ,

বিদেশস্থ প্রিয় কাম্পুচিয়া বাসীগণ,

পল পত-ইয়াংসেরী বিশ্বাসঘাতক ও স্বৈরাচারী চক্র কাম্পুচিয়াকে রক্ত আর অশ্রুর বন্যায় ডুবিয়েছে। এই বর্বর কার্যকলাপ দেশ ও জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার এই নীতির বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে সর্বত্যাগী বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক শক্তিগুলি এই বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালাবার জন্য সারা দেশজুড়ে জনগণের সঙ্গে মিলিতভাবে উত্থিত হয়েছে যাতে করে দাসত্ব ও বিনষ্টির হাত থেকে দেশ ও জনগণকে বাঁচানো যায়।

নবগঠিত জাতীয় মুক্তির জন্য কাম্পুচিয়ার জাতীয় যুক্তফ্রন্ট ঘোষণা করছে:

কাম্পুচীয় জনগণের খাঁটি স্বাধীনতার চেতনায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মুক্তির জন্য কাম্পুচিয়ার জাতীয় যুক্তফ্রন্ট দেশের সবগুলি অধিজাতিকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রবণতা নির্বিশেষে বয়স ও স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে—শ্রমিক, কৃষক, পেটিবুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণি, এখনো শাসক চক্রের চাকুরিতে নিযুক্ত দেশপ্রেমিক ও বর্তমানে বিদেশে রয়েছেন এমন স্বদেশবাসীদের—ঐক্যবদ্ধ করছে কাম্পুচিয়ার জনগণের অব্যবহিত বৈপ্লবিক কর্তব্যকর্ম বাস্তবায়নের জন্য। এই কর্তব্যকর্ম হল গোটা জাতিকে সমবেত করা ও পল পত ইয়াংসেরী সামরিক একনায়ক ও বিদেশী প্রতিক্রিয়া-

শীল শক্তির ক্রীড়নক চক্রকে উৎখাত করার জন্য অভ্যুত্থান ঘটানো যাতে করে এদের বর্বর ও রক্তলিপ্সু রাজকে খতম করা, এক অ-গণতান্ত্রিক রাজ প্রতিষ্ঠা করা, আঙ্কোর ঐতিহ্য ধ্বংস বিকাশ ঘটানো, কাম্পুচিয়াকে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসরমান এক সত্যিকার স্বাধীন, শান্তিকামী, গণতান্ত্রিক নিরপেক্ষ ও জোট নিরপেক্ষ দেশে পরিণত করা এবং এইভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য অভিন্ন সংগ্রামে অবদান রাখা যায়।

এই ঐতিহাসিক ব্রত উদ্যাপনের জন্য, জাতীয় মুক্তির জন্য কাম্পুচিয়া জাতীয় যুক্তফ্রন্ট অঙ্গীকার করছে :

১। এক ব্যাপক জাতীয় সংঘের কর্মনীতি কার্যকর করবে এবং প্রতিক্রিয়াপন্থী পল পত-ইয়াংসেরী চক্রের একনায়কতান্ত্রিক, সমরবাদী ও স্বজনপোষণকারী রাজ উচ্ছেদ করবে। পল পত-ইয়াংসেরী কর্তৃক স্থাপিত জনগণের প্রতিনিধি পরিষদ ভেঙ্গে দেবে। জাতীয় পরিষদের জন্য সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান করবে, সকল স্তরে জনগণতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করবে, জনগণের সমতা, প্রকৃত গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানকারী নতুন সংবিধান রচনা করবে এবং সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসরমান এক স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইন আনবে।

২। জনগণের বিভিন্ন অংশকে ঐক্যবদ্ধ করার ও তারা যাতে প্রতিক্রিয়াপন্থী পল পত-ইয়াংসেরী চক্রের জাতিবিরোধী ও জনবিরোধী প্রকৃতিকে দেখতে পায় সে ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য, জাতীয় মুক্তির জন্য কাম্পুচিয়া জাতীয় যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবী গণ-সংগঠন গড়ে তুলবে, যাতে করে জনগণ এই চক্র কর্তৃক স্থাপিত সমস্ত সংগঠন ও গোষ্ঠীকে ত্যাগ করে যুব জাতীয় মুক্তি সমিতি, নারী জাতীয় মুক্তি সমিতি, জাতীয় মুক্তির ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক জাতীয় মুক্তি সমিতি ও বুদ্ধিজীবী জাতীয় মুক্তি সমিতির অনুগামী হন। এর লক্ষ্য হবে প্রতিক্রিয়াপন্থী ও স্বজনপোষণকারী পল পত-ইয়াংসেরী চক্রকে উৎখাত করা এবং আমাদের জনগণের সকল স্তরের জন্য স্বদেশের আসল ভাগ্যবিধাতা হবার অধিকার নিশ্চিত করা।

৩। কাম্পুচিয়ার বিপ্লবী সেনাবাহিনী গড়ে ও একে উন্নত করে তুলবে। এর কাজ হল জনগণের সঙ্গে মিলে প্রতিক্রিয়াপন্থী পল পত-ইয়ংসেরী প্রশাসনকে চূর্ণ করা, বিপ্লবী ক্ষমতাকে রক্ষা করা, জনগণের জীবন ও সম্পত্তি

রক্ষা করা, আরও কার্যকরভাবে মাতৃভূমিকে রক্ষা করা, কাম্পুচিয়ার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডের অখণ্ডতা দৃঢ়ভাবে উর্ধ্বে তুলে ধরা।

৪। জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অধিকার বাস্তবায়িত করবে এবং তাদের মর্যাদাকে শ্রদ্ধা করবে। সকল কাম্পুচিয়াবাসীরই তাঁদের সুপ্রাচীন জন্মভূমিতে ফিরে আসার, সুখে শান্তিতে তাঁদের পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার অধিকার রয়েছে। সকল কাম্পুচিয়াবাসীরই বসবাস, চলাফেরা, ধর্ম, মত প্রকাশ ও সমিতিবদ্ধ হবার "স্বাধীনতা" এবং কাজ, শিক্ষা ও বিনোদনের, ভোট দেবার ও নির্বাচিত হবার অধিকার রয়েছে। ব্যক্তির অলঙ্ঘনীয়তার নিশ্চিতি দেবে। কাম্পুচিয়ার সামাজিক পরিবারে সবগুলি নৃকুলগত গোষ্ঠীই স্বাধীন ও সমান এবং তাদের রয়েছে একই অধিকার ও দায়দায়িত্ব।

৫। খাঁটি সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবার এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্বাসনের জন্য এক স্বাধীন ও সার্বভৌম অর্থনৈতিক কর্মনীতি অনুসরণ করবে। পল পত-ইয়ংসেরি চক্র যে জাতীয় অর্থব্যবস্থাকে ক্ষয় দিয়েছিল তাকে নতুন করে গড়ে তুলবে। নতুন অর্থব্যবস্থা হবে কৃষি ও শিল্পের বিকাশের ভিত্তিতে জনগণের সেবার অর্থব্যবস্থা, এক পরিকল্পিত ও সমাজ প্রগতির প্রয়োজন মেটাবার অর্থব্যবস্থা।

আবশ্যিক "একসঙ্গে কাজ কর ও খাওয়া-দাওয়া কর" ব্যবস্থা লোপ করবে এবং পল পত-ইয়াংসেরী চক্রের জনগণের ধন ও সম্পত্তি সীজ করার নীতির অবসান ঘটাবে। সকল ধরনের পারস্পরিক সহায়তার আনুকূল্য করবে এবং উৎপাদন বাড়াবার ও জনগণের হিতব্যবস্থা উন্নত করার উদ্দেশ্যে কৃষকদের মধ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতায় উৎসাহ দেবে।

ব্যাঙ্ক স্থাপন করবে, মুদ্রা প্রচার করবে, পণ্য সঞ্চালন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করবে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রবর্তিত করবে এবং সমানাধিকার ও পারস্পরিক উপকারের ভিত্তিতে বাইরের সব দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রসারিত করবে।

পল পত-ইয়াংসেরী চক্রের দাস-জাতীয় বাধ্যতামূলক শ্রমের নীতি লোপ করবে। আট ঘণ্টার কাজের দিন ও কৃত কাজ অনুসারে পারিশ্রমিক প্রবর্তন করবে।

৬। বাধ্যতামূলক বিবাহ লোপ করবে, জীবনসঙ্গীর অবাধ নির্বাচনে উৎসাহ দেবে ও প্রতিটি পরিবারের সুখী জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করবে এবং মেয়েরা যাতে পুরুষদের সমানে সমানে সমাজকে সেবা করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাদের শিক্ষা অর্জন করার ও পেশাগত যোগ্যতা উন্নত করার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবে।

যুদ্ধে পঙ্গু, যুদ্ধে নিহতদের পরিজন এবং বিপ্লবের উত্তম সেবা করেছে এমন ব্যক্তিদের পরিবারের যত্ন নেবে। জনগণের স্বাস্থ্য, বৃদ্ধ, অসক্ত ও অনাথদের যত্ন নেবে। প্রবাসী কাম্বুচীয়দের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করবে ও সে সম্পর্কে যত্নবান হবে। কাম্বুচিয়ায় বিদেশী বাসিন্দাদের প্রতি সঠিক মনোভাব গ্রহণ করবে।

৭। পল পত-ইয়াংসেরী চক্রের প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি লোপ করবে। জাতীয় গণ চরিত্রবিশিষ্ট নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলবে। নিরক্ষরতার অবসান ঘটাবে, জনশিক্ষা বিকশিত করবে, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বৃত্তি-শিক্ষার বিদ্যালয় নির্মাণ করবে। বিজ্ঞানী, শিল্পী, কৃৎকুশলী ও অন্যান্য সংস্কৃতি কর্মীদের তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী যথাযোগ্য স্থানে বসাবে।

পল পত-ইয়াংসেরী চক্র কর্তৃক বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত ঐতিহাসিক স্মারক-চিহ্ন, প্যাগোডা, মন্দির ও পার্বণগুলির রক্ষা ও পুনর্নির্মাণ করবে।

৮। অফিসার ও সৈনিক তথা প্রতিক্রিয়াশীল রাজের প্রশাসনে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী মাতৃভূমি ও নিজ নিজ পরিবারকে বাঁচাবার জন্য জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পল পত-ইয়াংসেরী চক্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবে এবং এ ব্যাপারে তাদের আন্তরিক স্বাগত জানাবে।

যে কট্টর প্রতিক্রিয়াপন্থী মোড়লরা জনগণের বিরুদ্ধে নিজেদের লিপ্ত করেছে এবং রক্তাক্ত অপরাধ সংগঠিত করেছে তাদের শাস্তি দেবে। যারা আন্তরিকভাবে অনুতাপ করবে তাদের প্রতি নরম মনোভাব নেবে। বিপ্লবের সেবায় যারা কৃতিত্ব দেখিয়েছে তাদের যথাযোগ্য পুরস্কৃত করবে।

পল পত-ইয়াংসেরী প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর যারা যুদ্ধে ধরা পড়েছে তাদের প্রতি কারুণিক ব্যবহার করবে এবং সমাজের পক্ষে দরকারী সৎ নাগরিক হয়ে উঠতে তাদের সাহায্য করবে।

৯। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পরস্পরের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডের অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা, একে অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার অ-হস্তক্ষেপ,

সমানাধিকার ও পারস্পরিক উপকারের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ও সমাজব্যবস্থা নির্বিশেষে সকল দেশের প্রতি শান্তি, মৈত্রী ও জোটনিরপেক্ষতার কর্মনীতি অনুসরণ করবে।

১০। পরস্পরের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডের অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে, শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করবে। পল পত-ইয়াংসেরী চক্র ভিয়েতনামের সঙ্গে যে সীমান্ত যুদ্ধ উসকে দিয়েছিল তার অবসান ঘটাবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও প্রতিবেশিত্বের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তি, মৈত্রী, স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির অঞ্চলে পরিণত করার ব্যাপারে অবদান রাখবে। কাম্পুচিয়া কোন সামরিক জোটে যোগ দেবে না কি বা কোন দেশকে তার ভূখণ্ডে সামরিক ঘাঁটি বানাতে বা সামরিক সাজসরঞ্জাম আনতে দেবে না।

১১। পৃথিবার সমস্ত বিপ্লবী ও প্রগতিকামী শক্তির সঙ্গে সংহতি সুদৃঢ় করবে। শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজ প্রগতির জন্য, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সকল জাতির অভিন্ন সংগ্রামকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করবে।

প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় স্বদেশবাসীগণ,

প্রিয় কর্মী ও যোদ্ধাগণ,

বিদেশস্থ প্রিয় কাম্পুচিয়াবাসীগণ,

আমাদের দেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার বিপদের সম্মুখীন।

আমাদের মাতৃভূমি বিপন্ন।

জাতীয় মুক্তির জন্য কাম্পুচিয়ার জাতীয় যুক্তফ্রন্ট সকল অধিজাতির, জীবনের সকল ক্ষেত্রে কর্মরত কাম্পুচিয়াবাসীদের, রাজনৈতিক মতামত ও ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে যুবা-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষের কাছে জাতীয় মুক্তির জন্য কাম্পুচিয়ার জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য এবং স্বজন-শোষণকারী ও রক্তলিপ্সু পল পত-ইয়াংসেরী চক্রের বৈরশাসনের, সমরবাদী ও গণহত্যাকারী রাজকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে এক হয়ে উত্থিত হবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

একমাত্র এই পথেই আমরা আমাদের দেশকে শান্তি ও প্রকৃত স্বাধীনতা এবং আমাদের জনগণকে মুক্তি, প্রকৃত গণতন্ত্র ও সুখ এনে দিতে পারি।

কর্মীগণ, এখনো পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল পল পত-ইয়াংসেরী চক্রের প্রশাসন ও সমরযন্ত্রে কর্মরত কর্মী ও যোদ্ধাগণ। এই চক্রের দেশ ও জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কর্মনীতির বিরুদ্ধে উত্থিত হোন, জনগণের ন্যায্য সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নিন, প্রধান অত্যাচারীদের ধ্বংস করুন এবং জনগণের প্রকৃতই বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত হোন।

জাতীয় মুক্তির জন্য কাম্পুচিয়ার জাতীয় যুক্তফ্রন্ট পৃথিবীর সকল জাতি ও সরকারের শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজ প্রগতির জন্য সংগ্রামরত এবং গণতান্ত্রিক সংগঠনের কাছে আমাদের জনগণের ন্যায্য সংগ্রামে সকল ক্ষেত্রে সক্রিয় সমর্থন ও সহায়তা দেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল, বর্বর ও নৃশংস পল পত-ইয়াংসেরী রাজের ভিত্তি পড়ে উঠেছে এবং এ সম্পূর্ণ পতন এড়াতে পারবে না।

বর্তমান যুগে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই, তা সে যতই বিশ্বাসঘাতক হোক, বীর কাম্পুচীয় জাতিকে ধ্বংস করতে পারবে না।

কাম্পুচিয়ার যে প্রকৃতই বিপ্লবী শক্তিগুলি এক সঠিক বিপ্লবী পথ অনুসরণ করছে এবং জাতির পবিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইতিহাসের প্রবণতার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ এক লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম করছে তাদের এখনো অসংখ্য অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে হবে। কিন্তু তারা দৃঢ়সংবদ্ধ লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমর্থনপুষ্ট এবং শান্তি, ন্যায়বিচার ও সমাজ প্রগতি চায় পৃথিবীর এমন সমস্ত জাতির সহমর্মিতা ও সমর্থন পাচ্ছে। তারা গৌরবমণ্ডিত জয় অর্জন নিশ্চিতই করবে।

বিপ্লবের সময় এসে গেছে।

কর্মী ও যোদ্ধাগণ, ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলিষ্ঠভাবে সামনে এগিয়ে চলুন!

প্রতিক্রিয়াশীল পল পত-ইয়াংসেরী চক্রের উচ্ছেদসাধনের জন্য অবিচল-ভাবে সংগ্রাম করুন।

আমাদের জনগণ নিশ্চিতভাবেই এক শান্তিকামী, গণতান্ত্রিক, স্বাধীন, নিরপেক্ষ, জোট নিরপেক্ষ এবং সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসরমান কাম্পুচিয়াকে গড়ে তুলবেন।

গ্রন্থক পর্যালোচনা

এক

লোকবৃত্ত : ক্ষেত্রনিরীক্ষার মূলসূত্র

—শঙ্কর সেনগুপ্ত

প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশানস
৩ আবদুল হামিদ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯
মূল্য দশ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থকের লেখক Folklore পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত বিগত দুই দশকের বেশি সময় ধরে 'লোকবৃত্ত' (লোকযান, লোকসংস্কৃত) সম্বন্ধে একনিষ্ঠভাবে অনুশীলন করে চলেছেন। উক্ত বিষয়ে তিনি কয়েকটি গ্রন্থক রচনাও করেছেন। বর্তমান গ্রন্থকটি লেখা হয়েছে যাঁরা লোকবৃত্ত সম্বন্ধে ক্ষেত্রনিরীক্ষা অর্থাৎ সরেজমিনে অনুসন্ধানের দ্বারা লৌকিক জীবনে বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তথ্য এবং উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছেন অথবা হবেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে। লেখকের নিজস্ব সুদীর্ঘকালব্যাপী অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধানের দ্বারা তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তারই ভিত্তিতে ক্ষেত্রনিরীক্ষক বা সংগ্রাহকদের সামনে তিনি একটি সুনির্দিষ্ট ও বিশদ কর্মসূচী উপস্থাপিত করেছেন। যাদের জন্য বইটি লেখা তাঁদের পক্ষে এটি বিশেষ উপযোগী হবে।

আমার কাছে বইটির আবেদন আরো ব্যাপক বলে মনে হয়েছে। ক্ষেত্র-নিরীক্ষার মূলসূত্র নির্দেশের পটভূমি হিসাবে লেখক লোকবৃত্তের তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক দিক থেকে যে আলোচনা করেছেন সেগুলি বিশেষ গুরুত্ব ও

ক্ষেত্র-নিরীক্ষায় নিযুক্ত না হয়েও সাধারণভাবে বিষয়টি সম্বন্ধে উৎসাহ পোষণ করেন তাঁদের পক্ষেও এই বইটি আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

কয়েক দশক আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে Folklore কথাটির বাংলা প্রতি-শব্দ হিসেবে অনেকে 'লোকসংস্কৃতি' কথাটি ব্যবহার করতেন। আমাদের দেশের লোকসংস্কৃতির সম্পদের প্রতি সুধীজনের দৃষ্টি যাঁরা সর্বপ্রথম আকর্ষণ করেন সেই পথিকৃৎদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দীনেশ সেন, লালবিহারী দে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে Folklore সমাজবিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখারূপে বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বীকৃতি লাভ করার পর এই বিষয়ে অনুসন্ধান, সংগ্রহ এবং অধ্যয়নের পরিধি বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়। তখন অনুভূত হয় যে, Folklore নামক সমাজবিজ্ঞানের শাখাটির ক্ষেত্র সাধারণত লোকসংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তার চেয়ে অনেক ব্যাপক। শুধুমাত্র লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত বা লোকনৃত্যই নয়, লোক সাধারণের মধ্যে আবহমানকাল প্রচলিত নানা কাহিনী, রূপকথা, উপকথা, বীরগাথা, প্রবাদ, প্রবচন, সংস্কার, উৎসব অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, দৈনন্দিন জীবনের আচার আচরণ সবই সমাজবিজ্ঞানের এই শাখাটির অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য নৃতাত্ত্বিক অর্থে ঐ সব কিছুকে সংস্কৃতি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু সাধারণত লোক-সংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝি তার পরিসর নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞার চেয়ে অনেক সংকীর্ণ। তাই ক্রমশ Folklore কথাটি বোঝাতে 'লোকযান', 'লোকবৃত্ত' প্রভৃতি পরিভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে।

কিন্তু 'লোকযান', 'লোকবৃত্ত' প্রভৃতি পরিভাষা আমাদের দেশে সাধারণ-ভাবে শিক্ষিতজনের কাছে এখনও সুপরিচিত হয়ে ওঠে নি। তার কারণ প্রধানত এই যে, সমাজবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে Folklore আমাদের দেশে এখনও উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে, বিশেষত বিগত ষাট ও সত্তরের দশক থেকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তিরা এই ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন। তবুও তাঁদের কাজ এখন পর্যন্ত একটা সুষ্ঠু ও সমবেত পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হয় নি বা মানবিকী বিদ্যার একটি শৃঙ্খলার রূপ নেয় নি। লোকযান তথা লোকবৃত্তের সংজ্ঞা, বিভিন্ন অঙ্গ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। অন্যদিকে যাঁরা এই বিষয়ে উৎসাহী হয়ে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন

আছে। অথচ তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক উভয় দিক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে অনুসন্ধান ও সংগ্রহের কাজটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়, সংগৃহীত উপকরণগুলির যথোচিত সদ্ব্যবহারও সম্ভব নয়। তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক, উভয় দিকের সমন্বয় প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন এই বিষয়টি সম্বন্ধে উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে ধারণার খানিকটা অন্তত সমীকরণ, অনুসন্ধান ও সংগ্রহের কাজে কিছু পরিমাণে সমন্বয়। শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত দীর্ঘদিন ধরে নিজে অনুসন্ধান ও সংগ্রহের কাজ ছাড়াও লোকযান বা লোকবৃত্ত সম্বন্ধে তত্ত্বগত অধ্যয়নের কাজেও যথেষ্ট অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন দেশের লোকবিজ্ঞানীদের মতামত অধ্যয়ন করেছেন এবং সেগুলির সারাংশ বর্তমান পুস্তকে উদ্ধৃত করেছেন।

লেখক বলেছেন "লোকবৃত্ত অনুশীলনের দ্বারা এর (লোক সাধারণের মধ্যে প্রচলিত নানা সংস্কার, বিশ্বাস, রীতিনীতি ইত্যাদি—সংকলক) বহু জিনিস বোঝা, বহু ব্যাপার উপলব্ধি করা সম্ভব। এবং এখানেই লোকবৃত্তবিদ হয়ে পড়েন লোকবিজ্ঞানী। লোকবৃত্তকে তিনি লোকবিজ্ঞানের বিষয় বলে মনে করেন। লোকবিজ্ঞান অর্থাৎ লোকবিষয়ক জ্ঞান।" লেখক সঠিকভাবেই বলেছেন, "লোকবৃত্তশাস্ত্র আমাদের দেশে আলাদাভাবে গড়ে ওঠে নি। এ শাস্ত্র মূলত লোকবৃত্তের উপকরণ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যজ্ঞান এবং লোকবৃত্ত অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মকানুন, পদ্ধতি প্রকরণ"। কিন্তু লোকবৃত্তের অনুশীলনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সচেতন বিজ্ঞানীর আগমন এখনও হয় নি বলা চলে। "এখানে যাঁরা লোকবৃত্ত সংগ্রহ ও অধ্যয়নে উৎসাহ দেখালেন তাঁরা শুধু সংগ্রহ এবং সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেই বসে রইলেন, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে তৎপর হলেন না। অথচ শুধু সংগ্রহ ও সংকলন বিষয়কে বিজ্ঞানের রাজত্বে নিয়ে যেতে পারে না।" আমার মতে লেখকের এই মন্তব্য খুবই সঠিক। পরিপ্রেক্ষিত পরিষ্কার না থাকলে অনুসন্ধান ও সংগ্রহের কাজটি সুষ্ঠুভাবে হতে পারে না। লোকবৃত্ত অনুশীলন বিজ্ঞানভিত্তিক না হলে সংগৃহীত উপকরণগুলির শ্রেণীবিন্যাস, মূল্যায়ন ও সামগ্রিক তাৎপর্য বিচার সম্ভব নয়। অথচ তাই যদি নাই হয় তাহলে ভবিষ্যতে অনুসন্ধানের কাজ কোন পথে কোন লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলবে তার হদিস পাওয়া যায় না।

পরিপ্রেক্ষিত স্পষ্ট করার জন্য লোকবিজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও' বটেই এমনকি পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মানবিকী বিদ্যার শাখাগুলি সম্বন্ধে কার্যকরী জ্ঞান থাকা চাই।

লোকবৃত্তের অনুশীলন প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের লোকসাধারণের আবহমান-কাল ধরে প্রবাহিত জীবনধারা, মানসিকতা ও সমাজবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার বিবর্তনের ইতিহাস অনুশীলন। সংশ্লিষ্ট মানবিকীবিদ্যার অন্যান্য শাখাগুলির সঙ্গে সমন্বয় বিধান করে লোকবৃত্তের অনুশীলন আসলে জাতির নিজেকে জানার মহানব্রতে পরিণত হয়। সেইজন্যই প্রয়োজন হয় তত্ত্বের। সুখের বিষয় "অধ্যয়ন-অনুশীলন, সংগ্রহ ও নিরীক্ষার সহায়ক গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। থিওরী, মেথড, স্কুল, আইডেন্টিফিকেশান, ইন্টারপ্রিটেশান প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আরম্ভ হয়েছে। ভাবনা-চিন্তা আরম্ভ হয়েছে সংজ্ঞা, অধ্যয়নের যৌক্তিকতা, অধ্যয়নে অধিকারী-অনধিকারীদের ব্যাপার নির্দিষ্ট করার জন্যও।"

আলোচ্য বইটি সংক্ষেপে হলেও লোকবৃত্ত অনুশীলনের একটি সামগ্রিক রূপরেখা উপস্থিত করে উপরোক্ত প্রক্রিয়ার পক্ষে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পূরণ করবে।

২১/১/৭৮ সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

দুই

• পাদরি লঙ্
—অমর দত্ত

• আসামে চা-কুলি আন্দোলন ও দ্বারকানাথ
—অমর দত্ত

পরিবেশক : শরৎ বুক হাউস

লেখক অমর দত্ত অসাধারণ অধ্যবসায় ও একাগ্রতা নিয়ে উনিশ শতকের

ইতিহাস মন্থনে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন। তাঁর সেই সাধনার আরও দুটি ফসল হল—"পাদরি লঙ" এবং "আসামে চা-কুলি আন্দোলন ও দ্বারকানাথ।"

উনিশ শতকের জাগরণকে যুগের মানদণ্ডে বিচার না করার জন্য এই জাগরণের মূল্যায়ন সম্পর্কে দুটি বিপরীতমুখী প্রবণতা লক্ষণীয়। একটি হল এই আন্দোলনের সমস্ত সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতাকে এড়িয়ে গিয়ে এর প্রগতিশীল চরিত্রকে মাত্রাতিরিক্তভাবে উপস্থিত করা আর অপরটি হল আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এই আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রকৃত অর্থে বিপ্লবী ছিলেন না বলে এর প্রগতিশীল ভূমিকাটিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা। এই দুটি প্রবণতাই নিঃসন্দেহে অনৈতিহাসিক। লেখক অমর দত্ত যুগ ও কালের পটভূমিতে স্থাপন করে উনিশ শতকের জাগরণের পথিকৃৎদের এক ইতিহাসসম্মত সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রয়াস করেছেন। এই আন্দোলনের স্বাভাবিক দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন থেকে তিনি এর যথার্থ প্রগতিশীল ভূমিকাটিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। বিশেষ করে, এই আন্দোলনের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা এদেশের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, এবং কৃষকের সমস্যাকে কিভাবে বিচার করেছেন তার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখক এই আন্দোলনের এক অপেক্ষাকৃত অনালোচিত দিককে আমাদের সামনে তুলে ধরে এক প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। শ্রমিক আন্দোলনে এই যুগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা বিশেষ হয় নি—সেদিক থেকে বলতে গেলে অমরবাবু তাঁর 'আসামে চা-কুলি আন্দোলন ও দ্বারকানাথ' নামক বইটিতে প্রায় এক নতুন বিষয়ের অবতারণা করেছেন।

পাদরি লঙ উনিশ শতকের বাঙলার এক পরিচিত নাম। ভারতে তিনি এসেছিলেন মিশনারি হয়ে—উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অগণিত মানুষের কাছে খ্রীষ্টের সুসমাচারের বাণী প্রচার করা। কিন্তু পাদরি লঙের এটাই পরিচয় নয়। লেখক দেশ-বিদেশের নানা তথ্য সংগ্রহ করে এদেশে পাদরি লঙের বিচিত্র কর্মধারার সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করে লঙের চরিত্র সম্পর্কে এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছেন।

মানবদরদী হিউম্যানিস্ট লঙ সর্বত্র নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতি

সংগ্রামে শরিক হয়েছেন। নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত নীলচাষীদের অবর্ণনীয় দুর্দশার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে তিনি নীলদর্পণ নাটকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছেন—'সত্য, ন্যায়, মানবতার জন্য নির্যাতন ভোগ করেছেন। শুধু ভারতে নয়, আয়ার্লাণ্ডের নিপীড়িত জনগণ, রাশিয়ার ভূমিদাসদের অবস্থা তাঁকে পীড়িত করেছে। আর দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ায় যে ভূমিদাস প্রথার বিলোপ ঘটালেন তাতে তিনি বিশেষ উৎসাহ বোধ করেছেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জমিতে কৃষকের রায়তী স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে কৃষকের অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে না। আবার আমেরিকায় দাস প্রথার উচ্ছেদে তিনি মনে করেছেন যে, সমস্ত বিশ্বে এর সুফল অনুভূত হবে। জ্যামাইকা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি দেশের অত্যাচারিত কৃষকদের সঙ্গে তিনি এদেশের নীলচাষীদের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। কাজেই এখানে লঙের আন্তর্জাতিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

লিবারাল বুর্জোয়া ভাবাদর্শ থেকে লঙ এদেশে শিক্ষা বিস্তারেও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাকে ব্যাপক জনগণের মধ্যে বিস্তার করার জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারে নিজেকে উৎসর্গ করেন। ঠাকুরপুকুরে ভার্নাকুলার প্রাইমারী স্কুলের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটির উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। বাঙলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কৃতি-মূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লঙের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পাদরি লঙকে এদেশে সমাজবিজ্ঞান অনুশীলনের প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর রচিত 'Five hundred Questions on the Condition of the Natives of India' গ্রন্থটি এদেশে সমাজবিজ্ঞান অনুশীলনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন গঠনেও তাঁর অপরিসীম ভূমিকা আছে। সমাজবিজ্ঞানের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তিনি দেশের মানুষকে সমাজ ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করে ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জাগরণে তাঁর প্রভাব রেখেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে লঙের অপর একটি অবদান হল এদেশে হিন্দী, উর্দু, সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় বিবলিওগ্রাফির সূচনা। এদেশে জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপক

হয়েছিলেন এবং নানা ধারায় প্রবাহিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্রোতকে সহজে আয়ত্ত করার কাজে তাঁর এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এদেশে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে প্রবাদ ও প্রবচনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি বাংলা প্রবাদমালার এক সংকলনও প্রকাশ করেন।

উনিশ শতকের জাতীয় জাগরণের পটভূমিতে উন্নত বুর্জোয়া ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত পাদরি লঙ এদেশে সমাজমনের জাগরণে ও মুক্ত বুদ্ধির বিকাশে আজীবন যে সাধনা করেছেন অমরবাবু তার এক তথ্যনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরেছেন। আবার খ্রীষ্টীয় আদর্শে দীক্ষিত লঙ মানবপ্রেমকে ঈশ্বর প্রেমের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছিলেন এবং এদেশের নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর আজীবন যে সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে এবং রায়ত ও ভূমিদাসদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামের শরিক হয়ে তিনি যে নির্যাতন ভোগ করেছেন সে সম্পর্কেও পাঠকদের মনে লঙের প্রতি সহানুভূতির সঞ্চার করতে তিনি সমর্থ হয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে লেখক এক বিশ্লেষকের দৃষ্টি নিয়ে সমকালীন ইওরোপে বণিক সভ্যতা ও শিল্প সভ্যতার বিরোধের স্বরূপটির প্রতিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক জীবনাদর্শ অপেক্ষা বর্ধমান বুর্জোয়া জীবনাদর্শ যে নিঃসন্দেহে উন্নত সে কথা স্বীকার করে নিয়ে লেখক শিল্প সভ্যতার মানববিরোধী শোষণের চরিত্রটি সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করেছেন এবং এই পটভূমিতে পাদরি লঙের মানসিকতার সীমাবদ্ধতার দিকেও তিনি সঠিকভাবে অঙ্গুলি সঙ্কেত করেছেন। পাদরি লঙ খ্রীষ্টীয় প্রোটেস্টান্টইজম ও উন্নত বণিক সভ্যতার মূল্যবোধকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ব্রিটিশ শাসনে এদেশের মুক্তি আসবে—এদেশের অর্থনৈতিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি হবে। কিন্তু ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের স্বার্থ আর উপনিবেশের মানুষের কল্যাণ যে অভিন্ন হতে পারে না এটি তার মানসিকতায় ধরা পড়ে নি। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, লঙ একা নন, এই মতবিরোধিতা উনিশ শতকের অনেক মনীষীর মধ্যেই বর্তমান ছিল। উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাও ইংরেজদের আনুকূল্যে এদেশের উন্নতিতে বিশ্বাস করেছেন। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাদের মুক্তিবাদী মনের প্রতিবাদ তাদের বুর্জোয়া জীবনাদর্শের দিকে বিশেষ-

ভাবে আকর্ষণ করেছিল আর তাই শিল্পসভ্যতার সীমাবদ্ধতার দিকটি তাদের দৃষ্টিতে তেমন ধরা পড়ে নি। যুগের বিচারে তাদের এই মানসিকতা সহজেই বোঝা যায়। লণ্ডের মানসিকতার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক সঠিকভাবে দেখিয়েছেন যে, একদিকে যেমন এদেশের দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ব ও নিপীড়নের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে আবার দরিদ্র মানুষদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রতি তাঁর ভীতির প্রকাশও আমরা দেখতে পাই। 'Proletarianism'-এর প্রতি লণ্ডের বিরাগ ছিল সুস্পষ্ট। তিনি মনে করতেন যে, Proletarianism-এর বল প্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভ অধর্ম্ম ও ধ্বংসাত্মক। এদেশে ব্রিটিশ আনুকূল্যে লিবারাল বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে—জমিতে বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠা করে তিনি এদেশে প্রুলেতারিয়ানিজমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

'আসামে চা-কুলি আন্দোলন ও দ্বারকানাথ' বইটিতে লেখক বিশেষ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় শ্রমজীবী মানুষের সমস্যাটি কিভাবে দেখেছেন সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিন্তা ও কর্মকে কেন্দ্র করে লেখক সেই যুগের প্রগতিশীল আন্দোলনের গতিপথকেই সামগ্রিকভাবে পাঠকের কাছে অবারিত করেছেন।

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের উত্তরসূরী দ্বারকানাথ সমাজ সংস্কারক—বিশেষ করে নারীর মুক্তি ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সংগ্রাম। এই উদ্দেশ্যেই 'অবলাবান্ধব' পত্রিকার প্রকাশ। প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত নারীদের মুক্তি সম্ভব নয় তাই স্ত্রী শিক্ষার প্রসারেও তাঁর বিশেষ উদ্যোগ লক্ষণীয়। তাঁরই প্রচেষ্টায় উনিশ শতকের সাতের দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় (১৮৭৩) ও বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় (১৮৭৬)। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার সপক্ষে সংগ্রাম করতে গিয়ে দ্বারকানাথ প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীলদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপেরও শিকার হয়েছেন।

তবে দ্বারকানাথের আরও বড় পরিচয় রয়েছে। ব্রিটিশ পুঁজির যাঁতাকলে পিষ্ট উপনিবেশ ভারতের কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের সপক্ষে তিনি আন্দোলন

গড়ে তুলেছেন—তাদের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি জনমত সংগঠন করেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম সারথী ছিলেন দ্বারকানাথ। সমাজ সংস্কার ও সমাজ কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনে ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করেছেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতসভা। দ্বারকানাথ আমৃত্যু এই সভার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই ভারতসভা পরিচালিত রায়ত আন্দোলন, খোলা ভাটি আন্দোলন ও চা বাগানে কুলি আন্দোলনে তিনি উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভারতসভা দেশের সর্বত্র রায়তসভা প্রতিষ্ঠিত করে রায়তদের জমিদারদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে যত্নবান হয়েছিল। অন্যান্য কারণ ছাড়া: তাদেরই আন্দোলনের ফলে সরকার প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন না করলেও রায়তদের অধিকার রক্ষা ও বৃদ্ধিতে রায়তসভার প্রচেষ্টা অনেকখানি সফল হয়েছিল। রায়তসভা প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর আগেই এই উন্নতিশীল ব্রাহ্ম দলের প্রচেষ্টায় বরাহনগরে 'শ্রমজীবী সমিতি' গঠিত হয়েছিল—এই সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বারকানাথ ও ব্রাহ্মসমাজ আসামে চা বাগানে চুক্তিবদ্ধ দাস কুলিদের উপর যে নির্যাতন চলত তার প্রতি সর্বপ্রথম দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেশীয় পত্র-পত্রিকা চা বাগিচার শ্রমিকদের উপর চা করদের অত্যাচারের কথা প্রকাশ করে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে বিশেষ সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে হিন্দু পেট্রিয়ট, বেঙ্গলী, সঞ্জীবনী, ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। চা-করদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সঞ্জীবনী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ব কৌমুদীও নির্যাতিত কুলিদের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল এবং পরোক্ষভাবে কুলিদের রক্ত মোক্ষণ করা এই চা পান থেকে জনসাধারণকে বিরত হতে আহ্বান জানিয়েছিল। 'আসামে কার্যক্ষেত্র' নামে এক পত্র লেখা হয়েছিল—'আসামের চা যদি রাসায়নিক উপায়ে বিশ্লিষ্ট করা যায়, তবে তাহার মধ্যে এই কয়টি জিনিস দেখিতে পাইবেন—অর্ধ অংশ কুলিদের রক্ত, সিকি অংশ ব্যভিচার আর অপর সিকি অংশ কুলিদের হৃদয়ের অপহৃত ধর্মভাব। যাহাদের ধর্ম ও নীতির প্রতি সম্মান

আছে তাহারা এই সব দেখিয়া শুনিয়া কখনই আসামের চা পান করা দূরে থাকুক, স্পর্শ করিতেও চাহিবেন না '...

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতসভার পক্ষ থেকেও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিপন-এর কাছে ভারতীয় কুলিদের উপর এই অকথ্য অত্যাচার সম্পর্কে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়। ইংরাজ বিচারকগণ চা-করদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে বিচারের নামে যে প্রহসন করতেন তা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গোচরে আনার জন্য দ্বারকানাথ, কৃষ্ণকুমার, হেমচন্দ্র প্রভৃতিরা এক স্মারকলিপি পার্লামেন্টের জন্য তার্থে প্রেরণ করেন। এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য দ্বারকানাথ দুর্দান্ত চা-করদের হাতে নিশ্চিত মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বারবার চা-বাগিচায় ভ্রমণ করেন এবং সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে তথ্যগর্ভ প্রবন্ধ লিখে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

শুধু সংবাদপত্র ও ভারতসভার মাধ্যমেই নয়, দ্বারকানাথ প্রমুখরা ১৮৮৭ সালের কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে কুলি সমস্যা সম্পর্কে এক প্রস্তাব আনার চেষ্টা করেন কিন্তু তখন কংগ্রেস প্রাদেশিক সমস্যা বলে একে গ্রহণ করে নি। ১৮৮৮ সালে প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে বিপিন চন্দ্র পাল এই বিষয়ে প্রস্তাব আনেন এবং ঐ প্রস্তাবের প্রধান সমর্থক ছিলেন দ্বারকানাথ। শেষ পর্যন্ত দ্বারকানাথের প্রচেষ্টায় ও কুলি আন্দোলনের তীব্রতায় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কুলি সমস্যাকে আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হন এবং ১৮৯৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে এই বিষয়ে প্রস্তাব স্থাপন করা হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে কুলিদের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগের দাবি জানান হয় এবং কংগ্রেস কুলি প্রথার অবসান দাবি করে।

কাজেই, উনিশ শতকের ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার, এদেশের সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিকের সমস্যাকে তারা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছিলেন—এই ধারণা যে ভ্রান্ত তা বইখানা পড়লেই বোঝা যায়। লেখক যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে পরিচালিত চা-বাগিচায় শ্রমিকদের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম উনিশ শতকের আশির দশকের পক্ষে এক টি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা কারণ ব্রিটিশ পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি-সংগ্রামের সূত্রপাত হয়েছিল। লেখক অমর দত্ত উনিশ শতকের জাগরণের

এই ফলাত্মক প্রগতিশীল মর্মবস্তুকে নিষ্ঠার সাহায্যে পাঠকের কাছে তুলে ধরে এক প্রশংসনীয় কাজ করতে সমর্থ হয়েছেন।

অমরবাবু উপসংহারে অনেক প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, কোন কোন প্রশ্ন নিয়ে অবশ্য মতান্তরের অবকাশ আছে। জাতীয় জাগরণে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তিনি যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তার সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। লেখক বলেছেন—বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে ধর্মীয় চিন্তার প্রাধান্য ঘটেছে, বলা যেতে পারে এটি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সেই পর্বের এক দুর্বলতা। কিন্তু তিনি 'প্রগতিশীল চিন্তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে ধর্মীয় উন্মাদনার সাহায্যে···একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীর রাষ্ট্রনৈতিক লক্ষ্যের সহায়ক হয়েছেন'—বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে লেখকের এই উক্তি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। বইটির এক জায়গায় লেখক অনুমান করেছেন যে, প্রথম আন্তর্জাতিকের একটি শাখা কলকাতায় স্থাপন করার জন্য যে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল ব্রাডলই সেই উদ্যোগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। কিন্তু তিনি তার এই অনুমানের সপক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য উল্লেখ করেন নি। কাজেই এখানেও প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়।

—দীপিকা বসু

তিন

মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক

১ম ও ২য় খণ্ড

—হনসুর বাদ সম্পাদিত

প্রাইমা পাবলিকেশনস, কলিকাতা

১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে 'মার্কসবাদী' নামে একটি নতুন প্রবন্ধ পত্র প্রকাশিত হয়। তাতে প্রকাশ রায়, ঊর্মিলা রহ, রবীন্দ্র গুপ্ত

কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এর মধ্যে রবীন্দ্র গুপ্ত (ভবানী সেনের ছদ্মনাম) ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রগণ্য নেতা। মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হিসাবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। কাজেই ঐ প্রবন্ধগুলি, বিশেষ করে রবীন্দ্র গুপ্তের বক্তব্য তখন মার্কসবাদী মহলে বেশ ঝড় তুলেছিল। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ—বাঙলার জাগরণের ঐতিহ্যকে রবীন্দ্র গুপ্ত প্রায় নস্যাৎ করে দিতে অগ্রসর হন। তিনি রায় দিলেন—"ভারতের ইতিহাসে রামমোহন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ যে ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন তা প্রগতিশীল ধারা নয় বরং তার উল্টো ধারা। ভারতের ইতিহাসে ইংরেজ-শাসন প্রগতির সূত্রপাত করেছিল একথা যদি সত্য হয় তবেই এদের ধারাকে প্রগতিশীল ধারা বলা যায়।" (রবীন্দ্র গুপ্ত—"বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা"—'মার্কসবাদী', ৫ম সংকলন, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯)।

শুধু দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নয়, মার্কসবাদ সম্পর্কেও আমাদের অজ্ঞতা কতটা ছিল তার সাক্ষ্য এই বিতর্কের মধ্যে রয়েছে।

আলোচ্য সংকলনগ্রন্থে 'মার্কসবাদী'তে প্রকাশিত সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিতর্কমূলক প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্র গুপ্তের বক্তব্যের জবাবে বিভিন্ন মার্কসবাদী পত্র-পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলিও এই সংকলনগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কাজেই সে-যুগের মার্কসবাদী-সাহিত্য-বিতর্কের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র এই সংকলনের মধ্যে পাওয়া যায়। যতদূর জানি, "মার্কসবাদী"র পুরো ফাইল একসঙ্গে কোথাও পাওয়া যায় না। প্রতিবাদী বক্তব্যগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেজন্য সেগুলি সংগ্রহ করা আরও দুষ্কর। সম্পাদক এই হারিয়ে-যাওয়া জিনিসগুলিকে এক জায়গায় গ্রথিত করে পুস্তক-আকারে পাঠকের সামনে তুলে ধরে একটি ভালো কাজ করেছেন। সম্পাদকের কৃতিত্বের ছাপ বইটিতে ছড়িয়ে রয়েছে।

কেউ যদি এই বিতর্ক সম্পর্কে কৌতূহলী হন তাহলে তাঁর কাছে এই সংকলন গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান বিবেচিত হবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

তবে এটিকে শুধুমাত্র একখানি সংকলন-গ্রন্থ ভাবলে ভুল হবে। এই গ্রন্থের প্রতিটি খণ্ডে সম্পাদক একটি করে দীর্ঘ ভূমিকা জুড়ে দিয়েছেন। এই ভূমিকায় তিনি এই বিতর্কের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু তথ্য পরিবেশন করেছেন

ভূমিকায় সম্পাদক যে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন আমি তার মূল সুরের সঙ্গে একমত নই। সম্পাদকমশাই রবীন্দ্র গুপ্তের ভুলের গভীরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পরন্তু তিনি রবীন্দ্র গুপ্তের বক্তব্যকে সাধারণভাবে ভুল স্বীকার করেও তার মধ্যে ইতিবাচক একটি দিক খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন—"ভবানীবাবুর ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই আমাদের বর্জন করতে হবে। কিন্তু একজন মার্কসবাদী হিসাবে তিনি শিল্প-সাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারে যে সদর্থক ভূমিকা পালন করতে চেয়েছিলেন সেই ইতিবাচক দিকটি আমরা যেন বিস্মৃত না হই।" ঊর্মিলা গুহ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"আজ থেকে প্রায় ছাব্বিশ বছর আগে—পঁচিশ বছরের একজন তরুণ বুদ্ধিজীবী মার্কসীয় দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে যে সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, হতে পারে তিনি বেশ কিছু ভুলও করেছিলেন, তা কি অভিনন্দনযোগ্য নয়?"

মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্র গুপ্ত বা ঊর্মিলা গুহ "মার্কসবাদীতে সেদিন যে বক্তব্য প্রকাশ করেন, তা মোটেই মার্কসবাদী বক্তব্য ছিল না, তা ছিল মার্কসবাদের অপব্যাখ্যা। মার্কসবাদের এই অপব্যাখ্যা প্রচার করার মধ্যে কোনো 'সৎ সাহস' নেই, এর কোনো সদর্থক বা 'ইতিবাচক' দিকও নেই। রবীন্দ্র গুপ্তের বক্তব্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল অতি-বামপন্থী ভাবধারা, যা তখনকার দিনে জাতির সামনে মার্কসবাদীদের ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করেছিল।

পরিশেষে নিজের কথা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উল্লেখ করতে হচ্ছে। কেননা সম্পাদক ভূমিকায় বারবার আমার নাম উল্লেখ করেছেন এবং এমন কয়েকটি তথ্য পরিবেশন করেছেন যা আমার মনে হয়েছে সঠিক নয়। তাছাড়া, আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি এমন কয়েকটি কথা বলেছেন যাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

অবশ্য, সেই সময়ে 'পরিচয়' বা অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখা প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে সম্পাদক যে মন্তব্য করেছেন সে বক্তব্য সঠিক কি বেঠিক, এই আলোচনায় আমি এখানে প্রবৃত্ত হতে চাই না। আমার লেখা সম্পর্কে তিনি যে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন শুধু সেই সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব।

ভাষা" 'সাহিত্যপত্র' পত্রস্থ করতে সম্মত ছিলেন এবং ঐ প্রবন্ধটি সেখান থেকে প্রত্যাহার করে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা হয়—একথাগুলির কোনোটিই ঠিক নয়। ঐ প্রবন্ধটি আসন্ন প্রগতি লেখক সম্মেলনের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল—একথাও ঠিক নয়। এই প্রবন্ধটি ছিল সে সময়ে প্রকাশিত অনেক বিতর্কমূলক প্রবন্ধের একটি। আমার মনে হয়েছে—সম্পাদক এই রচনাটির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

একথা ঠিক, আলোচ্য সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশনার পূর্বে ধনঞ্জয়বাবু আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চান। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি তাঁকে যা বলেছিলাম এবং তিনি আমার জবানিতে যে-কথা লিখেছেন তা এক নয়। সদ্য প্রকাশিত আমার পুস্তক "স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলার" (৪র্থ সংস্করণ, 'মনীষা' প্রকাশিত) ভূমিকায় এই বিতর্ক সম্পর্কে আমার বক্তব্যটি সংক্ষেপে উপস্থিত করেছি। উৎসাহী পাঠক দুটিকে মিলিয়ে পড়লেই বুঝতে পারবেন—আমার বক্তব্য ও ধনঞ্জয়বাবুর ভাষ্য এক জিনিস নয়।

আগেই বলেছি, রবীন্দ্র গুপ্তের বক্তব্যটি আমি মার্কসবাদের অপব্যাখ্যা বলে মনে করেছিলাম। তাই তার থেকে "শিক্ষা গ্রহণ করা" বা ঐ শিক্ষার "চিন্তিবাচক দিকগুলি প্রয়োগ করার" কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আমি যে-কথাটা ধনঞ্জয়বাবুকে বলার চেষ্টা করেছিলাম সেটা হল এই যে রবীন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধগুলি মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী মহলে বিরাট ঝড় তুলেছিল এবং আমাদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল। এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে গিয়ে অনুভব করেছিলাম—আমাদের বিষয়টির আরও গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করা উচিত। তাছাড়া, এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে গিয়ে আমার নিজের বক্তব্যের দুর্বলতার দিকগুলি সম্পর্কেও সচেতন হই। বুঝতে পারি, শুধু সমালোচনা নয়, আত্ম-সমালোচনারও প্রয়োজন আছে।

পরিশেষে, সম্পাদকের কাছে এই নিবেদন, মার্কসবাদী হিসাবে আমাদের একটি দায়িত্ব আছে। অতীতে আমরা যেসব ভুলভ্রান্তি করেছি তার থেকে

থেকেই হয়ে থাকুক না কেন, সে সম্পর্কে আমাদের সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার মনোভাব গ্রহণ করা উচিত।

১৯৪৮-৪৯ সালে আমরা যেসব ভুলভ্রান্তি করেছিলাম তার সম্পর্কে কোনো রকমের মোহ বিস্তার করার চেষ্টা করা ঠিক নয়। কেননা, আজকের দিনেও মার্কসবাদের অপব্যাখ্যার শেষ নেই। বর্তমানে একদল অপরিণত-বুদ্ধি-যুবক অনুরূপভাবেই অতি-বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমাদের দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিচারে উদ্যোগী হয়েছেন। সম্পাদক মহাশয়ের হয়তো অভিপ্রেত নয়, তবুও আমার মনে হচ্ছে, এই শ্রেণীর যুবকেরা তাঁর বক্তব্য পড়ে কিছুটা উৎসাহিত বোধ করবেন। আশা করি, এই দিকটি সম্পর্কে তিনি অবহিত হবেন।

সরহরি কবিরাজ

সম্পাদকীয়

চীনের আগ্রাসন বন্ধ হোক

চীন ভিয়েৎনামকে আক্রমণ করেছে। দীর্ঘ আট শত মাইল সীমান্ত জুড়ে চীনের সেনাবাহিনী ভিয়েতনামের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে। চীনের এই আক্রমণের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে "জোর যার মুল্লুক তার" নীতির নির্লজ্জ প্রকাশ। এই আগ্রাসনকে আমরা তীব্রভাবে নিন্দা করি।

আরও পরিতাপের বিষয়, সমাজতন্ত্রের নামাবলি গায়ে দিয়ে চীন এই আক্রমণ চালাচ্ছে। আমরা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই সমাজতন্ত্রের নামে অপথ নেবার অধিকার আজ আর চীনের শাসকগোষ্ঠীর নাই। একথা সর্বজনবিদিত যে সমাজতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে যুদ্ধের অহি-নকুল সম্পর্ক। মার্কস এঙ্গেলসের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের ইতিহাস আগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস। চীনের আগ্রাসন এটিই প্রমাণ করছে যে চীনের শাসকগোষ্ঠী আজ সমাজতন্ত্রের মহান আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতে বসেছে।

সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম ও শান্তির জন্যে সংগ্রাম যেমন অবিচ্ছেদ্য, ঠিক তেমনি ভাবেই সমাজতন্ত্রের আদর্শ এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের আদর্শও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

জন্মের দিন থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রত্যেকটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সংগ্রামকে সমর্থন ও সোহার্দ জানিয়ে এসেছে। সেই দিক থেকে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর এই নির্লজ্জ আক্রমণ আরও একটি প্রমাণ উপস্থিত করছে যে চীনের শাসকগোষ্ঠী সমাজতন্ত্রের আদর্শ থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছে।

সমাজতন্ত্রের নামাবলি গায়ে দিয়ে চীন আজ শান্তি ও স্বাধীনতার নীতিকে লঙ্ঘন করছে, সে ভিয়েৎনামের ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে, এই কারণে সে আমাদের কাছে অধিকতর নিন্দার পাত্র।

লক্ষ্য করার বিষয়, সমাজতন্ত্রের আদর্শ থেকে স্খলিত হয়ে চীন এই আগ্রাসনের পথ বেছে নেওয়ায় খুশী হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী শাসকচক্র। একথা অজানা নয় যে এই আক্রমণের মাত্র দুই সপ্তাহ আগে

এখন বোঝা যাচ্ছে কার্টারের সঙ্গে পরামর্শ করেই চীন এই আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

চীনের এই আগ্রাসন বিশ্ববাসীর সামনে একটি নতুন ঘটনা উদ্ঘাটিত করছে—সমাজতন্ত্রের কপট অভিনয় ও সাম্রাজ্যবাদের যোগসাজস এই দুটি এক সঙ্গে চলতে পারে।

একথা কেনা জানে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ মহা দুশ্চিন্তায় দিন যাপন করছে। পৃথিবীতে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। যখন সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গুলি সংকেতে পৃথিবী চলতে বাধ্য হত, সেদিন আর নাই। আজ শক্তির ভারসাম্য ক্রমশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। ফলে সাম্রাজ্যবাদের চোখে আজ ঘুম নেই। তার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে এ্যাঙ্গোলা, ইথিওপিয়া, আফগানিস্থান। তার ঘুম কেড়ে নিয়েছে ইরান। এই অবস্থায়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে। এই কৌশলের একটি হল: সমাজতন্ত্রের শিবিরের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে তাতে ইন্ধন জোগানো, সমাজতন্ত্রের শিবিরের মধ্যে থেকে ট্রোজান হর্স খুঁজে বার করার চেষ্টায় মার্কিন শাসকেরা আজ বিশেষ তৎপর।

চীনের শাসকগোষ্ঠী হল সেই ধরনের "ট্রোজান হর্স" যাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চায়।

আমরা বলি সত্যিই চীন কার্যত আজ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শত্রুতা করছে তাই সে আমেরিকার সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে চিলির জল্লাদ পিনোচেতকে সমর্থন জানাতে এগিয়ে এসেছে। এ্যাঙ্গোলার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে সে সমর্থন করছে। পশ্চিম ইওরোপে ন্যাটো চক্রের সঙ্গে সে ষড়যন্ত্র করছে। এশিয়া থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যাতে চলে না যায় তার জন্যে সে সাম্রাজ্যবাদের কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছে।

কাজেই চীনের এই আগ্রাসন আকস্মিক ব্যাপার নয়। বেশ কয়েক বছর ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলার যে নীতি চীন অনুসরণ করে এসেছে এ তারই চরম ও নির্লজ্জ পরিনতি।

তবে চীনের শাসক-চক্র যেন ভুলে না যায় যে সমাজতন্ত্র দুর্বলের দর্শন নয়। সমাজতন্ত্র আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে জানে। সমাজতন্ত্রের অভিধানে ন্যায়যুদ্ধ বলে একটি কথা প্রচলিত আছে। শত শত ন্যায় যুদ্ধের

এই ন্যায় যুদ্ধের সব চেয়ে উজ্জ্বল প্রতীক ভিয়েৎনাম। ন্যায় যুদ্ধে ভিয়েৎনাম পৃথিবীর সব চেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র আমেরিকাকে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে, আমেরিকাকে পরাস্ত করেছে। সেই বীর ভিয়েৎনামকে আক্রমণ করে চীন নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছে। ভিয়েৎনামে আগুণ নিয়ে খেলা করতে গিয়ে আমেরিকার যে দশা হয়েছে চীনেরও হবে সেই দশা।

পৃথিবীর সামনে আজ দুটি চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে চলছে সমাজতন্ত্র নামে চীনের শাসকগোষ্ঠীর কপট অভিনয়—যা শুধু সমাজতন্ত্রের আদর্শের নয়, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের আদর্শের, শান্তির আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করছে। এই কাজে চীন আজ বাহবা পাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী শাসকচক্রের কাছে, আর পৃথিবীর সেই সব দেশের শাসকচক্র তাদের উৎসাহ দিচ্ছে যারা নিজ নিজ দেশে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বিশেষ ধিক্কৃত।

অপরদিকে, বীর সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে ভিয়েৎনাম—যার পতাকার নীচে অঙ্কিত রয়েছে শান্তি, স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্রের বাণী।

মেকী সমাজতন্ত্র ও খাঁটি সমাজতন্ত্র কোনটি-সেটি বেছে নিতে বিশ্ববাসীর আজ আর এতটুকু অসুবিধা হচ্ছে না। এটি আকস্মিক ঘটনা নয় যে সোভিয়েত রাশিয়াকে পুরোভাগে স্থাপন করে সমগ্র সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব পরিবার আজ একভাবে ভিয়েৎনামের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এটা আকস্মিক ঘটনা নয় যে ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্যে সংগ্রামকে সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তি বিপুলভাবে সমর্থন করছে। ভিয়েৎনামকে আক্রমণ করে চীন এশিয়া তথা যে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে তাতে শান্তিকামী মানুষ ও রাষ্ট্র মাত্রেই উদ্বিগ্ন।

আমরা জানি, নিজের দেশে শান্তি, স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার ক্ষমতা ভিয়েৎনামের আছে। তাছাড়া সমগ্র পৃথিবী আজ ভিয়েৎনামের পক্ষে। পরিনামে চীনের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী চীনের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সমর্থন থেকেও বঞ্চিত হবেন। তাই আমরা সুনিশ্চিত যে চীনের আগ্রাসন পরাস্ত হবে, ভিয়েৎনামের জয় হবেই। ২৯. ২. ৭৯

MULYAYAN
Vol. XIV No.-3
(Pous-Chaitra, 1385 B. S.)
Regd. No.-W.B./SC-16
R. N. 13785/65

এই প্রতীক
কী এবং কেন?

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স্—
সেই ১৯৩৬ থেকে দেশ ও দশের জন্যে
উৎকৃষ্ট ওষুধের গবেষণা, উদ্ভাবন ও
সরবরাহ করে চলেছে।

এই প্রতীক আধুনিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র তৈরির কাজে ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্-এর কায়মনোবাক্যে নিজেকে ঢেলে দেওয়ার চিহ্ন। এমন এমন ওষুধ যা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অর্থসামর্থ্যের দিক থেকে সাধ্যায়ত্ত।

ঈ-আই-পি-ডব্লু বলতে এই। সেই ১৯৩৬ সালে মুষ্টিমেয় একদল আদর্শবান চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ্ এবং ভেষজতত্ত্বজ্ঞ এর গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁরা কী চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন দেশীয়ভাবে বিস্তর ধরনের ওষুধের গবেষণা আর উদ্ভাবন করতে। আর সেইসঙ্গে সুলভে সারা দেশে তার যোগান দিতে।

এই চাওয়া ইতিমধ্যে সার্থক হয়েছে।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ লিমিটেড
আপনাদের সেবায়